সোফির জগৎ, মায়া, তাস রহস্য ও
ক্রিসমাস মিস্ট্রি-র লেখক

ইয়স্তেন গার্ডার

কমলা সুন্দরী

অনুবাদ
দ্বিজেন্দ্রনাথ বর্মন

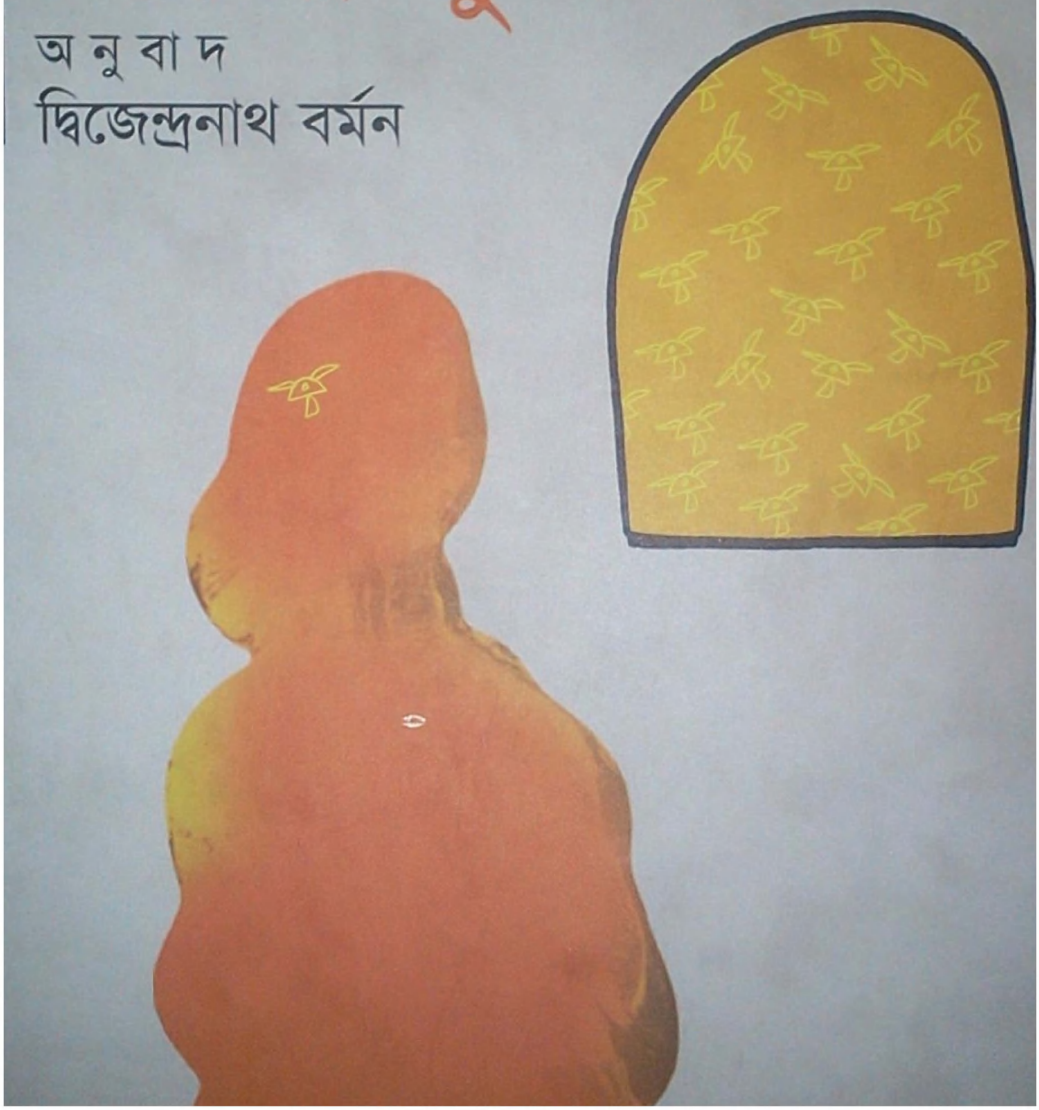

Scanned @ Edited BY Md. Fuad Al Fidah

"খামখেয়ালী, চিন্তা উদ্রেককারী এক কাহিনী, যার মধ্যে লুকিয়ে আছে একাধিক রহস্য।"

–বুক গাইড

"সবারই পড়া উচিত"

–ভোগ

"আধুনিক রূপকথার গল্প"

–হীট

"ধ্রুপদী প্রেম-কাহিনী"

–ডিজি

"রহস্যের জালে ঘেরা উপন্যাস"

–ক্রিস্টেলিস্ট ড্যাগব্লাড, কোপেন হেগেন

ISBN 984 70209 0018 4
9 847020 900184

"আমার বাবা মারা যায় আজ থেকে এগার বছর আগে, আমার বয়স তখন সবে চার বছর। কখনো ভাবিনি তার কণ্ঠস্বর আবার শুনতে পাব। আজ দু'জনে একসাথে বসে একটা বই লিখছি।"

গীয়র্গ রোয়েদের কাছে তার বাবা একটা ছায়ামূর্তির চাইতে বেশিকিছু নয়; একটা দূরাগত স্মৃতি। হঠাৎ করেই তার দাদীমা একটা পুরনো পুশচেয়ারের গদীর মধ্যে লুকিয়ে রাখা কিছু কাগজ আবিষ্কার করে। কাগজগুলো আসলে গীয়র্গকে লেখা তার বাবার চিঠি, মৃত্যুর কয়েক দিন আগে লেখা। এতে রয়েছে এক কাহিনী, **কমলা সুন্দরীর** কাহিনী।

তবে **কমলা সুন্দরী** কোনো সাধারণ কাহিনী নয়– অতীত থেকে উঠে আসা এক রহস্য–তার বাবার যৌবন কাল ঘিরে গড়ে ওঠা। কোনো একদিন তার বাবা ট্রামে উঠে পড়ে। দুপাশের সিটের মাঝখানের খালি জায়গাটাতে ভিড়ের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা অসাধারণ সুন্দরী এক যুবতী তার দৃষ্টি কেড়ে নেয়। মেয়েটির দুহাতে আঁকড়ে ধরা রসালো কমলা বোঝাই বিশাল এক কাগজের ব্যাগ। হঠাৎ দারুণ এক ঝাঁকুনি লেগে কমলার ব্যাগ হাত থেকে খসে পড়ে কমলাগুলি ট্রামের মধ্যে গড়াগড়ি যায়। যুবক বীরত্ব দেখিয়ে ব্যাগ সামলাতে গিয়ে নিজেই অপরাধবোধে ভোগে। সেদিন থেকে যুবকের নেশা জাগে এই রহস্যময়ী **কমলা সুন্দরীকে** খুঁজে বের করার। আর এখন কবরে শুয়ে সেদিনের সেই যুবক তার পুত্রকে অনুরোধ করছে সেই রহস্যের কিনারা করার।

ইয়স্তেন গার্ডার

সোফির জগৎ এবং সলিটেয়ার মিস্ট্রি এই দুই বেস্ট সেলার গ্রন্থের লেখক ইয়স্তেন গার্ডার-এর জন্ম ১৯৫২ সালে। দীর্ঘদিন নরওয়ের বার্গেন শহরে দর্শন পড়িয়েছেন তিনি। এখন সার্বক্ষণিক লেখক; নিবাস অসলোয়, স্ত্রী এবং দুই পুত্রসহ।

এ-পর্যন্ত ইয়স্তেন গার্ডার মোট এগারোটি গ্রন্থ লিখেছেন, যার মধ্যে দশটি ইংরেজীতে অনূদিত হয়েছে। ইংরেজীতে অনূদিত সর্বশেষ গ্রন্থের নাম অরেঞ্জ গার্ল। বাংলায় অনূদিত হয়েছে আটটি।

অনুবাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ বর্মন : জন্ম ১৯৪০ সালে দিনাজপুর জেলার বিরামপুর থানার শিমুলতলীতে। পিতা বিশ্বনাথ বর্মন। ১৯৬৯ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে স্নাতকোত্তর পাস করার পর ডোমার ও সৈয়দপুর কলেজে দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেন। বর্তমানে অবসর নিয়ে নীলফামারী জেলার সৈয়দপুরে বাস করছেন।

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

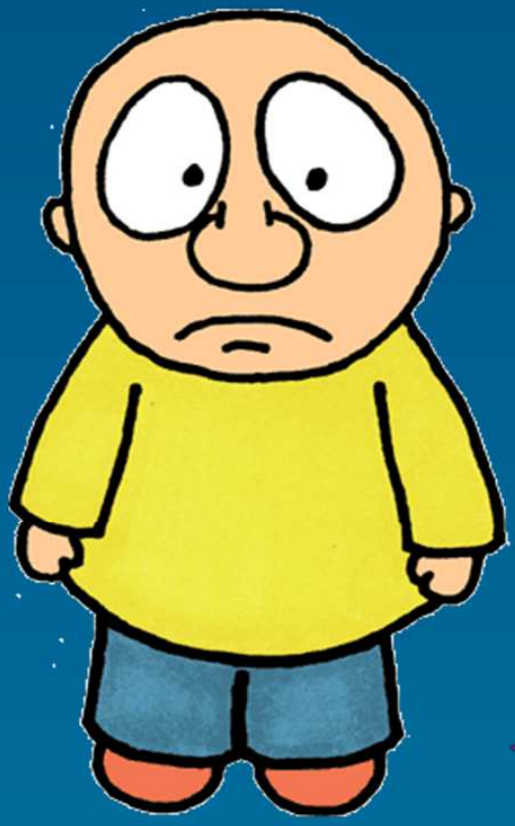

Visit Us at Banglapdf.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

Appelsinpiken

(Orange Girl)

Jostein Gaarder

বিশ্বখ্যাত উপন্যাস সোফির জগৎ, মায়া, তাস রহস্য এবং ক্রিসমাস মিস্ট্রি'র লেখক

ইয়স্তেন গার্ডার

কমলা সুন্দরী

অনুবাদ : দ্বিজেন্দ্রনাথ বর্মন

সন্দেশ

সন্দেশ
ISBN-984-70209-0018-4
কমলা সুন্দরী
মূল : ইয়স্তেন গার্ডার
অনুবাদ : দ্বিজেন্দ্রনাথ বর্মন

Appelsinpiken by Jostein Gaarder
Copyright © The Author and H. Aschehoug & Co.

বাংলা অনুবাদস্বত্ব © ২০০৯ সন্দেশ

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০৯

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

সন্দেশ, বইপাড়া, ১৬ আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০ থেকে
লুৎফর রহমান চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত
E-mail : sandesh.publication@live.com

কম্পোজ : সোহেল কম্পিউটার ৫০১/১ বড় মগবাজার, বেপারি গলি, ঢাকা-১২১৭
চৌকস প্রিন্টার্স : ১৩১ ডিআইটি এক্সটেনশন রোড, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত।
পরিবেশক : বুক ক্লাব ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

বাংলা ভাষার অনুবাদস্বত্ব বা সর্বস্বত্ব প্রকাশক সন্দেশ কর্তৃক সংরক্ষিত। বাংলা ভাষার কপিরাইট অধিকারীর পূর্ব অনুমতি ছাড়া এই প্রকাশনার কোনো অংশ বৈদ্যুতিক, যান্ত্রিক, ফটোকপি, রেকর্ড বা অন্য কোনো উপায়ে রিপ্রোডিউস বা সংরক্ষণ বা সম্প্রচার করা যাবে না।

১৫০.০০ টাকা

উৎসর্গ

ছোটমণি লুইপা-কে

দ্বিজেন্দ্রনাথ বর্মন অনূদিত অন্যান্য বইঃ

মহারথীদের দুঃস্বপ্ন / বার্ট্রাণ্ড রাসেল
অনাগত শিশুর জন্য শোকগাথা / ইমরে কারতেশ্‌জ
তাশ রহস্য / ইয়স্তেন গার্ডার
থ্রু আ গ্লাস ডার্কলী / ইয়স্তেন গার্ডার
ক্রিসমাস মিস্ট্রি / ইয়স্তেন গার্ডার
ব্যাঙ বাহাদুরের রাজ্যে / ইয়স্তেন গার্ডার
শুনছ, কোথাও আছো কি কেউ? / ইয়স্তেন গার্ডার
ভিটা ব্রেভিস / ইয়স্তেন গার্ডার
গ্রহযুদ্ধ / এইচ. জি. ওয়েলস্‌

কমলা সুন্দরী

আমার বাবা মারা গেছেন এগার বছর আগে। তখন আমার বয়স সবে চার বছর। তখন স্বপ্নেও ভাবিনি ওর সাথে আমার আবার কথা হবে, আর এখন দুজনে এক সাথে একটা বই লিখছি।

এটাই এই বইয়ের মুখবন্ধ, লেখার কাজটা আমাকেই করতে হচ্ছে, তবে একটু পরে বাবাও সুযোগ পেয়ে যাবে। আর কাহিনীটা বলবে সে-ই।

আমার বাবাকে কতটা মনে রেখেছি এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই। হয়তো তাকে মনে রাখার ব্যাপারটা এ কারণেই ঘটে যে তার ফটো দেখতাম বারবার।

তবে একটা ব্যাপার নিশ্চিতভাবে মনে করতে পারি। আর তা হল এক রাতে ছাদে বসে আমরা তারা দেখছিলাম, তখনকার এক ঘটনা।

একটি ছবিতে দেখা যায় আমি বসার ঘরে হলদে চামড়ায় মোড়া সোফায় ঠিক বাবার পাশেই বসে আছি। দেখে মনে হয় সে যেন আমাকে কোনো একটা মজার কথা বলছে। সোফাটা এখনও অমনি আছে, তবে বাবা আর ওটাতে বসে না।

আর একটা ছবিতে আমাদের সংরক্ষণাগারের সবুজ রকিং চেয়ারে দুজনে একসাথে বসে আছি। বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে ছবিটা এখানেই ঝুলানো রয়েছে। সেই সবুজ চেয়ারটাতেই এখন আমি বসে আছি, তবে এটাকে দোলাচ্ছি না, কারণ একটা বড়সড় এক্সারসাইজ খাতায় লিখছি। এরপর এগুলো বাবার পুরনো কম্পিউটারে ঢোকাব।

এই পুরনো কম্পিউটারটা নিয়েও একটা গল্প আছে, তবে সেটাতে পরে যাব।

এসব পুরনো ছবির মধ্যে নিজেকে কেমন যেন হারিয়ে ফেলি। এসবই অন্য এক যুগের।

আমার ঘরে বাবার ছবির একটা পুরো অ্যালবাম আছে। যে ব্যক্তিটি এখন জীবিত নাই তার মাঝে নিজের অস্তিত্বকে কেমন যেন অপার্থিব রহস্যময় মনে হয়। বাবার কিছু ভিডিও ক্যাসেটও আছে। ওর কণ্ঠস্বর কেমন যেন ভীতির সঞ্চার করে। বাবার কণ্ঠস্বর ছিল গুরুগম্ভীর।

যে লোক আমাদের মাঝে নাই, দাদীর কথায়, বিগত হয়েছে, তার ভিডিও দেখা নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। মৃত ব্যক্তির জীবনে গুপ্তচরবৃত্তি অন্যায়।

কোনো কোনো ভিডিওতে আমার কণ্ঠস্বরও শোনা যায়। কেমন যেন তীক্ষ্ণ চিঁচিঁ আওয়াজ। মুরগীর বাচ্চার আওয়াজ বলে মনে হয়। সেসব দিনে এমনটাই ছিল, বাবার উদারা আর আমার মুদারা।

ভিডিওর একটা দৃশ্যে আমি বাবার কাঁধে চড়ে ক্রিসমাস ট্রির তারকা ধরার চেষ্টা করছি, এটাকে আমি তো প্রায় ছিঁড়ে নিয়েছিলাম।

মা মাঝে মাঝে বাবার আর আমার ভিডিও ছবি দেখে পেছন দিকে হেলান দিয়ে বসে হো হো করে হাসত, যদিও সে-ই ভিডিও ছবিগুলো তুলেছিল। আমার মনে হয় না বাবার ছবি দেখে তার হাসা উচিত। আমার মনে হয় না এতে সে খুশী হত। হয়তো বাবা বলত এটা নিয়ম ভাঙ্গা হচ্ছে।

আর একটা ভিডিওতে ফিয়েলস্টোলেনে আমাদের কেবিনের বাইরে এক ঈস্টারের সকালে নরম রোদে বসে আছি। আমাদের দুজনের হাতেই আধখানা করে কমলালেবু। আমার আধখানা না ছুলেই চুষে রস বের করার চেষ্টা করছি। বাবার মনোযোগ অন্য কোনো কমলার দিকে নিবদ্ধ বলে আমার ধারণা, সত্যি বলতে কি এ ব্যাপারে আমার দৃঢ় প্রত্যয়।

এই ঈস্টারের অল্প কিছুদিন বাদেই বাবা অসুস্থ হয়ে পড়ে। ছয় মাস ধরে সে অসুস্থ থাকে আর শেষ দিকে তার ভয় হয় সে আর বাঁচবে না। ও বুঝতে পারে মৃত্যু আসন্ন।

মা প্রায়ই বলত, বা যেটা নিয়ে সবচেয়ে বেশি বিচলিত ছিল তা হল, মাকে ভালভাবে বুঝে ওঠার আগেই তাকে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে। দাদীমাও এই কথাটাই আরো রহস্যমিশ্রিত করে বলত।

বাবার কথা বলতে গেলেই দাদীমার কণ্ঠস্বর কেমন যেন অস্বাভাবিক শোনা যেত। আমার কাছে এটা অবাক করার মতো ছিল না। দাদাকে দিদিমা হারিয়েছিল এক উঠতি যুবক। আমি বুঝতে পারি না অনুভূতিটা কেমন। সৌভাগ্যবশত ওদের আর এক ছেলে এখনও বেঁচে আছে। তবে বাবার ছবির দিকে তাকাবার সময় দাদীর মুখে কখনও হাসি দেখিনি। সে সব সময় গম্ভীর থাকত। আর এ কথাটা ও স্বীকারও করত।

বাবার ধারণা ছিল সাড়ে তিন বছর বয়সী ছেলের সাথে ভালো করে কথা বলা যায় না। এখন বুঝতে পারি কেন তার এমন ধারণা ছিল। আর পাঠকরাও শিগগিরই এটা বুঝতে পারবেন।

হাসপাতালের বিছানায় শায়িত বাবার একটা ফটো আছে। ছবিতে তার মুখমণ্ডল অত্যন্ত শীর্ণ দেখাচ্ছে। আমি ওর হাঁটুতে বসা আর সে আমাকে আঁকড়ে ধরে আছে যেন তার ওপরে পড়ে না যাই। সে আমার দিকে তাকিয়ে হাসার চেষ্টা করছে। ওর মৃত্যুর

কয়েক সপ্তাহ আগের ছবি এটা। মনে হয় ছবিটা না থাকলেই ভালো হত, কিন্তু ওটা যখন রয়েছে, ফেলেও দেয়া যায় না। এমন কি সেটার দিকে না তাকিয়েও পারি না।

এখন আমার বয়স ১৫, সঠিকভাবে বলতে গেলে ১৫ বছর তিন সপ্তাহ। আমার নাম গিয়োর্গ রোয়েড, বাম্বলবী রোডের হাম্‌লেভেইয়েনে আমার বাস। ওসলো শহরে এখানে মার সাথে থাকি, মার নাম ইয়োর্গেন মিরিয়াম। ইয়োর্গেন আমার সৎবাপের নাম। আমি ওকে ইয়োর্গেন বলেই ডাকি, আমার ছোট্ট বোনটির নামও মিরিয়াম। ওর বয়স সবে আঠার মাস, সে এত ছোট যে তার সাথে তেমন কথাবার্তা হয় না।

স্বাভাবিক কারণেই বাবার সাথে মিরিয়ামের কোনো ভিডিও নাই। মিরিয়ামের বাবা ইয়োর্গেন। আমিই বাবার একমাত্র সন্তান।

ইয়োর্গেন সম্বন্ধে কিছু মজার তথ্য আছে, যেগুলো এই বইয়ের শেষভাগে জানা যাবে। এগুলো এখন ফাঁস করা চলবে না, তবে আপনারা যদি বইটা আগাগোড়া পড়েন, তাহলে নিজেই জানতে পারবেন।

বাবা মারা যাওয়ার পর দাদু আর দাদীমা সবকিছু দিয়ে মাকে সাহায্য করে। তবে একটা বিশেষ ব্যাপার ছিল যা ওদের কেউই খেয়াল করেনি। হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার আগে বাবা একটা দীর্ঘ কাহিনী লিখে যায়। সে সময় কেউই জানতে পারেনি যে সে গল্প লিখত। কমলা সুন্দরীর কাহিনীটার হদিস মিলে সবেমাত্র গত সোমবারে। আমি ছোট থাকতে যে লাল পুশ চেয়ারটাতে করে আমাকে বেড়িয়ে আনা হত তার রেক্সিনের নিচে সেলাই করে রাখা ছিল। এতদিন সেটা ফালতু জিনিস রাখার ঘরে ফেলে রাখা ছিল।

সেটা ওখানে গেল কিভাবে সে এক রহস্য। ব্যাপারটা মোটেই দৈবাৎ ছিল না, কারণ, কারণ গল্পটা লেখা হয়েছিল আমার বয়স যখন সাড়ে তিন। ঠিক ঐ সময়টাতে আমার সাথে চেয়ারটার সম্পর্ক ছিল। আমি বলতে চাচ্ছি না যে গল্পটা পুশ চেয়ার নিয়ে, অবশ্যই না। তবে দীর্ঘ গল্পটা বাবা আমার জন্যই লিখেছিল। কমলা সুন্দরী গল্পটা আমার জন্য লিখেছিল, যখন আমার বয়স হবে গল্পটা বোঝার মতো। তখনকার জন্য গল্পটা ছিল ভবিষ্যতের জন্য বাবার চিঠি।

বাবা যদি চেয়ারের রেক্সিনের নিচে চিঠি রেখে দিয়ে থাকেন, তাহলে নিশ্চয়ই তার এই বিশ্বাস ছিল একদিন না একদিন চিঠি তার প্রাপকের হাতে পৌছবেই। এই কারণে আমার মনে হয়েছে পুরনো কোনো জিনিস ফেরিওয়ালার কাছে বিক্রি করা বা আবর্জনার স্তূপে ফেলে দেয়ার আগে ভালভাবে চেক করে নেয়া প্রয়োজন। কল্পনাও করতে পারি না, আবর্জনার স্তূপে খুঁজলে এমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ জিনিস খুঁজে পাওয়া যাবে।

গত কয়েকদিন ধরে এ নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি। প্যারাম্বুলেটরের মধ্যে লুকিয়ে রাখার চাইতে অনেক সহজ পদ্ধতি আছে ভবিষ্যতের কাছে কোনো বার্তা পৌঁছে দেয়ার।

প্রায়ই আমরা কারো জন্য কিছু লিখে যাই সেটা চার ঘণ্টা বা চৌদ্দ দিন বা চল্লিশ বছর পরে পঠিত হওয়ার জন্যে। কমলা সুন্দরীর গল্পটা তেমনি। এটা আমার বাবা লিখেছিল গিয়র্গ নামে বার চৌদ্দ বছরের এক বালকের জন্য যার সাথে তখনও তার দেখা মেলেনি আর ওর জীবদ্দশাতে মেলার সম্ভাবনাও নাই।

কিন্তু এখন গল্পটা শুরু করার প্রকৃত সময় এসে গেছে।

সপ্তাহখানেক আগে আমার সঙ্গীতের ক্লাশ থেকে ফিরে এসে দেখি দাদা-দাদী এসে হাজির। ওরা আগে কোনো খবর দেয়নি। সাধারণত এমনটা ঘটে না। ওরা হঠাৎ করে টন্সবার্গ থেকে গাড়ি চালিয়ে এসেছে, আর পর দিন সকাল পর্যন্ত থাকবে।

মা এবং ইয়োর্গেনও ওদের সাথে ছিল। স্কুল থেকে ফিরে পা থেকে জুতো ঝেড়ে ফেলে দিয়ে তাদের দিকে তাকালাম। দেখি সবাই আমার দিকে সাগ্রহে তাকিয়ে আছে। আমার জুতো ছিল ভেজা আর কাদা মাখানো, তবে ওদের কারো দৃষ্টিই সেদিকে ছিল না। তাদের মনে অন্য একটা চিন্তা আন্দোলিত হচ্ছিল। আমি বাতাসে তার গন্ধ পাচ্ছিলাম।

মা বলল মিরিয়াম বিছানায় এবং মনে হল কথাটা ঠিক, কারণ দাদা-দিদিমা ওখানে ছিল। ভালো কথা, সে দাদা দাদীর নিজের নাতনী নয়। মিরিয়ামের নিজের দাদা-দাদী আছে। তারাও চমৎকার মানুষ, আর ওরাও প্রায়ই আমাদের দেখতে আসে। তবে লোকে বলে রক্ত পানির চাইতে গাঢ়।

আমি শোবার ঘরে গিয়ে কার্পেটের ওপর বসে পড়ি। সবাই আমার দিকে এমন গম্ভীর দৃষ্টিতে চেয়েছিল যেন সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটে গেছে। আমার মনে পড়ে না বিগত কয়েক দিন স্কুলে খারাপ কিছু করেছি। পিয়ানো শেখার পাঠ নিয়ে সময় মতোই তো ঘরে ফিরি। আর রান্না ঘরের তাকের ওপর থেকে দশ ক্রোনারের যে মুদ্রাটা চুরি করেছিলাম, সেটাও তো বেশ কয়েকমাস আগের কথা। কাজেই জিজ্ঞেস করলাম, 'ঘটনাটা কী?'

এতে করে দাদীমা বলতে শুরু করে, বাবা মারা যাওয়ার আগে আমার নামে যে চিঠিটা লিখে যায় সেটা কীভাবে পাওয়া যায়। আমার মনে হল পেটের মধ্যে কী যেন মোচড় দিচ্ছে। আমি তার চেহারাটাও সঠিকভাবে মনে করতে পারছিলাম না। বাবার চিঠিটাকে মনে হল একটা আনুষ্ঠানিক ব্যাপার, উইল করার মতো আর কি।

দেখলাম দাদীর কোলের ওপর একটা বড়সড় এনভেলাপ, আর ওটা সে আমার হাতে তুলে দিল। বাইরেটা সীল করা, ওপরে লেখা "গিয়োর্গের প্রতি।" এটা দাদীর হাতের লেখা মা অথবা ইয়োর্গেনেরও নয়। আমি খামের মুখটা ছিঁড়ে ভেতর থেকে

বড়সড় একতাড়া কাগজ বের করলাম। প্রথম লাইনটা পড়তেই একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেলাম:

'গিয়র্গ তুমি আরাম করে বসেছ তো?' সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল নিজেকে শক্ত করতে হবে, কারণ তোমাকে খুবই স্পর্শকাতর একটা গল্প বলতে যাচ্ছি...'

আমার মাথা ঘুরতে থাকে। কী এমন সাংঘাতিক ব্যাপার হতে পারে। আমার বাবার চিঠি। ভেজাল চিঠি নয়তো?

'তুমি শক্ত করে বসে আছ তো, গিয়র্গ?' মনে হল বাবার গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর আমার কানে বাজছে। এবার আর ভিডিওর ছবি নয়, বাবা যেন হঠাৎ জীবন্ত হয়ে রুমের মধ্যে আমাদের মুখোমুখি বসে আছে।

যদিও খামটা সীল করা ছিল, তবে আমাকে বয়োজ্যেষ্ঠদের আর একবার জিজ্ঞেস করে নিতে হল ওরা দীর্ঘ চিঠিটা ইতিপূর্বে পড়েছে কিনা। তবে সবাই মাথা নেড়ে বলল, ওরা কেউ একজন একটা শব্দও পড়েনি।

'একটা শব্দাংশও নয়,' ইয়োর্গেন বলে। ওকে যেন একটু লজ্জিত মনে হল, আর এটা ওর সঠিক স্টাইল নয়। হয়তো আমার পড়ার পর, অনুমতিসাপেক্ষে তারাও পড়ে দেখতে চায়, সে একথাটাই ভাবে ভঙ্গিতে বোঝাতে চায়। মনে হল চিঠিতে কী লেখা আছে, এটা জানতে সে দারুণ আগ্রহী। তবে আমার কেন যেন মনে হল ওর মধ্যে একটা অপরাধবোধ রয়ে গেছে।

দাদীমা ব্যাখ্যা করে বলে সেদিন ওরা কেন তড়িঘড়ি করে গাড়ি চালিয়ে ওসলো গিয়েছিল, কারণ তারা বিশ্বাস করেছিল দীর্ঘ দিনের একটা ধাঁধার সমাধান পেয়ে যাবে। কথাটা বেশ রহস্যময় আর সত্যিই তাই।

বাবা অসুস্থ। মাকে বলেছিল ও আমার জন্য কিছু একটা লিখছে, ওটা ছিল একটা চিঠি, সেটা আমি বয়স্ক হলে পড়ার কথা। আর এ ধরনের চিঠি কখনও দিনের আলো দেখেনি, আর এখন আমার বয়স পনের।

ঠিক এই সময়েই এমন কী ঘটল যতে মা'র মনে পড়ে গেল, বাবা আমাকে নিয়ে একটা বিশেষ কথা বলেছিল। বাবা নাকি বারবার জোর দিয়ে বলেছিল, লাল রঙের ঠেলা চেয়ারটা কেউ যেন ফেলে দেয়ার কথা মাথায় না আনে। হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে ঠিক কোন্ কথাটা বাবা বলেছিল, তা ঠিক ঠিক ওর মনে আছে, 'লাল ঠেলা চেয়ারটা যেন কোনো দিনই হাতছাড়া না করা হয়, মনে থাকবে?' সে বলেছিল। 'দয়া করে এমন কাজটি করো না। গত কয়েক মাসের জন্য এটা গিয়র্গ আর আমার মধ্যে বিরাট এক অর্থবহ জিনিস হিসাবে দাঁড়িয়ে গেছে। আমি চাই ঠেলা চেয়ারটা গিয়র্গের সম্পত্তি হিসাবে ওটা তার অধিকারেই থাকবে। কোনো একদিন এই কথাটা ওকে জানিয়ে দিও। তার যখন কথাটা বোঝার বয়স হবে তখন বলো, আর তাই আমার ইচ্ছা এটা ওর জন্য যত্ন করে রেখে দিও।

আর এজন্যই ঠেলা চেয়ারটা ফেলে দেয়া হয়নি বা ফেরিওয়ালার কাছে বেঁচে দেয়া হয়নি। এমনকি ইয়োর্গেনকেও কথাটা জানিয়ে রাখা হয়েছিল। হামলেভেইয়েনে ওঠে আসার পর থেকে, একটা জিনিস স্পর্শ করা নিষেধ ছিল, আর তা হল লাল রঙের এই ঠেলা চেয়ারটা। সত্যি বলতে কি চেয়ারটার প্রতি ওর এতই ভক্তিশ্রদ্ধা ছিল যে সে মিরিয়ামের জন্যে একটা ঝকঝকে নতুন চেয়ার কিনে দিতে বাধ্য হয়। হয়তো ও চায়নি বহু বছর আগে ওর বুড়ো বাপ যে চেয়ারটা নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে, তাতে চড়ে ওর নিজের মেয়েও চলাচল করুক। তবে মেয়ের জন্য একটা ফ্যাশানদুরস্ত আধুনিক ঠেলা চেয়ার কিনে দেয়ার চিন্তাটাও মাথায় আসা সম্ভব। আসলে ফ্যাশনের ব্যাপারে ওর খুঁতখুঁতে ভাবটাকে আদিখ্যেতা না বলাই ভালো।

তাহলে একটা ছিল চিঠি আর একটা ঠেলা চেয়ার। তবে ধাঁধাটার জট খুলতে দাদীমার গেল এগারটি বছর। হঠাৎ করেই ওর মাথায় খেয়াল এল, পুরনো চেয়ারটাকে একটা মেকারের দোকানে নিয়ে গিয়ে একটু পরীক্ষা করে দেখলে কেমন হয়। আর দাদীমার সন্দেহটাই যথার্থ ছিল, ঠেলা চেয়ারটা কেবলই ঠেলাচেয়ার ছিল না। ওটা ছিল আসলে একটা লেটারবক্স।

গল্পটা আমি যে ষোলআনা বিশ্বাস করতে পেরেছি তা নয়। বাবা-মা অথবা দাদা-দাদী যে সত্য বলবে এটা কখনই নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। বিশেষ করে যখন স্পর্শকাতর বিষয় জড়িত থাকে, কথাটা অবশ্য দাদীমার মুখ থেকেই শোনা।

পেছন ফিরে তাকালে যে বিষয়টা আমার সবচেয়ে রহস্যজনক মনে হয়, তা হল এগার বছর আগে হঠাৎ করেই কেন দাদুর কম্পিউটারটা কাজ করা বন্ধ করে দেয়। ঐ কম্পিউটারেই বাবা চিঠিটা লিখেছিল। ওরা অবশ্য কম্পিউটারটা চালু করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তার পাসওয়ার্ড কল্পনা করতে পারেনি। শব্দটা ছিল সর্বাধিক আট অক্ষরের। তখনকার দিনে কম্পিউটারের এটাই ছিল সর্বোচ্চ সীমা। মা চেষ্টা করেও সেটা ডিকোড করতে পারেনি। অবিশ্বাস্য ব্যাপার। কাজেই ওরা কম্পিউটারটা চিলেকোঠায় ফেলে রেখেছিল।

তবে বাবার পিসিটা ছিল একটু অন্য ধরনের, অবশ্য সেকথা পরে বলব।

এবার সময় হল বাবার কথা শোনার। এর মাঝে অবশ্য মাঝেমধ্যে আমার মন্তব্য ছুঁড়ে দিতে হবে। একটা পরিশিষ্টও জুড়ে দিতে হবে। আমাকে এটা করতে হবে এজন্য যে চিঠিটা লেখার কালে বাবা আমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করেছিল। আজ যখন তার জবাব দেবার সময় হল, তখন তো অনেক কিছুই বদলে গেছে।

একটা কোকের বোতল আর চিঠিটা নিয়ে আমার ঘরে ঢুকলাম। যখন জীবনে প্রথম বারের মতো ভেতর থেকে খিল এঁটে দিলাম, তখন মা অবশ্য অনেক চেঁচামেচি করেছিল, তবে সে ভালো করেই জানত এতে কোনো ফল হবে না।

যে লোক আর ইহজগতে নাই, তার চিঠি পড়া এমনই এক অস্বাভাবিক ব্যাপার যে স্বতই আমার ধারণা হল, আমার সকল আত্মীয়স্বজন চারপাশে কান খাড়া করে আছে। হাজার হলেও এটা আমার বাবার নিজের হাতের লেখা চিঠি, যে গত হয়েছে আজ থেকে এগার বছর আগে। আমার প্রয়োজন নিশ্ছিদ্র নীরবতা।

এতগুলি প্রিন্ট-আউট পাতা হাতে ধরে কেমন যেন অবাক লাগছে। মনে হল বাবার অনেকগুলো ছবির এক অদেখা অ্যালবাম। বাইরে ভারী তুষারপাত হচ্ছে। আমার সঙ্গীতের ক্লাস শেষে বাড়ি ফেরার পথেই তুষারপাত শুরু হয়েছিল। মনে হয় তুষারপাত বেশিক্ষণ স্থায়ী হবে না। এটা নভেম্বরের প্রথম দিক।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে পড়া শুরু করলাম।

তুমি আরাম করে বসেছ তো গিয়র্গ? কমপক্ষে শক্ত হয়ে বসাটা খুবই জরুরী, কারণ তোমাকে এমন একটা গল্প বলতে যাচ্ছি, যে তোমার আঙুল কামড়ানোর ইচ্ছে হবে। হয়তো তুমি এখন চামড়ার হলদে সোফাটায় গা এলিয়ে বসে রয়েছ। যদিও ইতিমধ্যে তোমরা ওটা বদলে ফেলেছ কিনা তা জানা সম্ভব নয়। তবে এটাও কল্পনা করা স্বাভাবিক যে তুমি হয়তো পুরনো রকিং চেয়ারটাতেই বসে আছ, কারণ তুমি ওটার দারণ ভক্ত ছিলে। নাকি তুমি খোলা ছাদে বসে রয়েছ? জানি না এটা বছরের কোন সময়। হয়তো তোমরা আর হামলেভেইয়েনেই বাস করছ না।

কি জানি কী অবস্থা?

আমি কিছুই জানি না। এখন প্রধানমন্ত্রী কে? জাতিসংঘের মহাসচিবের নাম কী? কথা প্রসঙ্গে হাব্‌ল টেলিস্কোপ এখন কোন পর্যায়ে? তুমি কি জান, মহাবিশ্ব কিভাবে বর্তমান পর্যায়ে এল এ সম্বন্ধে জ্যোতির্বিদরা নতুন কোনো তথ্য আবিষ্কার করতে পেরেছে কিনা?

বেশ কয়েকবার আমার চিন্তাকে ভবিষ্যতের মধ্যে প্রসারিত করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু আজ তোমার চেহারা কেমন সে সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ছবি কিছুতেই গড়ে তুলতে পারিনি। যেটুকু জানি তা হল আজ তুমি কেমন। এমন কি এটাও জানা সম্ভব নয়, আজ যখন তুমি এই চিঠি পড়ছ, তখন তোমার বয়স কত? হয়তো তোমার বয়স বার বা চৌদ্দ, আর আমি, তোমার বাবা-অনেক আগেই মাঝ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়েছি।

আসল ব্যাপার হল, ইতিমধ্যেই আমার নিজেকে ভূত বলে মনে হয়। প্রতিবার শ্বাস নেয়ার সময় আমার এই কথাটাই মনে হয়। আমি বুঝতে শিখেছি ভূতেরা কেন এমন দীর্ঘশ্বাস ফেলে আর নাকি সুরে কান্না করে। উত্তরপুরুষদের ভয় দেখাবার জন্যে নয়, আসলে ওদের শ্বাস নিতে দারুণ কষ্ট হয়।

অস্তিত্বের মাঝে আমাদের যে একটা স্থান আছে তাই নয়, আমাদের একটা বরাদ্দকৃত কালও রয়েছে। এর দ্বারাই বস্তু অস্তিত্ববান। তাই না দেখেও বলে দিতে পারি আমার চারপাশে কী কী আছে। আমি এখন যেসব অভিজ্ঞতার কথা লিখছি, অর্থাৎ তুমি যা পড়ছ। তোমার সাড়ে তিন বছর বয়সকালে উষ্ণ গ্রীষ্মের দিনগুলিতে আমরা যা কিছু আনন্দ উপভোগ করেছি, তার অধিকাংশই হয়তো তুমি ভুলে গিয়েছ। তবু দিনগুলি আমাদেরই রয়ে গেছে। আমাদের সামনে আরও অনেক সুন্দর মুহূর্ত অপেক্ষায় রয়েছে।

এই মুহূর্তে আমার চিন্তাকে অধিকার করে রয়েছে এমন কিছু কথা বলব যে সব দিন চলে গেছে, ছোটখাটো যে কাজগুলি আমরা এক সাথে করেছি, তার সবকিছুই আমাকে মনে করিয়ে দেয়ার সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেবে। আমি এখন দিন গণনা শুরু করে দিয়েছি। রোববারে আমরা ট্রাইভ্যান স্টারমেট অবজারভেশন টাওয়ারে উঠেছিলাম। ওখান থেকে রাজ্যের প্রায় অর্ধেকটা দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল; সুইডেনগামী গোটা রাস্তাটাই দেখা যাচ্ছিল। তোমার মা'ও ছিল। আমরা তিনজনই সেখানে ছিলাম। কথাটা কি তোমার মনে আছে?

তুমি কি চেষ্টা করে দেখতে পার না, গিয়র্গ? দেখই না চেষ্টা করে। কারণ সবকিছু তোমার মাঝেই জমা হয়ে রয়েছে।

তোমার মনে আছে কি, মস্ত একটা কাঠের রেলগাড়ি ছিল তোমার? প্রতিদিন তুমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওটা নিয়ে খেলতে। আমি এখন ওটার দিকে দৃষ্টি দিই। যখন আমি লিখছি, তখন দেখছি, রেলগাড়ি, লাইন, ফেরি নৌকা, সবকিছু বৈঠকখানার মেঝেতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, ঠিক যেমনটা একটু আগে তুমি রেখে গিয়েছিলে। শেষ পর্যন্ত ওখান থেকে তোমাকে টেনে তুলতে হয়, যাতে ঠিক সময় তুমি নার্সারী স্কুলে পৌঁছতে পার। মনে হয় যেন তোমার ছোট ছোট হাত দিয়ে আজও ওগুলো নাড়াচাড়া করছ। রেলগাড়িটা ছাড়া আর সবই যেখানকার সেখানেই রয়ে গেছে।

তোমার কি সেই কম্পিউটারটার কথা মনে আছে? সপ্তাহান্তে আমরা দুজনে একসাথে বসে গেম খেলতাম? নতুন অবস্থায় ওটা আমার পড়ার ঘরেই থাকত, কিন্তু গত সপ্তাহে নিচে বসার ঘরে সরিয়ে দিয়েছি। এখন আমার শুধুই ইচ্ছে করে যেখানে তোমার সব জিনিসপত্তর আছে আমিও ওখানেই গিয়ে থাকি। অবশ্য বিকেল বেলা, তুমি ও তোমার মা এখানে আস। তোমার দাদা দাদীও প্রায়ই আসে। আমার খুব ভালো লাগে।

তোমার সেই তিনচাকার সবুজ সাইকেলটার কথা মনে আছে তো? ওটা ছিল ঝকঝকে নতুন, আর খোয়া বিছানো বাড়ির প্রবেশ পথে ওটা দাঁড় করানো থাকত। যদি এখনও না ভুলে থাক, তবে তা নিশ্চয়ই এ জন্য যে হয়তো গ্যারাজ বা হিজিবিজি যন্ত্রপাতি রাখার ঘরে এখনও ওটা রয়ে গেছে। ওটার

অবস্থা কি বেহাল নয়? নাকি ওটা পুরনো জিনিস কেনার ফেরিওয়ালার কাছে বিক্রি হয়ে গেছে?

আর লাল ঠেলা চেয়ারটার অবস্থা কী, গিয়র্গ? হ্যাঁ চেয়ারটার অবস্থা বিশেষ প্রয়োজন।

লেক সংগসভানের চারপাশে চেয়ারটায় বসিয়ে তোমাকে যে ঘুরিয়ে আনা হত, তা নিশ্চয়ই মনে আছে? অথবা আমরা যে কেবিনে বেড়াতে গিয়েছিলাম। পর পর তিন হপ্তা শেষের ছুটিতে আমরা গিয়েছিলাম ফিয়েলস্টলেনে। তবে এই মুহূর্তে সব খুঁটিনাটি তোমাকে জিজ্ঞেস করব না, কারণ ওই সময়টা ছিল শুধুই তোমার আর আমার মধ্যে শুধু যেটুকু আছে সেটুকুই গ্রহণ করতে চাই। তোমাকে বলেছি, আমি একটা গল্প বলতে চাই, তবে যে চিঠির মাধ্যমে সেটা লিখতে চাই তার সঠিক সুর কী হওয়া উচিত সেটা ঠাওর করা তত সহজ নয়। আমার যেটুকু সাধ্য তা ব্যয় করে ফেলার মতো ভুলটা ইতিমধ্যে হয়তো করেই বসে আছি। তবে তুমি যখন এই চিঠিটা পড়ছ তখন তুমি আর বালক নও, সেই কোঁকড়ানো সোনালী চুলের বালক। হামাগুড়ি দেয়া বাচ্চাদের সাথে মহিলারা যেমন বকবক করে, ওটা বোকামী, কারণ এখন অমি যার কাছে পৌছতে চাই সে রীতিমতো বয়ঃপ্রাপ্ত কিশোর, যার সাথে কখনই আমার দেখা করা সম্ভব হয় নাই, বা কথা বলার সুযোগও হয় নাই।

ঘড়ির দিকে তাকাই তোমাকে নার্সারী স্কুলে দিয়ে আসার আধ ঘণ্টাও হয় নাই।

যখনই আমরা ছোট নদীটা পার হতাম, তুমি ঠেলা চেয়ার থেকে বের হয়ে নদীতে একটা কাঠি বা পাথর ছুঁড়ে দিতে, একদিন তুমি একটা খালি বোতল পেয়ে ওটাই ছুঁড়ে দিয়েছিলে, তোমাকে বিরত করার জন্য আমি আঙুল তুলি নাই। আজকাল তুমি অনেক বেশি স্বাধীনতা ভোগ করছ। আর নার্সারী স্কুলে পৌছামাত্রই তুমি স্কুলের মধ্যে ছুট দিতে, "আবার দেখা হবে" বলার মতো সময়ও হত না। মনে হত তোমার একদম সময় নাই। আমার সাথে কথা বলারও নয়। ভাবনাটা বিদঘুটে। বুড়োদের চাইতে বাচ্চাদের সময় কম: অথচ তাদের সামনে দীর্ঘ সময় পড়ে আছে।

আমার কথা বলতে গেলে, আমার বয়স অহংকার করার মতো নয়। আমি এখনও নিজেকে যুবক মনে করি, অন্তত একজন যুবা পিতা, আর এখনও অন্য কিছুর চাইতে, আমি সময়কে থামিয়ে দিতে চাই। আজকের দিনটা যদি অনন্তকাল স্থায়ী হত, তাহলে আমি কিছু মনে করতাম না। সন্ধ্যাও অবশ্য আসত, তার পর রাত, দিবসের রয়েছে তার নিজস্ব ধাঁচ। এর আবর্তন ছন্দ, তবে পরের দিনটা শুরু হত ঠিক সেখান থেকে, যেখান থেকে আগের দিনটা শুরু হয়েছিল।

তবে ইতিমধ্যে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, তার বাইরে কিছু দেখার ইচ্ছা আর অনুভব করি না। আমার যা আছে শুধু তার সাথেই মরিয়া হয়ে ঝুলে থাকতে চাই। তবে গিয়র্গ, চারপাশে রয়েছে অনেক তস্কর, অনাহূত অভ্যাগতরা আমার জীবনীশক্তি শুষে নিতে শুরু করেছে। ওদের লজ্জা পাওয়া উচিত।

এখনও তোমাকে নার্সারী স্কুলে নিয়ে যেতে ভালো লাগে, তবে কাজটা কঠিন হয়ে যাচ্ছে। যদিও এখনও চলাচল করতে তেমন কষ্ট হচ্ছে না, এমনকি তোমার চেয়ার ঠেলতেও না, তবে আমি জানি আমার দেহ রোগে জীর্ণ হয়ে আসছে।

এ এমন এক অসুখ যা রোগীকে সহসাই বিছানায় শুইয়ে দেয়। সাংঘাতিক অসুখগুলি রোগীকে শয্যাশায়ী করতে দীর্ঘ সময় লাগে। তোমার হয়তো মনে নাই আমি একজন ডাক্তার ছিলাম। হয়তো তোমার মা এ সম্বন্ধে তোমাকে কিছু বলে থাকবে। প্রকৃতপক্ষে এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। যদিও গ্রুপ প্র্যাকটিসের সময়ই আমি কাজটা ছেড়ে দিই, আমি জানি, আমি কী নিয়ে কথা বলছি। ধোকা খাওয়ার মতো রোগী আমি নই।

কাজেই আমাদের স্মৃতিচারণকে দুটি সময়কালে বিভক্ত করা যেতে পারে, অবশ্য বলা যায় আমাদের দুজনের সাক্ষাতের শেষ সময়কে। মনে হয় যেন আমরা দুজন দুটি কুয়াশাচ্ছন্ন পর্বত শিখরে দাঁড়িয়ে পরস্পরকে দেখার চেষ্টা করছি। মাঝখানে রয়েছে এক রহস্যঘেরা উপত্যকা। যে উপত্যকা তোমার ফেলে আসা জীবনযাপনের সময়ের পথ। তবে সেখানে তোমাকে দেখার জন্য বেঁচে থাকব না। তবু আমাকে দুটি প্রভাতের প্রসঙ্গ টেনে আনতে হবে, তোমার সেই নার্সারী স্কুলের সময়– যখন আমি এই লেখা লিখছি– আর এক সময় যখন তুমি আমার লেখা পড়ছ, তোমার সাথে আমি আর থাকব না, চিঠি হাতে নিয়ে তুমি একা বসে আছ।

আমাকে বলতেই হবে, পিতৃহীন এক বালকের কাছে চিঠি লিখতে লিখতে আমি মাঝে মাঝে আবেগতাড়িত হয়ে পড়ছি। আর সেই আবেগের অভিঘাত পাঠকের মনেও সঞ্চারিত হবে। কিন্তু এখন তুমি অনেকটা বয়ঃপ্রাপ্ত মানুষ আমি যদি কথাগুলো কাগজের পৃষ্ঠায় লেখার শক্তি অর্জন করে থাকি, তাহলে তোমাকে এগুলো পড়ার মতো সহনশীল হতে হবে।

তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, আমি সেই সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি, যখন আমাকে সবকিছু ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে, এই সূর্য এই চন্দ্র, এবং সমস্ত অস্তিত্ব, তার চাইতেও বড় তোমার মা, আর তোমার থেকে। এটাই সত্য, আর এটাই আমাকে ক্ষতবিক্ষত করছে।

এবার তোমাকে একটা কঠিন প্রশ্ন করব গিয়র্গ, প্রশ্নটা করতেই হবে, আর সেজন্যেই আমার এই লেখা। তবে প্রশ্নটা করার শক্তি অর্জন করার পূর্বে তোমাকে একটা পিলেচমকানো গল্প বলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, সেটি করতে হবে।

এক সময় তোমাকে বলেছিলাম, কোনো এক সময় কমলা সুন্দরীর গল্প শোনাব। আজ যখন এই গল্প লিখছি। তখনও তোমার গল্পটা বোঝার মতো বয়স হয় নাই। কাজেই এটা তোমার জন্য আমার এক ক্ষুদ্র ইচ্ছা– পত্ররূপে সংরক্ষিত থাকবে। তোমার আর একটা দিনের জন্য আমাকে প্রতীক্ষায় থাকতে হবে।

আর সেই দিনটাই আজকের এই দিন।

এটুকু পড়েই আমি চোখ তুলে তাকালাম। অনেকবার বাবাকে স্মরণ করার চেষ্টা করেছি। আজ আরেকবার করছি। সেও আমাকে স্মরণ করতে বলেছে। তবে আমি যেটুকু সক্ষম, তার উৎস ভিডিও আর ফটো অ্যালবাম।

আর একটা কথা মনে পড়ছে। ছোটবেলায় আমার সম্ভবত এক কাঠের ট্রেন ছিল, কিন্তু ওটাও বাবাকে স্মরণ করতে সাহায্য করল না। সবুজ রংয়ের তিন চাকার সাইকেলটা এখনও গ্যারেজে পড়ে রয়েছে। আমি নিশ্চিত ওটা হয়তো আমার বাল্য স্মৃতি পুনরুদ্ধারে সহায়তা করবে। আর পুরনো যন্ত্রপাতি রাখার ঘরে দীর্ঘদিন লাল ঠেলা চেয়ারটা পড়ে ছিল। তবে সংগ্রজভান লেকের ধারে ঘুরে কোনো স্মৃতিই আর উজ্জীবিত করতে পারছি না। ট্রাইভাল্ট্রারনেট অবজারভেশন টাওয়ারে বাবার সাথে ভ্রমণের স্মৃতিটাকেও আর টেনে আনতে পারছি না। আমি অনেকবার অবজারভেশন টাওয়ারে গেছি, তবে, মা আর ইয়োর্গেনের সাথে। একবার শুধু ইয়োর্গেনের সাথেই গিয়েছিলাম। মিরিয়ামের জন্মের পর মা যখন হাসপাতালে ছিল।

অবশ্য ফিয়েলস্টলেন কেবিনের টনখানেক স্মৃতি আমার সঞ্চিত আছে, তবে সেখানে বাবার কোনো জায়গা ছিল না, ছিল শুধু মা, ইয়োর্গেন আর ছোট্ট মিরিয়াম। আমাদের বাড়িতে অবশ্য একটা গেস্টবুক ছিল, আমি প্রায়ই ওট পড়ে দেখতাম ওখানে বাবা তার কোনো স্মৃতিকথা লিখেছে কিনা। তবে সমস্যা হল ওর কিছু লিখার স্মৃতি আমার মধ্যে একটুও নাই। এটা মোটামুটি ফটো আর ভিডিওগুলোর মতোই। "ঈস্টার স্যাটারডেতে ভাঙ্গা বরফের ঈগলু বানিয়েছিলাম। যাতে ছিল একটা তুষার লণ্ঠন। এগুলো অবশ্য গেস্টবুকের এন্ট্রিতে আছে, আর কোনো কোনোটা আছে আমার স্মৃতিতেও। অবশ্য আমি সব লেখাগুলোই ইতিপূর্বে পড়েছি। কোনো কোনোটা আমার কণ্ঠস্থ আছে। তবে আমিও যে ঘটনাগুলোর অংশ ছিলাম, তা কিছুতেই স্মরণে আনতে পারছিলাম না। আমি আর বাবা যখন সেই রেকর্ডভাঙ্গা ঈগলু আর তার মধ্যে তুষার লণ্ঠন বানিয়েছিলাম, তখন আমার বয়েস আড়াই বছরের বেশি ছিল না। এটার একটা

ছবিও আছে, তবে সেটা এত ঝাপসা হয়ে গেছে যে মোমবাতির আলো ছাড়া আর কিছুই নজরে আসে না।

তবে বাবার লেখা যে চিঠিটা আমি এইমাত্র পড়া শুরু করেছি, তাতে অন্য একটা ব্যাপার ছিল, যা বাবা আমাকে জিজ্ঞেস করেছে।

> প্রসঙ্গক্রমে হাব্‌ল স্পেস টেলিস্কোপটা কেমন কাজ করছে? তুমি কি সেটা জানো? আমাদের মহাবিশ্ব কীভাবে সাকার হল সে সম্বন্ধে জ্যোতির্বিদরা কি কোনো নতুন তথ্য পেয়েছে?

এই কথাটা পড়ে আমার শিরদাঁড়া বেয়ে একটা কাঁপন নেমে গেল। কারণ অতি সম্প্রতি আমি হাব্‌ল স্পেস টেলিস্কোপের ওপর একটা নির্ধারিত থিসিস সবেমাত্র শেষ করেছি। আমার অন্য ছেলেমেয়েরা কেউ লিখেছে ব্রিটিশ ফুটবলের ওপর, কেউ স্পাইস গার্ল আবার কেউ রোনাল্ড ডাহলের ওপর। কিন্তু আমি লাইব্রেরীতে গিয়ে হাব্‌ল স্পেস টেলিস্কোপের ওপর যত লেখা আছে, আমার স্পেশাল অ্যাসাইনমেন্টের জন্য যেগুলো দরকার মনে করেছি, তার সবগুলো নিয়ে আসি, মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে আমার ফাইলটা শিক্ষকের কাছে হস্তান্তর করেছি আর ফাইলটাতে তিনি মন্তব্য লিখেন, "একটা কঠিন বিষয়ের ওপর এমন পরিপক্ব, সুচিন্তিত ও তথ্যসমৃদ্ধ" নিবন্ধ পড়ে তিনি অভিভূত। তার এই প্রশংসাবাক্যটা পড়ে আমি যেমন গর্ববোধ করেছিলাম, এমনটা জীবনে কখনও বোধ করিনি। তাছাড়া তিনি ওটার ওপর একটা লরেন্সের মুকুট এঁকে দেন।

বাবা কি ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ছিলেন? নাকি হাব্‌ল স্পেস টেলিস্কোপের ওপর আমার স্পেশাল অ্যাসাইনমেন্টটা শেষ করার কয়েক সপ্তাহ বাদেই তিনি আমাকে এর ওপর প্রশ্ন করবেন, সেটা নেহাৎই কাকতালীয়?

বাবার লেখাটা কি জাল হতে পারে, নাকি সে এখনও বেঁচে আছে। একটা শীতল অনুভূতি নেমে গেল।

বিছানায় শুয়ে কঠিন ভাবনায় আচ্ছন্ন হয়ে রইলাম। স্পেস শাট্‌ল্ ডিসকভারী যোগে হাব্‌ল স্পেস টেলিস্কোপ পৃথিবী পরিক্রমায় পাঠানো হয় ১৯৯০ সালের ২৫ এপ্রিল তারিখে। ঠিক এর কাছাকাছি সময়ে বাবা অসুস্থ হয়ে পড়ে, ঈস্টার উৎসবের পরপরই তার অসুখটার সূত্রপাত হয়। ঠিক বলা যাবে না হাব্‌ল স্পেস শাট্‌ল্ উৎক্ষেপণের সাথে ওর অসুস্থতার কোনো কাকতালীয় সম্পর্ক আছে কিনা। বাবা হাব্‌ল স্পেস টেলিস্কোপ ডিসকভারী স্পেস শাট্‌ল্ যোগে উৎক্ষেপণের সাথে দিনক্ষণ, ঘণ্টা মিনিট মিলিয়ে ও অসুস্থ হয়ে পড়ে। যদি তাই হয় তাহলে স্পেস টেলিস্কোপের ভাগ্য নিয়ে তার দুর্ভাবনার যথেষ্ট কারণ ছিল। সত্যি কথা হল, ওরা শিগগিরই আবিষ্কার করতে পারে টেলিস্কোপের প্রধান লেন্সের অপটিক্স গ্লাসে

গুরুতর সমস্যা রয়েছে। বাবা জানতে পারে যে ১৯৯৩ সালে স্পেস শাটলে করে মহাশূন্যচারী পাঠিয়ে ত্রুটিটা সংশোধন করা হয়, আর সেটা ঘটেছিল বাবার মৃত্যুর ঠিক তিন বছর পরে। আর সে এটাও জানতে পারেনি ১৯৯৭ সালে অদ্ভুত কিছু যন্ত্রপাতি এতে সংযোজন করা হয়েছিল।

বাবা এও জেনে যেতে পারেনি যে হাব্‌ল স্পেস টেলিস্কোপের পাঠানো মহাবিশ্বের চিত্রই এ যাবৎ কালের ছবির মধ্যে সবচেয়ে পরিষ্কার ও সর্বোৎকৃষ্ট। এর অসংখ্য ছবি আমি ইন্টারনেটের মাধ্যমে দেখেছি ও বিরাট ছবির স্তূপ সংগ্রহ করেছি আমার স্পেশাল অ্যাসাইনমেন্টের জন্যে। এর মধ্যে কয়েকটা ছবি, যেগুলো আমার প্রিয় তা এখনও আমার দেয়ালে ঝুলছে, তার মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় আমাদের সৌরজগত থেকে ৮০০০ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত বিশাল তারকা *ইটা কারিনার* স্ফটিকস্বচ্ছ ছবি। ইটা কারিনা আমাদের ছায়াপথের দৈত্যাকার তারকাগুলির মধ্যে অন্যতম যেটা অল্প সময়ের ব্যবধানে সুপারনোভায় বিস্ফারিত হয়ে নিউট্রন স্টারে পরিণত হয়ে অবশেষে ব্ল্যাক হোলে বিলীন হয়ে যাবে। প্রিয় ছবিগুলির আর একটা হল ঈগল নীহারিকার (এম ১৬ বলেও যার পরিচয়) বিশাল বাষ্প আর ধূসর মেঘ। এখান থেকেই নতুন তারকাদের জন্ম হয়।

১৯৯০ সালে মহাবিশ্ব সম্বন্ধে আমাদের কতটুকু জানাশোনা ছিল, এখন তার চাইতে আমাদের জ্ঞানের ভাণ্ডার অনেক বেশি সমৃদ্ধ। এর কৃতিত্ব মূলত হাব্‌ল স্পেস টেলিস্কোপের। আমাদের নিজস্ব ছায়াপথ আকাশগঙ্গা থেকে লক্ষ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরের অসংখ্য ছায়াপথ ও নীহারিকার হাজার হাজার ছবি পৃথিবীতে পাঠিয়েছে। এই হাব্‌ল টেলিস্কোপ। মহাবিশ্বের অতীতেরও কিছু অবিশ্বাস্য ছবি পাঠিয়েছে মহাবিশ্বের অতীতের ছবি কথাটা শুনে পাগলামী মনে হতে পারে। মহাবিশ্বকে পেছনে ফিরে দেখার অর্থ সময়কে পেছন ফিরে দেখা। আলোর গতিবেগ সেকেন্ডে ৩০০,০০০ কিলোমিটার, তৎসত্ত্বেও সুদূরবর্তী ছায়াপথ থেকে আলো পৃথিবীতে পৌঁছতে লক্ষকোটি আলোকবর্ষ পেরিয়ে যায়। মহাবিশ্ব এমনি বিপুলায়তন। কিন্তু তার মাঝেও এই টেলিস্কোপ মহাবিশ্বের ১২ বিলিয়ন বর্ষ অতীতে দৃষ্টি মেলে দিতে সক্ষম হয়েছে। এটা বুদ্ধিকে আড়ষ্ট করে ফেলে, কারণ সে সময় পৃথিবীর বয়স মাত্র ১ বিলিয়ন বছর। প্রকৃতপক্ষে হাব্‌ল স্পেস টেলিস্কোপ সরাসরি মহাবিস্ফোরণের ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে সক্ষম হয়, যে সময় সবে টাইম ও স্পেস তৈরি হতে শুরু করেছে। আমি এসব ব্যাপার অল্পস্বল্প জানতাম আর তাই সাবধান হতে হবে, যাতে আমার জানা সবকিছু লিখে না ফেলি। যে নিবন্ধটা আমার শিক্ষকের কাছে জমা দেই সেটা ছিল সাতচল্লিশ পৃষ্ঠার।

স্পেস টেলিস্কোপ নিয়ে বাবা আমাকে লিখবে, ব্যাপারটা কেমন যেন ভৌতিক বলে মনে হল। স্পেস রিসার্চের প্রতি চিরকালই আমার দুর্নিবার আকর্ষণ ছিল এবং আমাদের পরিচিত এই গ্রহের নৈমিত্তিক ঘটনা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আকাশের দিকে

তাকানোর আগ্রহটা আমার উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া। তবে আমি তো সহজেই আমার গবেষণার বিষয় নির্বাচন করতে পারতাম এপলো কর্মসূচী বা চাঁদে প্রথম মানুষ সম্বন্ধে। আমি ছায়াপথ বা কৃষ্ণ গহ্বর নিয়েও তো লিখতে পারতাম, কৃষ্ণ গহ্বরের সাথে ছায়াপথের সম্পর্ক নিয়ে নাই বা হল। নয়টি গ্রহ আর বৃহস্পতি মঙ্গলের মাঝে বিশাল গ্রহানুপুঞ্জ চক্র নিয়েও তো লিখতে পারতাম। অথবা লিখতে পারতাম হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের বিশাল টেলিস্কোপ নিয়ে। তা না করে আমি নির্বাচন করলাম হাব্‌ল স্পেস টেলিস্কোপ। বাবা এটা কীভাবে অনুমান করতে পারল?

এটা বোঝা সহজ সে কেন জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেলের কথা উল্লেখ করেছে। কারণটা নিশ্চয়ই ছিল আমার জন্ম ২৪ অক্টোবর, জাতিসংঘ দিবসে। জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেলের নাম কোফি আনান। আর নরওয়ের প্রধানমন্ত্রীর নাম কিয়েল ম্যাগনে বন্দেভিক। তিনি সবেমাত্র জাঁ স্তলতেনবার্গের স্থান গ্রহণ করেছেন।

বসে বসে চিন্তা করছিলাম। মা দরজায় টোকা দিল, "ব্যাপার কী?" "আমাকে বিরক্ত করো না," শুধু এটুকুই বললাম। সবেমাত্র চার পাতা পড়েছি।

আমি ভাবলাম: বল না বাবা, আমাকে কমলা সুন্দরীর কথা বল। আমি এখানে বসা। সময় এসেছে। এখন পড়ার সময়।

কমলা সুন্দরী গল্পের শুরু এক বিকালে যখন আমি ন্যাশনাল থিয়েটারের বাইরে ট্রামের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। সময়টা ছিল সত্তরের দশকের শরতের শেষ দিক।

আমার বেশ মনে আছে সদ্য শুরু করা মেডিক্যাল কোর্স নিয়ে ভাবছি। ভাবতে বেশ শিহরণ জাগছিল, একদিন আমি সত্যিকার ডাক্তার হব, আর সত্যিকার রোগী এসে তাদের ভাগ্য আমার হাতে ন্যস্ত করবে। আমি ডাক্তারদের সাদা পোশাক পরে ডেস্কের পেছনে আয়েশ করে বসে বলব: "ভালো কথা, মিসেস যোহানসেন, আপনার কিছু রক্তের পরীক্ষা করতে হবে অথবা বলব, কতদিন ধরে আপনার এই সমস্যা?"

শেষ পর্যন্ত ট্রাম এল। অনেক দূর থেকে ওটাকে দেখতে পেলাম, তারপর পার্লামেন্ট বিল্ডিং এর পাশ কাটিয়ে স্টরটিংসগ্যাটেনের দিকে গড়িয়ে চলল। আমার বেলা সব সময় যে সমস্যাটা হয়ে থাকে তা হল, আমি কোথায় যাচ্ছি, সেটা প্রায়ই মনে থাকে না। সে যা হোক শিগগিরই আমি উজ্জ্বল নীল রঙের ফোনার ট্রামে চেপে বসলাম, ট্রামটা লোকে ঠাসাঠাসি।

প্রথম যে জিনিসটা আমার নজরে এল তা হল এক অনিন্দ্যসুন্দর বালিকা। মাঝের গলিপথে দাঁড়িয়ে, ওর হাতে শক্ত করে ধরা কানায় কানায় পূর্ণ কাগজের ব্যাগভর্তি লোভনীয় কমলা। ওর পরনে কমলা রংয়ের পশমওয়ালা চামড়ার

কোট। ওর ব্যাগটা এত বড় আর ভারী যে মনে হচ্ছিল যে কোনো সময় হাত থেকে খসে পড়বে। ওর প্রতি আমার যে অনুভূতি তা শধু ব্যাগের বিশালত্বের জন্যে নয়, বালিকা নিজে। বুঝতে বেশি সময় লাগল না যে ওর মাঝে কিছু বিশেষত্ব আছে, কিছু যাদুকরী সম্মোহনী শক্তি।

আমি আরও বুঝতে পারি ট্রামের মধ্যে অসংখ্য মানুষের মাঝে ওর চোখের দৃষ্টি আমাকে সহজেই আলাদা করে নিতে পেরেছে। এতে ওর মাত্র কয়েক মুহূর্ত সময় লেগেছে, মনে হয় যেন বহুকাল থেকে আমাদের মাঝে গোপন সমঝোতা রয়েছে। অমি ভেতরে ঢোকামাত্র ওর অপলক দৃষ্টি আমাকে বেঁধে ফেলল, এবং সম্ভবত আমিও প্রথমে দৃষ্টি সরিয়ে নিলাম, কারণ তখন আমি ছিলাম বেশ অস্বাভাবিক লাজুক। তবু আমার মনে তখন নির্মল মোলায়েম যে চিন্তা তা হল, এই মেয়েটিকে কখনই ভোলা সম্ভব নয়। আমি তার নাম পরিচয় কিছুই জানতে পারিনি, তবু প্রথম দৃষ্টি বিনিময়ের মুহূর্ত থেকে সে আমার পরে এক অশরীরী প্রভাব বিস্তার করেছিল।

ও লম্বায় ছিল আমার মাথার অর্ধেক পর্যন্ত, লম্বা কালো চুল, বাদামী চোখ। বয়স আমার বয়সের আশপাশে উনিশ। চোখ তুলে যখন তাকাল, মনে হল বুঝি সামান্য লভ করল, তবে ওর মাথা বিন্দুমাত্র দোলেনি, আমার দিকে একটা দুষ্টুমীভরা হাসিও ছুঁড়ে দিল, প্রায় মনে হল কোনো এককালে, বহুকাল আগে আমরা যেন সারাজীবনে পরস্পরের অংশীদার ছিলাম। এসব আমি যেন ওর বাদামী চোখে স্পষ্ট পড়তে পারছি।

ওর মিষ্টি হাসি গালে দুটি টোল তৈরি করল। মনে হল ও একটা কাঠবিড়ালী, এমনি মিষ্টি মেয়ে সে। আমরা যদি কখনও একসাথে জীবনযাপন করেই থাকি, তাহলে তা নিশ্চয়ই গাছের ডালে দুটি কাঠবিড়ালী। তবে এই সুন্দরী কমলা সুন্দরীর সাথে একত্রে কাঠবিড়ালীর জীবনযাপন কখনই সুখকর চিন্তা হতে পারে না।

কিন্তু ওর হাসি কেন এমন পরিচিত, এমন উন্মাতাল? সত্যি কি আমিই তার হাসির নিশানা? নাকি তার মনের কোনো মজাদার ভাবনায় আপন মনে হেসেছে? যার সাথে আমার কোনো প্রাসঙ্গিকতা নেই। এদিকটাও অবশ্যই আমাকে ভেবে দেখতে হবে। আমার চেহারাটাও এমন মোহনীয় কিছু নয়, নেহাত আটপৌরে। আর হাস্যকর যদি কিছু থেকেই থাকে, তাহলে আমি নই, বরং বিশাল একবোঝা কমলা পেটের সাথে চেপে ধরে সেই নিজেকে হাস্যকর করে তুলেছে। হয়তো এজন্যই সে লাজুক হাসি হাসছে। সবার অবশ্য এই দক্ষতা থাকে না।

পুনরায় তার চোখের দিকে তাকাবার সাহস হল না। আমি শুধু ওর বিপুলায়তন কমলার ব্যাগটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমার ধারণা মিনিট

খানেকের মধ্যেই ওটা তার হাত থেকে খসে পড়বে। প্রবল চেষ্টায় সে আঁকড়ে ধরে আছে। নাহ্, শেষ পর্যন্ত পড়েই গেল।

কমপক্ষে পাঁচ কিলো কমলা তো ছিলই, আট বা দশ কিলোও হতে পারে।

ট্রামটা এগিয়ে চলেছে ড্রামেন্সভিয়েনের দিকে। ঝাঁকি খাচ্ছে, দুলছে, ইউএস এম্ব্যাসির সামনে এসে থামল। সলি প্লাসে থামল, তারপর মোড় নিল ফ্রনার ভিয়েনের দিকে, সারাক্ষণ আমার মনে যে আশঙ্কা, অবশেষে তাই ঘটল। ফ্রনারে এসে ট্রামটা বিপজ্জনকভাবে কাৎ হয়ে গেল, অথবা আমার ধারণা এটা উল্টে যাবে, কমলা সুন্দরী সামান্য টলমল করল, আর সেকেন্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে আমার মাথায় খেলে গেল সর্বনাশের হাত থেকে ওকে বাঁচাতে হবে। এই মুহূর্তে... না, না, এক্ষুনি!

ঠিক তক্ষুনি করে বসি সেই দুর্ভাগ্যজনক হিসাবের মহাভুল। আগ বাড়িয়ে ভুল কাজটা করে বসলাম। দৃঢ়ভাবে আমার দুই হাত এগিয়ে দিলাম। এক হাতে আগলে ধরলাম বাদামী রঙের কাগজের ব্যাগ। আর অন্য হাতে জড়িয়ে ধরলাম বালিকার কটিদেশ। এরপর কী ঘটতে পারে বলে আপনাদের ধারণা? আসলে যা ঘটল তা হল, কমলা রঙের লোমওয়ালা কোট পরিহিতা মহিলার কমলার ব্যাগটা খোয়া গেল, বরং তার শক্ত হাতের কব্জা আমিই আলগা করে ঠেলে দিলাম, যে কেউ অনায়াসে ভাবতে পারে আক্রোশ বসেই আমি কাজটা করে বসেছি। শোচনীয় ফলটা এই দাঁড়াল ত্রিশ চল্লিশটা কমলা ট্রামের মধ্যে গড়াগড়ি যেতে থাকে। ইতিমধ্যে আমি অসংখ্য আহাম্মুকী কাজ করেছি। তবে এটাই আমার সেরা আহাম্মুকী। আমার সারা জীবনের সবচেয়ে বিব্রতকর মুহূর্ত এটি।

কমলার কপালে যা লেখা ছিল তা হয়েই গেল, আরো দু'চার সেকেন্ড ওগুলো গড়াতে থাক। কারণ ট্রামের আসল কেচ্ছা ওদেরকে নিয়ে নয়। শিগগিরই মেয়েটি আমার দিকে চোখ তোলে, এবার ওর মুখে সেই স্মিতহাসি ছিল না। প্রথমে তাকে মনে হল বিব্রত, কারণ একটা অন্ধকার ছায়া তার মুখমণ্ডল আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তার মনোভাব ঠাওর করতে পারছিলাম না। অবশ্যই না, তবে মনে হল যে কোনো মুহূর্তে কান্নায় ভেঙ্গে পড়বে। প্রত্যেকটা কমলাই যেন ওর জন্য বিশেষ তাৎপর্য বহন করে, ঠিক তাই গিয়র্গ, যেন কমলাগুলোর কোনোটার বদলেই অন্য একটা দিয়ে ক্ষতিপূরণ হতে পারে না। এই অবস্থাটা দ্রুত অতিক্রান্ত হয়ে গেল, কারণ পর মুহূর্তে বিরক্তিভরা অভিব্যক্তি নিয়ে সে আমার মুখের দিকে তাকায়। তার মুখ দেখে স্পষ্টই প্রতীয়মান হচ্ছিল, ঘটনার জন্য সে সম্পূর্ণরূপে আমাকেই দায়ী করে। মনে হয় যেন তার সারাটা জীবন আমি বরবাদ করে দিয়েছি, আমার নিজের কথা না হয় বাদই দিলাম। মনে হল যেন আমার গোটা ভবিষ্যৎটা আমি ধ্বংস করে দিয়েছি।

সেদিন তুমি যদি আমার সাথে থাকতে তাহলে হয়তো পরিস্থিটিটা কিছুটা হালকা করে দিতে পারতে। হয়তো হালকা কোনো পরিহাসের কথা বলে, তার যুদ্ধংদেহী মনোভাব সংবরণে সাহায্য করতে পারতে। তবে সে মুহূর্তে আমার পক্ষে দাঁড়াবার মতো ক্ষুদ্র কোনো প্রাণীও ছিল না– কারণ তোমার জন্ম হয়েছিল এর বহু বছর পরে।

লজ্জায় বিধ্বস্ত হয়ে আমি চার হাত পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে নোংরা গোবর মাখা জুতো পায়ের জঙ্গলের মধ্য থেকে একটা একটা করে কমলা কুড়াতে থাকি। তবে সামান্যসংখ্যক ফলই মাত্র পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হল। শিগগিরই আবিষ্কার করলাম যে ব্যাগটা কমলাগুলো ধারণ করেছিল সেটা ফেটে গেছে। ওটা আর ব্যবহারযোগ্য নেই। আক্ষরিক অর্থেই এই বালিকার সামনে আমি যেন মাটির ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেলাম। বেশ কিছু যাত্রী মজা পেয়ে ফিক ফিক করে হাসতে থাকে তবে বলতে হবে তারাই মোটামুটি কোমল স্বভাবের, কারণ ট্রামের মধ্যে ক্ষিপ্ত কঠিন মুখমণ্ডলের অভাব ছিল না। ট্রামটা ছিল লোকে ঠাসাঠাসি আর কাণ্ডটা সত্যিই অসহনীয়। যারা ঘটনাটা প্রত্যক্ষ করেছে, তাদের দৃষ্টিতে আমিই ছিলাম প্রকৃত অপরাধী। এই মুহূর্তে আমার মাথায় যে চিন্তাটা খেলছে তা হচ্ছে, বীরদর্পে পলায়ন।

সেই অশুভ ট্রাম যাত্রার সর্বশেষ যে চিত্রটি আমার স্মৃতিতে অম্লান তা হল: দুই বাহু বেষ্টনিতে কমলা বোঝাই করে নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি, গোটাদুয়েক আমার পকেটেও বোঝাই করে নিয়েছি। কমলা রঙের লোমওয়ালা কোট পরিহিতা মেয়েটার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই সোজা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলে ওঠে: 'হাঁদারাম কোথাকার।'

আমাকে কঠিন তিরস্কার করা হল সন্দেহ নাই। তারপর কিছুটা নরম হয়ে আর কিছুটা উপহাসমিশ্রিত রসিকতা করে বলে: 'একখানা কমলার ভাগ কি আমিও পেতে পারি?'

আমার শুষ্ক কণ্ঠে যে কথাটা উচ্চারণ করতে পারলাম তা হল, 'দুঃখিত, ভীষণভাবে দুঃখিত!'

ঠিক তখ্খনি ট্রাম এসে থামল ফ্রনারে মলহওসেন কাফের সামনে এসে। আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে শুধু মাথা নাড়লাম। আমাকে হতবাক করে দিয়ে মেয়েটা হাসি মুখে ট্রাম থেকে নেমে গেল ঠিক যেন রূপকথার পরীর মতো, আর যাবার আগে আমার বাহুবন্ধন থেকে খেলাচ্ছলে একটা কমলা তুলে নিয়ে গেল।

ট্রামটা ঝাঁকি দিয়ে চলতে শুরু করল। তারপর গড়িয়ে চলল ফ্রোনারভেইয়েনের দিকে।

'আমি কি একটা কমলা নিতে পারি গিয়র্গ?' আমার বাহুবন্ধনীতে বা আমার পকেটে যে কমলাগুলো, আসলে তো ওগুলি ওরই, আর ট্রামের মেঝেতে গড়াগড়ি যাচ্ছিল অনেকগুলো।

আমার বাহুবেষ্টনীতে অনেকগুলো কমলা, যেগুলো আমার নয়। নিজেকে মনে হচ্ছিল জঘন্য এক কমলাচোর– দুচার জন যাত্রী তো ছোটখাটো মন্তব্য ছুঁড়ে দিয়ে এমনটাই ইঙ্গিত করছিল আর আমার মনের মধ্যে কী প্রচণ্ড ঝড় বয়ে চলেছে, তা আর মনে নেই। তারপর পরবর্তী স্টপেজে, ফ্রোনার প্লাজে আমি সুড়সুড় করে নেমে পড়লাম।

ট্রাম থেকে নেমে প্রথমেই যে চিন্তাটা মাথায় এল, তা হল, ওগুলো কোথাও সরিয়ে ফেলতে হবে। আমাকে পায়ে রশিবাঁধা কয়েদীর মতো টলমল করে চলতে হচ্ছিল, যাতে কমলাগুলো পড়ে না যায়, তার পরেও দুচারটা পাকা রাস্তায় গড়িয়ে পড়েছিল। আবার ঝুঁকে পড়ে ওগুলো কুড়োবার ঝুঁকিও নিতে পারছিলাম না।

কিছুক্ষণ পর দেখলাম ফ্রোনার প্লাজ মাছের বাজারে এক মহিলা প্যারামবুলেটরে একটা বাচ্চা ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় সুকৌশলে কমলাগুলো বাচ্চাটার পাশে ঢেলে দিলাম, এমনকি পকেটের কটাও ছুঁড়ে দিলাম। দু'এক সেকেন্ডের কাজ মাত্র।

গিয়র্গ, তুমি যদি ঐ মহিলার হতভম্ব মুখের দিকে তাকাতে পারতে। মনে হল মহিলাকে কিছু বলা দরকার। তাই তাকে অনুরোধ করলাম আমার পক্ষ থেকে বেবীর জন্য সামান্য উপহার তিনি যেন গ্রহণ করেন, কারণ শীতের প্রাক্কালে বাচ্চাদের যথেষ্ট ভিটামিন সি'র প্রয়োজন। আরো যোগ করলাম মেডিকেলের ছাত্র হিসাবে বিষয়টা আমার জানা।

নিশ্চয়ই মহিলা ভাবল আমি একজন অশালীন লোক, কিছুটা মাতালও বটে, সে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করেনি আমি চিকিৎসাবিদ্যার একজন ছাত্র। ওর কোনো জবাবের অপেক্ষা না করেই আমি ফ্রোনার ভেইয়েনের দিকে ছুটতে শুরু করেছি। আমার মাথার মধ্যে তখন একটাই চিন্তা: কমলা সুন্দরীকে খুঁজে বের করতেই হবে। যত শীঘ্র সম্ভব তার পাত্তা লাগিয়ে ক্ষমা চাইতে হবে।

আমার জানা নেই শহরের ঐ অঞ্চলটা সম্বন্ধে তোমার কতটা জানাশোনা আছে, তবে নিশ্বাস বন্ধ করে আমি ছুটে এসে পৌছলাম সেই চৌরাস্তার যেখানে ফোনারভেইয়েন, ফেডরিক স্ট্র্যাং গেইট, এলিয়েনবার্গভেইয়েন আর লাভেন স্ফিওল্ডস্‌গেইটের রাস্তা একত্র মিলিত হয়েছে, যেখানে রহস্যময়ী সেই মেয়েটি একটামাত্র কমলা হাতে নিয়ে নেমে গিয়েছিল। আমি হয়তো পারির প্লাস দ্য ইতোইল এর রাস্তার মাথাতেও দাঁড়িয়ে থাকতে পারতাম, এত সব রাস্তার মাঝ

থেকে যেকোন একটাই তো বেছে নেয়া যেত। কিন্তু কমলা সুন্দরী চিরতরে হারিয়ে গেল।

সেদিন সারাটা বিকেল ফ্রোনারের রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করে কাটিয়ে দিলাম। হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে গেলাম ব্রিকসবির ফায়ার স্টেশন পর্যন্ত, সেখান থেকে ফিরে এগিয়ে গেলাম ওল্ড রেডক্রস ক্লিনিকের মোড় পর্যন্ত, আর কমলা রংয়ের লোমওয়ালা কোট পরা কোনো মেয়ে চোখে পড়লেই মনে হল বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ড ধড়াস করে উঠছে, তবে যে মেয়েটাকে খুঁজছি সে যেন হাওয়ায় মিশে গেছে।

কয়েক ঘণ্টা পর ধারণা হল যে যুবতী মহিলাকে এমন বেকায়দায় ফেলেছিলাম যে হয়তো নিরাপদে এলিসেনবার্গভেইযেনের কোনো জানালায় বসে মজা করে উপভোগ করছে সেই মনোহর দৃশ্য যে এক মেডিকেল কলেজের যুবক ছাত্র বেচইন হয়ে রাস্তায় ছুটাছুটি করছে। ঠিক যেন কোনো অ্যাকশনধর্মী রূপকথার ফিল্মের নায়ক। যে রাজকন্যাকে এমন হয়রান হয়ে খুঁজছে তার দেখা মিলছে না। চেষ্টার কোনো ত্রুটি নেই, তবে তাকে খুঁজে পেতে ব্যর্থই রয়ে গেলাম।

এক সময় নজরে এল ময়লা ফেলার একটা ডিব্বায় তাজা কিছু কমলার স্তূপ। একটা কুড়িয়ে নিয়ে শুঁকে দেখলাম। ওরেঞ্জগার্লের সেই কমলাগুলোই।

সেই অপরাহ্নের অবশিষ্ট সময়টা কমলা রংয়ের লোমওয়ালা চামড়ার কোটপরা মেয়েটাকে ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারলাম না। আমি সারা জীবন অসলোতে বাস করেছি, তবে এর আগে কখনও তাকে দেখেছি বলে মনে পড়ে না, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। ব্যাপারটা আমাকে আরো কৃতসংকল্প করে তুললো আমার ক্ষমতার সবটুকু প্রয়োগ করেও অন্তত একবার তাকে খুঁজে বের করতে হবে। মনে হয় কোনো ঐন্দ্রজালিক এসে আসার আর পৃথিবীর মাঝখানে তাকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছে।

আমার শুধু বারবার সেই কমলাগুলোর কথাই মনে পড়ে। ওগুলো দিয়ে সে কী করতে চেয়েছিল? সে কি ওগুলো একটা একটা করে খোসা ছাড়িয়ে কোয়া খসে নিয়ে ব্রেকফাস্ট বা লাঞ্চ করতে চেয়েছিল? ভাবনাটা আমাকে উজ্জীবিত করল। হয়তো ওর কোনো অসুখ ছিল, বিশেষ পক্ষ হিসাবেই ওগুলো ওর দরকার ছিল। চিন্তাটা আমাকে বিমর্ষ করে তুলত।

তবে আরো অনেক সম্ভাবনাও ছিল। হয়তো দুই তিনশ লোকের একটা পার্টির আয়োজন করেছিল। যাতে কমলা দিয়ে বিশেষ ধরনের মোরব্বা তৈরি করার পরিকল্পনা ছিল? এই ধারণাটা আমাকে করল ঈর্ষাকাতর। আমিই বা কেন সেই পার্টিতে নিমন্ত্রিত হলাম না? এও ভাবলাম, হয়তো ঐ পার্টিতে মেয়ে

পুরুষের সংখ্যানুপাতটা হতে পারে অসম। হয়তো পুরুষের সংখ্যা নব্বুই ছাড়িয়ে গেছে আর মেয়ে মাত্র আঠার। ভাবলাম কারণটাও হয়তো আমার জানা। কমলার মোরব্বা পরিবেশিত হওয়ার কথা হয়তো বড়সড় ম্যানেজমেন্ট ক্লাশের সিমেস্টারের সমাপনী অধিবেশনে, আর বিষয় যেহেতু ম্যানেজমেন্ট, তাই মহিলাদের সংখ্যা কম হওয়াই স্বাভাবিক।

ভাবনাটাকে আমি মন থেকে নির্বাসন দেয়ার চেষ্টা করলাম। এটা ছিল অসহনীয়, কারণ মেয়েদের কোটা নির্ধারণ না করে কর্তৃপক্ষ নারী-পুরুষের সমান সুযোগ নীতির ন্যাক্কারজনক লঙ্ঘন। না, আমার এসব কল্পনা অবাস্তব। হয়তো মেয়েটা তার বাড়িতে গিয়ে জীর্ণ বিছানার পাশে বসে কমলাগুলো চিপে চিপে রস নিংড়ে বের করে ফ্রিজে সংরক্ষণ করে রাখবে, কারণ ক্যালিফর্নিয়ার জুস প্রস্তুতকারী সংস্থার প্রতি তার আস্থা নাই।

জুস বা মোরব্বা এর কোনোটাই শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হল না। এর চেয়েও প্রত্যয়ী ধারণা আমার ভাবনাকে অধিকার করে বসল। মেয়েটা যে কমলা রঙের লোমওয়ালা চামড়ার কোট ব্যবহার করেছিল, সে ছিল রোল্ড আমুন্ডসেন তার উত্তর মেরু অভিযানের সময় যেমন কোট পরেছিলেন, তেমনটা। আমি অবশ্য আগাগোড়াই নিশানা দেখে ভাব উদ্ধারে বেশ দড়– চিকিৎসা বিজ্ঞানে এটাকে বলে লক্ষণ দেখে রোগ নির্ণয়। সাধারণত বিশেষ কারণ ছাড়া কেউ চামড়ার কোট পরে ওসলোর রাস্তায় বেরোবে না, আর তার সাথে যদি ব্যাগভর্তি রসালো কমলা থাকে তাহলে তো কথাই নাই।

শেষ পর্যন্ত আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে মেয়েটা আসলে গ্রীনল্যান্ডে যাচ্ছিল স্কী করতে, গ্রীনল্যান্ডে না হলেও অন্ততপক্ষে হার্ড্যাংগারভিডা প্ল্যাটোতে। আর সেক্ষেত্রে শ্লেজে আটদশ কিলো কমলা থাকাটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার, তা না হলে হয়তো ওকে জনমানবহীন বরফের রাজ্যে স্কার্ভিতেই মরতে হতে পারত।

আচ্ছা এর চেয়ে ভালো কোনো ধারণা কি ভেবে দেখা যায় না? 'এ্যানোরাক (লোমওয়ালা চামড়ার কোট) শব্দটা তো এস্কিমোদের ভাষার। তা হলে অবশ্যই সে গ্রীনল্যান্ডে যাচ্ছিল। কিন্তু এই মওশুমে ওর গ্রীনল্যান্ড অভিযান কতটা সফল হত? আচ্ছা, রহস্যময় মেয়েটার কি আর এক ব্যাগ কমলা কেনার মতো যথেষ্ট অর্থ আছে? কমলা বোঝাই ব্যাগটা বরবাদ হওয়ার কালে ওর চোখে আমি জল দেখেছি। সে থেকে সহজেই অনুমান করা যায়, মেয়েটা বেশ গরীব।

তবে আরো অনেক বিকল্প ভাবনা আছে। আমাকে গভীরভাবে ভেবে সিদ্ধান্তে আসতে হবে। হয়তো কমলা সুন্দরী কোনো এক বৃহৎ পরিবারের সদস্য। ভালো কথা, হবেই না বা কেন? এমনটা ধারণা করা উচিত হবে না সে রেডক্রস ক্লিনিকের বিপরীতে ছোট এক ঘরের নিঃসঙ্গ এক নার্সের সহযোগী।

হয়তো সে কমলা প্রেমিক এক বিশাল যৌথ পরিবারের সদস্য। গিয়র্গ, এমনি এক পরিবারের বাড়িতে যাওয়ার সৌভাগ্য যদি হত আমার? আমি মানসচক্ষে দেখতে পাচ্ছি ফ্রোনার জেলার উঁচু ছাদ আর অলংকৃত প্লাস্টার করা দেয়াল ঘেরা বিশাল হলঘরে ডাইনিং টেবিল ঘিরে পরিবারের সবাই খেতে বসেছে। মা-বাবা ছাড়াও রয়েছে সাত সন্তান, চার বোন দুই ভাই আর তার সাথে রয়েছে কমলা সুন্দরী নিজে। সন্তানদের মধ্যে সে-ই বড়, আদরের বড় বোন। স্কুলে যাওয়ার সময় ছোট বোনদের হাতে একটা কমলা তুলে দেয়ার জন্য ওকে অনেক গুণ অর্জন করতে হয়েছে।

হয়তো বা চিন্তাটা মাথায় আসতেই আমার শিরদাঁড়া বেয়ে একটা হিমশীতল অনুভূতি নেমে গেল– সে হয়তো নিজেই ছোট্ট এক পরিবারের মাতা, সেই পরিবারে রয়েছে সে নিজে, তার গোবেচারা স্বামী, যে সবে স্কুল অব ম্যানেজমেন্ট থেকে স্নাতক করেছে, আর তাদের চার পাঁচ মাস বয়সী কন্যা, যার নাম কল্পনা করা যাক র‍্যানভিগ।

আরো একটা সম্ভাবনার কথা আমাকে খতিয়ে দেখতে হবে। ফ্রোনার ফিস মার্কেটের সামনে দিয়ে ঠেলা গাড়িতে করে যে মা তার বাচ্চাকে নিয়ে যাচ্ছিল সেই মা-ই ওই মেয়েটি এমন সম্ভাবনা নাই বললেই চলে। হয়তো সে কমলা সুন্দরীর আয়া। এই ধারণাটা বেদনাদায়ক, যদিও কয়েকটা কমলা হয়তো প্যারামবুলেটরের কাপড়চোপড়ের মধ্যে রয়ে গেছে। হঠাৎ পৃথিবীটা যেন ছোট হয়ে যায়, আর সব তুচ্ছ ঘটনা তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠে।

দুই আর দুয়ে এক করার ব্যাপারে চিরকালই আমি পোক্ত। আর অসুস্থ হলে নিজের রোগ নিজেই নির্ণয় করতাম। এটা নিয়ে আমি গর্ব বোধ করতাম, আমি শুধু আমার এক সহকর্মীর কাছে গিয়ে বলতাম আমার সমস্যা কী, সে বিষয়টা গুরুত্বের সাথে নিত, আর তারপর...

ভালো কথা, গিয়র্গ, এখানে আমার লেখার একটু বিরতি দিতে হবে।

হয়তো তোমার অবাক লাগছে এত বছর আগে সেই বিশেষ বিকেলে যে ঘটনাটা ঘটেছিল, এতদিন পরে কেমন হালকা রসিকতায় তার বর্ণনা দিতে পারছি। তবে আমার মনে আছে গল্পটা সত্যিই মজাদার, প্রায় একটা অবাক ফিল্মের মতো, আর যে ভাবেই আমি এটাকে বিবেচনা করতে চাই। এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে ব্যাপারটাকে আমি হালকাভাবে নিচ্ছি। সত্যি কথা হল আমি ছিলাম অসহায়, আমার কোনো সান্ত্বনা ছিল না। ব্যাপারটা আমি গোপন করতে চাই না, তবে এতে তোমার উৎকণ্ঠিত হওয়ার কিছু নেই। তুমি কখনও আমার চোখে জল দেখতে পাবে না, এ ব্যাপারে আমি কৃতসংকল্প, আমি নিজেকে সামলে নিতে পারি।

মা এতক্ষণে অফিস থেকে বেরিয়ে বাড়ির পথে। এখন বাড়িতে কেবল আমরা দুজন। তুমি মেঝেতে বসে বসে রঙিন পেন্সিল দিয়ে আঁকিবুকি করছ, এতেও আমার মনের ক্ষত প্রশমিত করতে পারছে না। হয়তো একমাত্র তুমিই পারবে। বহুবছর পরে যখন তুমি সেই বিশেষ লোকটির লেখা চিঠি পড়বে যে ছিল তোমার বাবা। তখন হয়তো তার আত্মার দিকে তোমার সান্ত্বনার চিন্তা পাঠিয়ে দিতে পারবে। সেই চিন্তাটাই আমার অন্তরে উষ্ণতা ছড়াচ্ছে।

সময়, গিয়র্গ, সময় আসলে কী?

আমি সুপারনোভা ১৯৮৭ এর একটা ছবির দিকে চোখ তুলে তাকালাম। বাবা যে সময়টাতে বুঝতে পারছিল সে অসুস্থ, ঠিক সেই সময়টাতেই হাব্‌ল স্পেস টেলিস্কোপ ছবিটা তুলেছিল।

অবশ্য ওর জন্য আমার দুঃখ হয়। তবে ঠিক নিশ্চিত হতে পারছিলাম না, সব দুঃখগুলো আমার ওপর চাপিয়ে দেয়া তার ঠিক হচ্ছে কিনা। বাবার জন্য আমি কিছুই করতে পারিনি। সে এখনকার থেকে অন্য একটা সময়ে বাস করেছে, আর আমার জীবন আমাকে যাপন করতে হবে। যদি প্রত্যেককেই তার বাবা আর দাদুর চিঠিতে নিমজ্জিত হতে হয়, তাহলে তার নিজের জীবনযাপন করা হয়ে উঠবে না।

আমি অনুভব করলাম আমার দু'চোখের পাতা ভিজে উঠেছে, এই অশ্রুবিন্দুগুলো মধুর নয়। অবশ্য মধুময় অশ্রু বলে যদি কিছু থেকে থাকে, এগুলো কঠিন প্রতিকূল অশ্রু যা চোখের কোণে জ্বালাময় বোধ সৃষ্টি করে।

আমি স্মরণ করার চেষ্টা করলাম কতদিন মা আর আমি বাবার সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করে গিয়েছি। সর্বশেষ অনুচ্ছেদটা পাঠ করার পর স্থির করলাম আমাকে আর একবার তার কবর জিয়ারত করতে হবে। তবে আমি কোনোক্রমেই কবরে মালা রাখব না, কখ্‌খনো না।

পিতৃহীন হয়ে বেঁচে থাকাটা অনিবার্যরূপে কষ্টকর, তা নয়। তবে কারো মৃত পিতা যদি কবর থেকে কথা বলতে শুরু করে, তাহলে তা অবশ্যই ভীতিকর ব্যাপার। হয়তো এটাই সর্বোত্তম হত যদি সে তার সন্তানকে শান্তিতে বাস করতে দিত। এমনকি সে ভূত হয়ে ফিরে আসারও ইঙ্গিত দিয়েছে।

আমার হাতের তালু ঘর্মাক্ত। অবশ্য বাবার চিঠির অবশিষ্ট অংশটা আমাকে পড়তেই হবে। হয়তো ভবিষ্যতের জন্য চিঠি লিখে ভালোই করেছে, অথবা হয়তো করে নাই। এখনই এ ব্যাপারে মতামত দেয়ার সময় আসে নাই।

কি অদ্ভুতুরে লোকই না ছিল, সত্তরের দশকের শেষভাগে, যখন সে উনিশ বছর বয়সী ছিল, তখন ফ্রোনারগামী ট্রামে ব্যাগভর্তি কমলা নিয়ে ট্রামযাত্রী এক যুবতী মহিলাকে নিয়ে কী হুলুস্থুল কাণ্ডটাই না ঘটিয়েছিল। উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েরা

পরস্পরের প্রতি তীর্যক দৃষ্টি বিনিময় করবে এটাই তো স্বাভাবিক। বেশ কল্পনা করতে পারি এই ব্যাপারটা ঘটে আসছে আদম হাওয়ার সময় থেকেই।

সোজাসাপ্টা কেন বলতে পারে না সে মেয়েটার প্রেমে পড়ে গিয়েছিল? মেয়েটাও নিশ্চয়ই তার কমলা আক্রান্ত হওয়ার অনেক আগেই সেটা বুঝতে পেরেছিল। সে নিজেও স্পষ্ট করে বলেছে একটা হাত মেয়েটার কোমর জড়িয়েছিল। হয়তো মেয়েটার সাথে ট্যাঙ্গো নাচের বাসনা জেগেছিল। বাচ্চারা যখন প্রেমে পড়ে তখন তারা মারামারি বা চুল টানাটানি করে। অনেকে পরস্পরের দিকে বরফের দলা ছুঁড়ে মারে। আমি ভেবেছিলাম উনিশ বছরের যুবক আর একটু ভেবেচিন্তে কাজ করবে।

তবে আমি গল্পটার শুরুটা মাত্র পড়েছি। হয়তো এই কমলা সুন্দরীর ব্যাপারে রহস্যজনক কিছু আছে। তা না হলে বাবা নিশ্চয়ই মেয়েটাকে নিয়ে গল্প ফেঁদে বসত না। সে ছিল অসুস্থ, আর এও জানত সে মরতে চলেছে। এ অবস্থায় সে যা লিখবে তা অবশ্যই গুরুত্ববহ হবে তার নিজের জন্যও বটে, আমার জন্যও বটে।

অবশিষ্ট কোকটুকু পান করে আমি আবারো পড়তে শুরু করলাম।

আমি কি আবারো কখনও কমলা সুন্দরীর দেখা পাব? হয়তো না, হয়তো সে দেশের অন্যকোনো প্রান্তে বাস করে। হয়তো সে স্বল্প সময়ের জন্য অসলোতে বেড়াতে এসেছিল।

যখনই শহরে যেতাম, আর ফ্রোনারের কোনো ট্রাম দেখতে পেতাম, তখনই সবগুলো জানালায় তাকিয়ে দেখতাম যাত্রীদের মধ্যে কমলা সুন্দরী আছে কিনা। এটা আমার অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। বহুবার আমি এ কাজটা করেছি, কিন্তু কখনই তার দেখা মেলেনি। ফ্রোনার এলাকায় সান্ধ্য ভ্রমণে বের হওয়া আমার অভ্যাসে পরিণত হয়। যখনি হলুদ বা কমলা রঙের পোশাকে কোনো মহিলা আমার নজরে পড়ত, তখনি মনে হত এই তো, এই তো, এখনি তার দেখা পাব। যদিও আমার প্রত্যাশা ছিল তুঙ্গে, আমার হতাশাও ছিল গভীর।

দিনের পর দিন, সপ্তার পর সপ্তা কেটে যেতে থাকে। এক সোমবার সকালে আমি ওসলোর প্রধান রাস্তায় এক কাফে কলি যোহানে ঢুকে পড়লাম– এটা সাধারণত ছাত্রদের মিলনস্থল। যেমনি দরজা ঠেলে ভেতরে পা রাখতে যাব, আমার পা হঠাৎ আটকে গেল, আমি দুপা পিছিয়ে গেলাম। ঐ তো কমলা সুন্দরী! আগে সে কখনও এখানে আসেনি, অন্তত আমার সমসময়ে, কিন্তু এখন সে চায়ের কাপ সামনে রেখে একটা সচিত্র ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছে। মনে হয় যেন অদৃশ্য হাতের ইশারায় তাকে ওখানে বসিয়ে রেখেছে যাতে আমার সাথে ওর দেখা হয়। ওর গায়ে সেই পুরনো লোমওয়ালা চামড়ার কোট, আর শোন গিয়র্গ, তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে না– ওর দুপায়ের ফাঁকে কাফের ছোট টেবিলের সাথে ঠেস দিয়ে সেই বিশাল কাগজের ব্যাগ ভর্তি রসালো কমলা।

আমি চমকে উঠলাম। সেই কমলা রংয়ের চামড়ার লোমওয়ালা কোট পরা কোলের ওপর একই রকম ব্যাগে কমলা বোঝাই, মনে হল অবাস্তব মরীচিকা। যতক্ষণ কমলাগুলোর শাস বাস্তব রূপ না নেয়, আমাকে দেখতে হবে কী ধরনের কমলা এগুলো। ওগুলোর সোনালী খোসা এমন জ্বলজ্বল করছিল যেন ওদের দিকে তাকাতে হলে চোখ রগড়াতে হবে। আগে যে কমলাগুলো দেখেছিলাম, এগুলোর রঙ তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। মনে হল খোসা না ছাড়ানো অবস্থাতেই ওগুলোর সুবাস আমার নাসারন্ধ্রে অনুপ্রবেশ করছে। নিশ্চয়ই ওগুলো সাধারণ কমলা নয়!

আমি পা টিপে টিপে এগিয়ে টেবিলে গিয়ে বসলাম। আমার পরবর্তী কর্তব্য নির্ধারণ করার পূর্বে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম নীরবে বসে এই অব্যাখ্যেয় দৃশ্য উপভাগ করব।

আমি ভাবিনি সে আমাকে লক্ষ্য করেছে, তবে সহসাই সে ম্যাগাজিন থেকে মুখ তুলে সরাসরি আমার চোখের দিকে তাকায়। ও আমাকে হাতেনাতে ধরে ফেলেছে, ও বুঝতে পেরেছে সারাক্ষণ বসে বসে আমি ওকে লক্ষ্য করছিলাম। একটা প্রসন্ন হাসি উপহার দেয়, কী অমায়িক হাসি, গিয়র্গ, এমন একটা হাসি যা গোটা জগৎটাকে গলিয়ে দিতে পারে, গোটা পৃথিবী যদি সেই হাসি অবলোকন করত তাহলে, ঘৃণা বিদ্বেষ, যুদ্ধ বিগ্রহ এই গ্রহের বুক থেকে নির্বাসিত হত, অন্ততপক্ষে দীর্ঘদিনের জন্য যুদ্ধ বিরতি হতই।

ওর কাছে উঠে যাওয়া ছাড়া আমার কোনো বিকল্প ছিল না। আমি ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে ওর পাশের একটা চেয়ারে বসে পড়লাম। সে এটাকে অস্বাভাবিক মনে করে নাই, তবে তার আচরণ থেকে এটা বোঝা কষ্টকর ট্রামের ঘটনার সাথে আমার সংশ্লিষ্টতা ওর গোচরীভূত কিনা।

বেশ কয়েক সেকেন্ড কোনো কথা না বলে শুধু পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলাম। মনে হল এই মুহূর্তে যেন ওর কথা বলার কোনো ইচ্ছা নাই। সে দীর্ঘক্ষণ আমার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল, পুরো এক মিনিট তো বটেই, এসময় আমিও দৃষ্টি সরিয়ে নিলাম না। লক্ষ্য করলাম ওর চোখের তারা কাঁপছে। যেন ওর চোখ জিজ্ঞেস করতে চায়, তুমি কি আমাকে মনে করতে পারছ না?

শীঘ্রই আমাদের যে কোনো একজনকে কথা বলতে হবে, তবে আমি এতই হতবিহ্বল হয়ে পড়েছি যেন সেই কোনো এক কালের কথা ভাবছি যখন আমরা নিজেদের ছোট্ট এক ঝোপের মধ্যে দুটি কাঠবিড়ালী ক্রীড়ারত ছিলাম। মজা করার জন্য সে আমার কাছ থেকে লুকিয়ে পড়ত, আর আমি গাছে গাছে লাফালাফি করে ওকে খুঁজে ফিরতাম, আর কখনো দেখা পেলে সে একডাল থেকে লাফিয়ে অন্য ডালে চলে যেত, আর এমনি যুগ যুগ ধরে চলত আমাদের

চপল লুকোচুরি খেলা বৃক্ষশাখার আড়ালে-আবডালে। তারপর একদিন খেয়াল চাপল আমিই লুকিয়ে যাই। এখন সে-ই খোঁজাখুঁজি শুরু করে। হয়তো আমি গাছের মগডালে ঘাপটি মেরে আছি, অথবা পুরনো কোনো গাছের গুড়ির পাশে ঘাসের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছি, তার অসহায় অধৈর্য অনুসন্ধান উপভোগ করছি, হয়তো তার সন্ধান ছিল ভীতির রঙে রঞ্জিত, পাছে আমাকে হারিয়ে ফেলেছ, আর কখনই খুঁজে পাবে না...

হঠাৎ বিস্ময়কর কিছু একটা ঘটে গেল, কাঠবিড়ালীর সময়ের উষালগ্নে নয়, বরং এই মুহূর্তে কার্ল যোহান কাফেতে।

টেবিলের ওপর বাহু ঠেস দিয়ে বসেছিলাম, হঠাৎ ওর ডান হাত আমার বাহুতে রাখল। হাতে ধরা বইটা রেখে দিয়েছে কমলার ব্যাগের ওপর, আর অন্য বাহু দিয়ে ব্যাগটা জড়িয়ে রেখেছে, যেন তার ভয় পাছে আমি ওটা ছিনিয়ে নিতে অথবা ধাক্কা দিয়ে মেঝের ওপর ফেলে দিতে পারি।

তেমন সঙ্কোচ বোধ করছিলাম না আমি। শুধু অনুভব করছিলাম একটা শীতল অনুভূতি ওর আঙুলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আমার মধ্যে সঞ্চারিত হচ্ছে। আমার ধারণা ওর মধ্যে এক অপার্থিব শক্তি রয়েছে, আর আমার সন্দেহ এই শক্তিটা কোনো না কোনো ভাবে কমলার সাথে জড়িত।

একটা ধাঁধা, বিস্ময়কর এক ধাঁধা! আমি আর নীরবতা সহ্য করতে পারছিলাম না, চাইছিলাম কেউ একজন নীরবতা ভঙ্গ করুক, হয়তো এটা এক স্খলন, হয়তো কমলা সুন্দরীর রীতির লংঘন। আমরা তখনও পরস্পরের চোখের দিকে চেয়ে আছি; তারপর আমি হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম: 'তুমি একটা কাঠ বিড়ালী।'

'আমার কথা শুনে ওর মুখে অনির্বচনীয় এক টুকরা হাসি। হাতে মৃদু চাপ অনুভব করলাম। তারপর হাত ছেড়ে দিয়ে গুরুগম্ভীর মুখে উঠে দাঁড়িয়ে কমলার ব্যাগ হাতে নিয়ে মহিমান্বিত গতিচ্ছন্দে সোজা রাস্তায় গিয়ে পড়ে। বেরিয়ে যাওয়ার সময় দেখলাম ওর চোখে অশ্রুবিন্দু।

পক্ষাঘাতগ্রস্তের মতো বসে রইলাম। মুখে কোনো কথা নাই। হাতে হাত রেখে যখন টেবিলে মুখোমুখি বসেছিলাম, তখন ঘরে কমলার গন্ধ ছড়িয়ে ছিল। এখন সে চলে গেছে কমলার গন্ধ সঙ্গে করে নিয়ে গেছে। বিশাল কমলার ব্যাগটা ওকে দু'হাতে দেহের সাথে জড়িয়ে ধরতে হয়েছিল, তবে ওর চোখের জল স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি।

আর গিয়র্গ, আমি ওকে অনুসরণ করিনি। সেটাও হয়তো নিয়মভঙ্গ হতে পারে। আমি ছিলাম হতবিহ্বল, নিঃশেষিত, পরিপূর্ণ। এমন এক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হলাম যা ছিল উল্লসিত রহস্যময়তা, যার ঘোর কাটতে

কয়েক মাস লেগে যাওয়ার কথা। ভাবলাম ওর সাথে নিশ্চয়ই আবার দেখা হবে, কোনো এক দুর্জ্ঞেয় ক্ষমতাধর শক্তি এর মাঝে ক্রিয়াশীল।

সে ছিল অজ্ঞাতকুলশীল। কোনো এক মনোহর রূপকথার রাজ্য থেকে ওর আগমন। তবে সে আমাদের বাস্তবতার মধ্যে পথ করে নিয়েছে, হয়তো এখানে তার কোনো মহান উদ্দেশ্য রয়েছে হয়তো তার আবির্ভাব লোকে যাকে বলে জীবনের দৈনন্দিনতা, তার থেকে মুক্তি দেয়ার জন্যে। তখন পর্যন্ত আমি তার সেই মহান উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অজ্ঞই ছিলাম। আমি ভাবতাম উদ্দেশ্য একটাই, বাস্ত বতাও একটাই। তবে অন্ততপক্ষে দুধরনের মানুষ আছে। একদিকে কমলা সুন্দরী আর অন্যদিকে আমরা সবাই।

কিন্তু তার চোখে জল কেন? কান্না কিসের জন্য ওর?

মনে পড়ে আমি ভেবেছিলাম সে ভবিষ্যৎদ্রষ্টা, তা না হলে একজন অচেনা লোককে দেখে কেন ওর চোখ অশ্রুসিক্ত হবে? হয়তো সে জানতে পেরেছিল একদিন আমি নির্দয় নিয়তির দ্বারা পর্যুদস্ত হব।

তখন আমার মনে এমন ভাবনার উদয় হবে এটাও অস্বাভাবিক, যদিও আমি চিরকালই কল্পনার দ্বারা তাড়িত হতাম, আমি ছিলাম এবং আছি পুরোপুরি একজন যৌক্তিক মানুষ।

গল্পের এই পর্যায়ে আমাকে একটু পেছন ফিরতে হবে। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি এমনটা বারবার ঘটবে না।

একজন যুবাপুরুষ এবং এক নিষ্পাপ যুবতীর ফ্রোনারগামী ট্রামের মধ্যে মুহূর্তের দৃষ্টি বিনিময় হতেই পারে। তারা কচি শিশুও নয়, আবার পূর্ণ যুবকযুবতীও নয়। আর তাদের ইতিপূর্বে কখনও দেখাও হয়নি। কয়েক মিনিট পরে যুবক ভাবল যুবতীটি বিশাল এক কমলা বোঝাই ব্যাগের ভার সামাল দিতে পারছে না। যুবক হঠাৎ করিৎকর্মা হতে গিয়ে বিদঘুটে এক কাণ্ড ঘটিয়ে বসল, ট্রামময় কমলাগুলো ছড়িয়ে দিল। যুবতী যুবককে 'হাবা' আখ্যা দিয়ে পরের স্টপেজে নেমে যায়। যাবার আগে অসহায় যুবকের বাহুবন্ধনীতে কুড়িয়ে রাখা কমলাগুলোর মধ্যে একটা নিয়ে নেয়ার অনুমতি চাইলে যুবকও সম্মতিসূচক মাথা দোলায়। কয়েক সপ্তাহ পরে তারা আবার এক কাফেতে মিলিত হয়। আবারো যুবতীর কোলের ওপর ব্যাগভর্তি রসালো কমলা। যুবক তার টেবিলের দিকে এগিয়ে যায়। তারা পুরো এক মিনিট পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে। এটাকে একটা মামুলী ব্যাপার মনে হতে পারে, তবে সেই ষাট সেকেন্ড ধরে তারা পরস্পরের চোখের গভীরে দৃষ্টি দিয়ে আত্মার অতলান্ত স্পর্শ করতে চেয়েছিল। যুবতী হাত রেখেছিল যুবকের হাতে, আর যুবক তাকে কাঠবিড়ালী অ্যাখ্যা দিয়েছিল। তার সে লীলায়িত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে হাতে ফলের

বোঝা নিয়ে যেন হাওয়ায় ভর করে কাফে থেকে বেরিয়ে যায়। যুবক তার চোখে জল দেখতে পায়। তাদের দুজনের মাঝে শুধু চারটি বাক্য বিনিময় হয়। ও বলে: *হাবা, আমি কি একটা কমলা নিয়ে যেতে পারি?* এ বলে: *দুঃখিত, দুঃখিত! তুমি একটা কাঠবিড়ালী।*

তুমি কি এর রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পার গিয়র্গ? আমি পারিনি, হয়তো এ কারণে যে আমিও এর খণ্ডাংশ।

এবার আমি গল্পটার মধ্যে ঢুকে পড়েছি। পরপর দুবার কমলা সুন্দরী বাবার কাছে আবির্ভূত হয়, দুবারই তার হাতে ছিল কমলা বোঝাই ব্যাগ। এটা অবশ্যই রহস্য ঘেরা। তারপর কোনো কথা না বলে হাতে হাত রেখে, চোখে চোখ রেখে নীরবে বসে রইল। তারপর হঠাৎ লাফিয়ে উঠে রাস্তায় নেমে গেল চোখে জল নিয়ে। আচম্বিত ব্যবহার, কদাচিৎ এমনটা ঘটে।

বাবার কি দৃষ্টি বিভ্রম ঘটেছিল, না অন্য কিছু?

লোকে যাকে বলে প্রেতাত্মা, হয়তো কমলা সুন্দরী তাই। অনেক লোকেই দাবী করে লকনেস বা সেলিওর্দস্‌ভানে হ্রদে তারা জলদানব দেখেছে। ওরা সবাই যে মিথ্যা বলে তাই-ই বা হলফ করে কে বলতে পারে? হয়তো তারাও কোনো প্রেতাত্মাই দেখে থাকবে। বাবা যদি হঠাৎ দাবী করতে শুরু করত যে সে অসলোর প্রধান শপিং সেন্টারে দেখেছে কমলা সুন্দরী বিশাল এক শ্লেজ গাড়ি টেনে নিয়ে চলেছে, তাহলে আমার সন্দেহ থাকত না যে ওর মাথার নাটবল্টু সাময়িকভাবে ঢিলা হয়ে পড়েছিল। আমাদের যে কারো এমনটা ঘটতে পারে, এটা বিশ্বাসযোগ্য।

কমলা সুন্দরী কল্পমূর্তিই হোক, বা রক্ত মাংসের জীবন্ত মানুষই হোক, বাবা সাংঘাতিকভাবে ওর সাথে চিপকে গিয়েছিল। কাজেই যখনই ওকে কিছু বলার সুযোগ এল তখনই বলেছিল 'সে একটা কাঠবিড়ালী,' এটা সত্যিই এক হাতাশাব্যঞ্জক উক্তি। সে এটা গোপন করার চেষ্টাও করেনি যে এমন একটা বিদঘুটে বক্তব্যে সে নিজেও অবাক হয়ে গিয়েছিল। কেনই বা এটা বলতে গেল সে? নাহ্ বাবা, এই ধাঁধার উত্তর আমারও জানা নাই।

আমি সবজান্তা হওয়ার চেষ্টা করব না। আমিই প্রথমে কবুল করব, প্রথম দর্শনে যদি কোনো মেয়েকে ভালো লেগে যায়, তাহলে তাকে কোনো কিছু বলাটা সত্যিই মুস্কিল।

আমি আগেই উল্লেখ করেছি আমি পিয়ানো বাজাই। আমি ঠিক একজন পাকা পিয়ানোবাদক নই, তবে বিটোফেনের *মুনলাইট সোনাটা* প্রায় নির্ভুলভাবেই বাজাতে পারি। *মুনলাইট সোনাটা* বাজাতে বাজাতে কখনও কখনও মনে হয় চাঁদের পৃষ্ঠে বসে বিশাল এক পিয়ানো বাজাতে বাজাতে চাঁদের সাথে সাথে আমিও পৃথিবী

পরিক্রমা করছি। কল্পনা করি আমি যে সুর বাজাচ্ছি তা সমগ্র সৌরমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ছে, প্লুটো পর্যন্ত না হলেও অন্তত শনি পর্যন্ত তো বটেই।

আমি সবেমাত্র *মুনলাইট সোনাটা*র দ্বিতীয় পর্যায় শুরু করেছি এবং তার সাথে *এ্যালেগ্রেটো*। এটা আয়ত্ত করা বেশ কষ্টসাধ্য, তবে আমার পিয়ানো শিক্ষক যখন এটা বাজিয়ে শোনায়, তখন হৃদয় শীতল হয়ে যায়। মনে হয় কয়টা যান্ত্রিক পুতুল কোনো শপিং সেন্টারের সিঁড়ি বেয়ে ওঠানামা করছে।

আমি স্থির করেছি সোনাটার তৃতীয় পর্যায় শিখব না। অবশ্য একারণে নয় যে এটা শেখা অনেক কঠিন, বরং এ কারণে যে এটা মনের মধ্যে এক আতঙ্ক জাগিয়ে তোলে। প্রথম পর্যায় (*আদাজিও সস্তেনুতো*) মনোমুগ্ধকর অতি মনোরম এবং একটু ভয় জাগানিয়া, তবে অন্তিম পর্যায় (*পেস্ত্রো আজিতাতো*) দারুণ ভীতি সঞ্চারী। আমি যদি কোনো মহাশূন্যযানে চেপে অজানা কোনো গ্রহে অবতরণ করতাম, সেখানে কোনো কদাকার গ্রহবাসীকে *মুনলাইট সোনাটা* বাজাতে শুনতাম, তাহলে আমি তড়িঘড়ি ওখান থেকে উড়াল দিতাম, তবে যদি সে প্রথম পর্যায় বাজাত, তাহলে হয়তো কয়েক দিন ওখানে থেকেই যেতাম, আর সেই প্রাণীটির কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করতাম এ সঙ্গীতময় গ্রহে পছন্দ করার মতো আর কী কী আছে।

আমি একবার আমার পিয়ানো শিক্ষককে বলেছিলাম, বিটোফেনের মধ্যে স্বর্গ আর নরকের অনেকটাই সন্নিবিষ্ট আছে। অনেকক্ষণ চিন্তা করে তিনি মন্তব্য করেছিলেন আমি সঠিক পথেই রয়েছি। তারপর তিনি আমাকে চমকপ্রদ একটা কথা বলেছিল। *মুনলাইট সোনাটা* নামটা বিটোফেনের নিজের দেয়া নয়। তিনি এর নাম দিয়েছিলেন *সোনাটা সি, ওপাস ২৭* এবং এর আখ্যা দিয়েছিলেন '*সোনাতা কোরাসী উনা ফানতাসিয়া*' অর্থাৎ ফ্যান্টাসী সোনাটা। আমার পিয়ানো শিক্ষকের মতে বিটোফেনের এই সঙ্গীতের মাঝে এমন এক বিষাদের ছায়া রয়েছে যে এর *মুনলাইট সোনাটা* নামটা অসঙ্গত। তিনি উল্লেখ করেছিলেন একজন হাঙ্গেরিয়ান সুরস্রষ্টা ফ্রান্জ্ লিৎসের মতে দ্বিতীয় পর্যায় হল দুটি উত্তুঙ্গ পর্বত শিখরের মাঝে একটি ফুল। আমার ব্যক্তিগত মতামত হল দুটি বিয়োগান্ত দৃশ্যের মাঝে এটা এক বালখিল্য পুতুল নাচ।'

তবে আমি বলছিলাম, প্রথম দৃষ্টিতে যে মেয়েটিকে ভালো লেগে যায়, তাকে কিছু বলা কেমন দুঃসাধ্য সেটি বোধ হয় তোমাকে সহজেই বোঝানো যাবে। আর এবার আমি সত্যি শপথ করে একটা স্বীকারোক্তি করতে চাই, কারণ এমন প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে আমার কঙ্কাল আমি কাবার্ডে রেখে এসেছি, অথবা আরো সঠিকভাবে বলতে গেলে গানের স্কুলে।

প্রতি সোমবার বিকাল ছটা থেকে সাতটার মধ্যে আমি পিয়ানো শেখার পাঠ নিতাম। ঠিক ঐ সময়ে একটা মেয়ে বেহালা বাজানো শিখত। সে আমার চাইতে দুএক বছরের ছোট হবে, আর সে ছিল এমন যাকে বলা যায় চোখের দৃষ্টি কমনীয়।

প্রায়শই আমরা পাঠ শুরুর আগে পাঁচ দশ মিনিট বসার ঘরে একসাথে অপেক্ষা করতাম। আমাদের মধ্যে কদাচিৎ বাক্য বিনিময় হত, তবে সপ্তাহদুয়েক আগে সে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল কটা বাজে, পরের সপ্তাহে ঠিক ঐ প্রশ্নটাই আবার করেছিল। কাজেই উত্তর দিয়েছিলাম, বাইরে প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে, আর তার বেহালার কেসটা ভিজে যেতে পারে। আমাকে কবুল করতে হচ্ছে আমাদের দৌড় ঐ পর্যন্তই। কারণ সত্যিকারের আলাপ বলতে যা বোঝায় সেটা কখনই আমাদের মধ্যে ঘটেনি, আমিও সাহস করে শুরু করতে পারি নাই। এমনও হতে পারে সে-ও আমাকে পছন্দ করত, কিন্তু আমারই মতো লাজুক ছিল সেও। সে কোথায় বাস করত তার কোনো ধারণা আমার ছিল না, তবে ওর নাম জানা ছিল ইসাবেল, কারণ বেহালার ছাত্রীদের নামের তালিকায় এটা দেখেছিলাম।

আমাদের সঙ্গীতের ক্লাশে আমরা আরো সকাল সকাল পৌঁছতে শুরু করলাম। গত সোমবার আমরা ক্লাশ শুরুর জন্য প্রায় পনের মিনিট অপেক্ষা করেছিলাম। তবে আমাদের একমাত্র করণীয় যা ছিল তা হল চুপচাপ বসে থাকা। কখনও কথা বলতাম না। তার পর নিজের নিজের ক্লাশে গিয়ে বাজনা শিখতাম, দুএকবার যেন কল্পনা করেছিলাম *মুনলাইট সোনাটা* বাজাবার সময় সে আমাদের দরজায় উঁকি দিয়েছিল, এতটাও কল্পনা বিলাস আমাকে পেয়ে বসেছিল যেন সে আমাকে সাথে করে ওর বেহালার ক্লাশে নিয়ে যাচ্ছে। তবে এমনটা কখনই ঘটেনি, এটা ছিল নেহাৎই কল্পনা বিলাস। এটা যে অপচ্ছবি ছিল তার বড় প্রমাণ আমি কখনও তার বেহালাও দেখিনি, আর বাজাতেও শুনিনি। হয়তো তার বেহালা কেসের মধ্যে কোনো বেহালা ছিলই না, আছে একটা রেকর্ডার, আর সেক্ষেত্রে তার নামও হয়তো ইসাবেল নয়, এ্যান।

আমি যে কথাটা বলার চেষ্টা করছি তা হল, হঠাৎ যদি সে আমার হাত ধরত আর আমার চোখে চোখ রাখত, তাহলে আমার কী প্রতিক্রিয়া হত সে সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণাই নাই। অথবা সে যদি হঠাৎ কান্না শুরু করত, আমি বুঝতে পারি কমলা সুন্দরীর সাথে বাবার যখন দেখা হয়, তখন তার বয়স যত ছিল, আমার বয়স তার চাইতে মাত্র ৪ বছর কম। আমি বুঝতে পারি সে কী কঠিন ধাক্কা খেয়েছিল যখন সে বলেছিল, "তুমি একটা কাঠবিড়ালী।"

আমার মনে হয় বাবা, আমি তোমাকে ঠিকমতোই বুঝতে পারছি। এখন তোমার গল্প চালিয়ে যাও।

কাফেতে সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকারের পর আমার কমলা সুন্দরী অনুসন্ধান পর্ব নিয়মতান্ত্রিক ও যৌক্তিক পর্যায়ে প্রবেশ করে, কারণ পুনরায় তার দর্শন লাভের জন্য আবার এক দীর্ঘ প্রতীক্ষার পালা।

অন্ধ গলিপথে আমার অনুসন্ধান কর্মের সবিস্তার বর্ণনা দিয়ে তোমার বিরক্তি উৎপন্ন করতে চাই না গিয়র্গ। এতে তোমার অনেক সময় নষ্ট হবে। আমি সাতপাঁচ নানান চিন্তাভাবনা করলাম যুক্তিজাল বিস্তার, তারপর একদিন এই সিদ্ধান্তে এসে পৌছলাম। যে দুদিন আমার সাথে কমলা সুন্দরীর দেখা হল দুদিনই ছিল সোমবার। একথা আমি আগে ভাবিনি কেন? তার সেই কমলা আসল সূত্র যা নিয়ে আমি এগিয়ে যেতে পারি। ওগুলো কোথাকার কমলা? অবশ্য ফ্রোনারের দোকান থেকেও কমলা কেনা যায়। অবশ্যই যায়, সুন্দর, রসালো আর হয়তো সস্তাও হতে পারে না কি? কমলার ব্যাপারে সে রুচিশীল, সে নিশ্চয়ই কোনো বড় মার্কেট থেকেই তা কিনবে, আমি ভাবলাম, যেমনটা ইয়ংস্টর্গেট, এই মুহূর্তে যেটা অসলোর সবচেয়ে বড় ফল ও সব্জি বাজার, অন্তত যারা প্রতিদিন বেশ কয়েক কিলো করে কিনতে চায়। সেখান থেকে কেনাকাটা সারার পর স্টর্গাটা থেকে ট্রাম ধরে ফ্রোনারের দিকে আসার কথা, যদি অবশ্য কারো ট্যাক্সি ভাড়ার পয়সা না থাকে। অবশ্য আরো একটা ক্লু আছে, বাদামী রংয়ের পেপার ব্যাগ। সাধারণ দোকানদার প্লাস্টিক ব্যাগ ধরিয়ে দেয়। তবে কমলা সুন্দরী যে ধরনের বাদামী পেপারব্যাগ বহন করছিল। ইযংস্টর্গেটের দোকানদার সে ধরনের ব্যাগ সরবরাহ করে না।

অনেক থিওরির মধ্যে এটা একটা, পরপর তিনদিন আমাকে দেখা গেল ইয্ংস্টর্গেট মার্কেটে ফল ও সব্জি কিনতে। ছাত্রদের ঝোঁক থাকে সাধারণত উন্নতমানের খাবারের দিকে, তবে সাম্প্রতিক কালে ফাস্টফুডের দিকেই আমার অভ্যাস গড়াতে শুরু করে।

আমার অবশ্য ইযংস্টর্গেট মার্কেটের গিজগিজ করা লোকের ভিড় সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলার নেই গিয়র্গ, তোমাকে যা করতে হবে তা হল শুধু দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে হবে। তোমাকে খুঁজতে হবে সেই লোমওয়ালা চামড়ার কোট পরিহিতা রহস্যময়ী নারীকে কোনো একটা স্টলে যেখানে সে দশ কিলো ওজনের কমলার ব্যাগ নিয়ে দরকষাকষি করছে, সেই নারী বিশাল ব্যাগটা দুহাতে আঁকড়ে ধরে দোকান থেকে বেরিয়ে আসছে। আর সব ভুলে যাও, সবাইকে ভুলে যাও।

কিন্তু তুমি কি তাকে খুঁজে পেলে, গিয়র্গ?

প্রথম দুদফা ব্যর্থ হলাম, তবে তৃতীয় সোমবারে মার্কেটের দূরপ্রান্তে এক কমলা রঙের মূর্তির ওপর আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হল, হ্যাঁ, আমি যা খুঁজছিলাম, এক উঠতি বয়সী মেয়ে লোমওয়ালা চামড়ার পুরনো কোট পরিহিতা, সেই কি একটা ফলের দোকানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিশাল এক কাগজের ব্যাগে কমলা ভরছেনা?

কমলা সুন্দরীর এখনও ব্যাগভরা শেষ হয়নি, কারণটা হল ওর কেনাকাটার পদ্ধতিটা অন্য খরিদ্দারের চাইতে কিছুটা ভিন্ন। আচ্ছা তাহলে শোন, আমি তার

পেছনে দাঁড়িয়ে গভীর মনোযোগ লক্ষ্য করছি, সে একটা একটা করে কমলা তুলে নিয়ে খুঁটে খুঁটে পরখ করে দেখছে, তার পর হয় সেটা ব্যাগে পুরছে আর না হয় দোকানদারের বিরাট ঝুড়িতে ফিরিয়ে রাখছে। আমি বুঝে গেলাম কেন সে ফ্রোনানের যে কোনো দোকান থেকে কমলা কেনে না। এই মেয়ের দরকার কমলার এক বিশাল স্তূপ যার মধ্য থেকে ও মনোমতো কমলা বাছাই করে নিতে পারে।

এর আগে আমি কখনও কমলা বাছাইয়ে এমন খুঁতখুঁতেপনা দেখিনি, হঠাৎ আমি নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম এই মেয়ে নিশ্চয়ই রস বানানোর জন্য কমলা কেনে না। তাহলে আসলে সে কি কাজে কমলা ব্যবহার করে, তুমি কি কোনো ধারণা করতে পার গিয়র্গ? তুমি কি এই রহস্যের সমাধান ভাবতে পার, কেন সে এক একটা কমলা বাছাই করতে আধা মিনিট সময় খরচা করছে?

আমার অনুমান একটাই। সে নিশ্চয়ই কোনো নার্সারী স্কুলের রান্নাঘরের দায়িত্বে আছে, যেখানে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে টিফিনের সাথে একটা করে কমলা দেয়া হয়। সবাই জানে যে ভালোমানের ব্যাপারে বাচ্চাদের জ্ঞান বড়ই টনটনে। কাজেই কমলা সুন্দরীকে কমলা কেনার বেলায় নিশ্চিত হতে হয় যাতে প্রতিটা কমলাই সমান এবং নিখুঁত হয়। প্রতিটার আকার, গোলত্ব, রঙের উজ্জ্বলতা অবিকল একরকম হয়। তাছাড়া কমলার সংখ্যার ব্যাপারেও নিশ্চিত হতে হয়।

আমি ভাবলাম এই ধারণাটাই সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য, এমনকি একটা যন্ত্রণার অনুভূতিও টের পেলাম এই ভেবে যে তার কিচেনে কিছু সুদর্শন করিৎকর্মা যুবকও কর্মরত আছে। তবে মাত্র গজদুয়েক দূরে দাঁড়িয়ে চটজলদি এটাও মাথায় আসতে অসুবিধা হল না যে প্রতিটা কমলা যেন একটা থেকে অন্যটা আকার আকৃতি ও রঙে ভিন্ন রকমের হয় সেটা নিশ্চিত করার ব্যাপারে কমলা সুন্দরী চেষ্টার কোনো ত্রুটি করছে না। এখানে আর একটা ছোট্ট বর্ণনা দেয়া প্রয়োজন আর তা হল কোনো কোনো কমলা বোঁটার সাথে পাতা লাগানো ছিল। ওর এসব খুঁটিনাটি কর্মতৎপরতা নজরদারী না করলেই ভালো হত। তবে ঐ পরিস্থিতিতে আমি এটা বেশ উপভোগ করছিলাম। সে ছিল যেমন ধাঁধা তেমন ধাঁধাই রয়ে গেল।

ব্যাগ ভরা হয়ে গেল, কমলা সুন্দরী দোকানীকে মূল্য পরিশোধ করে স্টর্গটার দিকে হাঁটা দিল। দূরত্ব বজায় রেখে ওকে অনুসরণ করে চললাম। কারণ আমি স্থির করেছিলাম ফ্রোনার ট্রামে ওঠার আগে নিজেকে প্রকাশ করব না। তবে দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হল এ বিষয়ে আমি ভুল অনুমান করেছিলাম। আজ বিকালে সে ট্রাম ধরার জন্য স্টর্গাটা পর্যন্ত পায়ে হেঁটে গেল না, ওখানে পৌঁছার আগেই সে একটা সাদা কারে উঠে পড়ল, গাড়িটা ছিল টয়োটা, আর সামনের সীটে বসে ছিল একজন লোক।

মনে হল না দৌড়ে গিয়ে গাড়িটার নাগাল ধরতে পারব। তাছাড়া লোকটার সাথে পরিচিত হওয়ার ইচ্ছে হল না। শিগগিরই গাড়িটা গতিশীল হয়ে সামনে মোড় ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তবে তোমাকে দেয়ার মতো একটা নতুন তথ্য আছে এই পর্যায়ে। বাহুবেষ্টনে কমলার ব্যাগ আঁকড়ে ধরে গাড়িতে ঢুকতে যাওয়ার আগে কমলা সুন্দরী চট করে পেছন ফিরে আমাকে দেখে নিল। তবে আমাকে ফ্রোনার ট্রাম বা কার্ল যোহান কাফের সেই লোকই বলে চিনতে পারল কিনা সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত হতে পারলাম না। শুধু এটুকু নিশ্চিত হলাম যে সে একটা লোকের সাথে সাদা টয়োটা গাড়িতে করে চলে যাওয়ার আগে আমার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়েছিল।

তবে কে সেই ভাগ্যবান পুরুষ? লোকটা কেমন বয়সের সেটাও ঠাওর করতে পারিনি, বলা যায় না লোকটা ওর বাবাও হতে পারে। তবে অন্য কিছুও... কিন্তু আমার পক্ষে সেটা বোঝার উপায় কি? সে কি তার কর্ম সহচর? সাদা টয়োটায় হতেই পারে না। অথবা নরওয়েজীয় রূপকথার চার বছর বয়সী কন্যার বাবা র‍্যানভিগ নামের সেই ক্লাউন? তেমনটা হওয়া আবশ্যিক নয়। কোনো কিছুই ওদিকে ইশারা করে না। এমনটা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি যে কমলা সুন্দরী হয়তো গ্রীনল্যান্ডে স্কী করতে যাচ্ছে, আর টয়োটার ভদ্রলোক ওর সফরসঙ্গী। তখন থেকেই আমি লোকটার একটা চিত্র আঁকার চেষ্টা করলাম। কল্পনার প্রান্তরেখায় দেখতে পেলাম কমলার বরাদ্দ, বরফকাটা কুঠার। প্রাথমিক চিকিৎসা উপকরণ, বাড়তি স্কী স্টিক, স্লিপিং ব্যাগ, প্রাইমাস স্টোভ, তারপর দেখলাম ঘুমোবার তাঁবু, অবশ্যই হলুদ রঙের, হিসাব করে দেখলাম দলের সাথে আছে আটটা কুকুর।

স্বাভাবিকভাবেই আমার মনের পটে ওদের চিত্র ভেসে উঠল। ভাবা উচিত নয় তারা আমার দৃষ্টি এড়িয়ে চলতে পারবে। মনে হয় আমার মাথার মধ্যে গোটা একটা সিনেমার রীল রয়েছে। মাইলের পর মাইল গ্রীনল্যান্ডের বরফাচ্ছাদিত বিরান ভূমির ওপর দিয়ে ধীরগতিতে স্কী করে চলেছে। মেয়েটি: বরফের মতোই স্ফটিকস্বচ্ছ, কিন্তু লোকটা মোটেই তা নয়, ওর বাঁকা নাক, বাঁকা ঠোঁটে তীর্যক হাসি, চোখে নোংরা অতল দৃষ্টি যার মধ্যে যেকোন সময়ে মেয়েটি আছড়ে পড়ে হারিয়ে যাবে, সেই অতল ফাটল থেকে লোকটা কি তাকে টেনে তুলবে? নাকি লাফিয়ে ফাটলটা পার হয়ে গিয়ে নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে নিয়ে গিয়ে নিজের শরীরে সতেজতা নিয়ে আসবে এই ভেবে যে কোনোদিনই আর আপদটা ফিরে আসবে না?) তার মধ্যে রয়েছে এক পেশল পৌরুষদীপ্ত নিষ্ঠুর শক্তিমত্তা। সে নিরুদ্বিগ্ন চিত্তের মেরুভল্লুক গুলি করে মারে, যেমন করে লোকে থাবড়া দিয়ে মশা মারে, আর বিষয়টা নিয়ে আমরা যখন চিন্তাভাবনা

করছি, তখন এটাও অনুমান করা যায়, সামাজিক ন্যায়বিচার বলতে আমরা যা বুঝি তার থেকে অনেক দূরে বরফের চাঙ্গারীর আড়ালে সে মেয়েটাকে অনায়াসে ধর্ষণ করতে পারে, কারণ সে ক্ষেত্রে তাদের কে দেখছে? ওখানে কে তাদের ওপর নজর রাখছে? আমি তোমাকে বলতে পারি গিয়র্গ, শুধু আমিই থাকব। এই অতিমাত্রটা ধীরে ধীরে আমার কাছে স্পষ্টতর হয়ে আসছিল। তাদের যেসব উপকরণ থাকার কথা সে বিষয়ে আমি পুরোপুরি ওয়াকিব ছিলাম। দিন শুরু হবার আগেই আমি আটটা কুকুরের নাম দিয়ে ফেললাম। আর বিকাল নাগাদ তারা যেসব সামান সঙ্গে নিয়ে যাবে তার একটা তালিকা বানিয়ে ফেললাম, সব মিলিয়ে এর ডজন হবে দু'শ চল্লিশ কিলো, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে ছোট এক বোতল শ্যাম্পু, সে কি বোতল স্পিরিট যা সিয়ারাপোলক অথবা কোয়ানাগে পৌছার পূর্বেই ওদের পান করতে হবে...

পরদিন সকাল নাগাদ আমার স্নায়ু কিছুটা সুস্থির হয়ে এল। ডিসেম্বরে কেউ গ্রীনল্যান্ডে পাড়ি জমাতে চাইবে না। ডিসেম্বরে এসব অভিযাত্রীরা বরং কুমেরুর দিকে রওনা দেবে, আর সেক্ষেত্রে কেউ অসলো থেকে নয় বরং চিলি অথবা সাউথ আফ্রিকা থেকেই প্রয়োজনীয় কেনাকাটা সারবে। আর শপিং লিস্টে কমলা থাকবেই এমন কথা নয়। আর সাউথপোলে স্কী করতে হলে এত বেশি ক্যালরীর দরকার যে অতিরিক্ত ভিটামিন সাপ্লিমেন্টের জায়গাই থাকবে না। সেক্ষেত্রে কমলা অত্যন্ত ভারী খাবার। আর ভারী আঙ্গুলবিহীন দস্তানা হাতে জমাট বাঁধা কমলাই বা কিভাবে খাওয়া সম্ভব? মেরু অভিযানে শরীরের তরলের মাত্রা সঠিক পর্যায়ে রাখার ক্ষেত্রে কমলা ক্যাপ্টেন স্কটের ঘোড়ার মতই অকেজো। দরকার যেটা বেশী তা হল কয়েক ফোঁটা পেট্রল আর একটা প্রাইমাস স্টোভ। বরফ আর তুষার অর্থাৎ যে কোনো রূপে পানি মেরু প্রদেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে সহজলভ্য। আর কমলার শতকরা আশি ভাগই পানি।

আমার ভাবনা, কে তুমি ছোট্ট মিষ্টি কমলা সুন্দরী? কোথা থেকে এলে তুমি? এখন তুমি কোথায়?

মা এসে দরজায় হাজির। 'কেমন চলছে গিয়র্গ?' সে জিজ্ঞেস করে।

'চমৎকার,' জবাব দিলাম। এবার তোমার তিরিক্ষি মেজাজটা একটু ঠাণ্ডা করতে পার।

দুএক সেকেন্ড নীরবতার পর বলল, 'তোমার ঘরের দরজায় তালা লাগিয়ে থাকাটা আমার পছন্দ নয়।'

'মাঝে মাঝে ব্যবহার করা না হলে দরজার তালা চাবি থাকার প্রয়োজনটা কী?' আমি জবাব দিলাম, 'তুমি তো জান ব্যক্তিগত কিছু ব্যাপারস্যাপার থাকে।'

এতে সে কিছুটা বিরক্ত হল। অথবা আরো সঠিকভাবে বললে, মনক্ষুণ্ন হল। 'এবার তুমি ছ্যাবলামো শুরু করলে, জর্জ গিয়র্গ, তুমি নিজেকে আমাদের থেকে আলাদা করে রাখতে পার না।'

'হ্যাঁ, ঠিক, মা আমার বয়স এখন পনের, কাজেই ছ্যাবলামো কথাটা আমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

এক ক্ষ্যাপাটে ধরনের দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে সে । তারপর সব শান্ত।

স্বাভাবিকভাবেই কমলা সুন্দরীর কোনো প্রসঙ্গ তুললাম না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস বাবার যেসব কথা এখন শুনছি তা নিশ্চয়ই মাকে বলে যায়নি।

তা না হলে সে এ বিষয়ে অবশ্যই আমাকে কিছু বলত, আর বাবাকেও তার শেষ দিনগুলোতে দীর্ঘ এক পত্র লিখার কষ্ট করতে হত না, হয়তো যুবা বয়সে এমন এক অভিজ্ঞতা হয়েছে যা তার যুবা পুত্রের জীবনের পথকে আলোকিত করতে পারে। এ যেন এক সমকক্ষের সাথে ভাব বিনিময়। হয়তো বিশেষ কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আছে যা আমার সাথে আলোচনা করার প্রয়োজন ছিল।

এ পর্যন্ত যে মোদ্দা কথাটা জানতে চেয়েছে, তা হল হাব্‌ল স্পেস টেলিস্কোপ কেমন কাজ করছে। যদি সে জেনে যেতে পারত আমি তাকে কতটা তথ্য দিতে পারতাম।

আমার সন্দর্ভ সম্বন্ধে এ পর্যন্ত সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যা ঘটেছে তা হল, আমার শিক্ষক সেটা ক্লাসে পাঠ করে শোনাতে বলেছে। ছবিগুলোও প্রদর্শন করতে বলেছে। উনি ভালো কথাই বলেছিলেন, কারণ ক্লাশের শেষে বেশ কিছু মেয়ে আমাকে ক্ষুদে আইনস্টাইন বলে মন্তব্য করেছে। অবশ্য মন্তব্যটা এসেছে তাদের দিক থেকে যারা লিপস্টিক আর চোখের মেক-আপ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষাতেই বিশেষ তৎপর। আমার ধারণা ওরা আরো অনেক কিছু নিয়েই পরীক্ষা নিরীক্ষা করে থাকে।

চোখের মেকআপ অথবা লিপস্টিকের বিরুদ্ধে আমার কোনো বক্তব্য নেই। তবে আসল কথা আমার কাছে এটা এক অসাধারণ ভাবনা। মহাশূন্যে আমাদের অবস্থানের বিষয়ে ভাবনাটাই আমাদের মস্তিষ্ক ঘোলাটে করার জন্য যথেষ্ট। তবে অনেক মেয়ে আছে যারা চোখের মেক-আপ করার কারণে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেখতে পায় না। মেক-আপ নেয়ার আয়না আর টেলিস্কোপের লেন্সের মাঝখানে ছোট্ট একটা ফাটল আছে। এটাকেই অনেকে বলে প্রেক্ষিতের ব্যবধান। অবশ্য এটাকে চোখ খুলে দেওয়াও বলা যায়, আগে হোক আর পরেই চক্ষু উন্মীলনের ব্যাপারটা ঘটেই থাকে। অবশ্য অগণিত লোক আছে, যারা জীবনে কখনই উপলব্ধি করতে পারে না তারা মহাশূন্যের মাঝে ভেসে বেড়াচ্ছে। ধরাপৃষ্ঠে এত অসংখ্য ঘটনা ঘটছে যে কার দৃষ্টিতে কী লেখা আছে তার পাঠোদ্ধার করা দুরূহ।

আমরা এই পৃথিবীর সন্তান। এ নিয়ে আমি তর্ক করতে যাব না। আমরা এই গ্রহের প্রকৃতির প্রাণের অংশ। বানর আর সরীসৃপ আমাদের শিখিয়েছে কিভাবে সন্ত

ান জন্ম দিতে হয়। এ নিয়েও আমার দ্বিধা নাই। বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলে সবকিছু ভিন্ন আকার ধারণ করেছে। কখনই আমি এটা অস্বীকার করব না। আমি শুধু বলব, নাসাগ্র থেকে একটু দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে তো বাধা নেই।

টেলিস্কোপ শব্দটার অর্থ দূরের কোনো জিনিসের প্রতি দৃষ্টি দেয়া। তাহলে কমলা সুন্দরী মেয়েটার সাথে স্পেস টেলিস্কোপের কী সম্পর্ক?

মহাশূন্যে টেলিস্কোপ স্থাপনের মাধ্যমে যেসব গ্রহনক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করা হবে তার কাছাকাছি যাওয়া নয়। সেটা পদাঙ্গুলির উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে অগ্নিগিরির জ্বালামুখ দেখার চেষ্টার মতোই অর্থহীন। স্পেস টেলিস্কোপের আসল উদ্দেশ্য পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে থেকে মহাশূন্য পর্যবেক্ষণ।

বহুলোকের ধারণা আকাশে তারারা মিটমিট করে, কিন্তু আসলে তারা তা করে না। বায়ুমণ্ডলের অবতরণের কারণেই এমনটা ধারণা জন্মায়, যেমন হ্রদের পানীর উপরিতলে তরঙ্গ দেখে যদি কেউ মনে করে তলদেশের প্রস্তখণ্ডের নড়াচড়ার কারণেই ঢেউয়ের উৎপত্তি। অথবা বিপরীতক্রমে সুইমিং পুলের নিচে থেকে ধারণা করা সম্ভব নয় উপরিতলে কী ঘটছে।

পৃথিবী পৃষ্ঠে এমন কোনো টেলিস্কোপ নেই যা মহাশূন্যের নির্ভুল ছবি প্রদান করতে পারে। পারে শুধু হাব্‌ল স্পেস টেলিস্কোপ। আর সে কারণেই ওটা ভূপৃষ্ঠস্থিত যে কোনো টেলিস্কোপের চাইতে অনেক বেশি তথ্য প্রদান করতে পারে।

অনেক লোক আছে যারা এতই ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন যে ঘোড়া আর গরু অথবা জলহস্তি এবং জেব্রার মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। এ ধরনের লোককে সাধারণত চশমা পরতে হয়।

আমি লিখেছিলাম শুরুতে হাব্‌ল টেলিস্কোপের লেন্সে সাংঘাতিক ত্রুটি ধরা পড়ে আর এনডিভারের নাবিকরা ১৯৯৩ সালে সেই ত্রুটি মেরামত করে। তবে ওরা লেন্সটার কিছু হেরফের করেনি। তারা শুধু এর ওপর আর একটা গ্লাস লাগিয়ে দেয় এই গ্লাসটা দশটি ছোট ছোট গ্লাসের সমন্বয়ে গঠিত যাকে বলে কস্টার বা অথবা *কালেক্টিভ অপটিক্স স্পেস টেলিস্কোপ অ্যাক্সিয়াল রিপ্লেসমেন্ট*।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমি হদিস করতে পারলাম না স্পেস টেলিস্কোপের সাথে কিভাবে কমলা সুন্দরীকে সম্পর্কিত করা যায়। এখন বুঝতে পারছি, কারণ আমি বাবার মৃত্যুর দুই সপ্তাহ আগে লেখা তার দীর্ঘ পত্রের পাঠ সমাপ্ত করেছি। সঠিক মর্ম উদ্ধারের জন্য চিঠিটা আমার চারবার আগাগোড়া পড়তে হয়। তবে এই মুহূর্তে আমি পাঠকদের কাছে সেটা ফাঁস করতে চাই না।

পরবর্তীতে আমি যেদিন আবার কমলা সুন্দরীর সাক্ষাৎ পেলাম সেটা ছিল ক্রিসমাস ঈভ, কল্পনা কর, ক্রিসমাস ঈভ। আর এবার আমার সাথে ওর

খোলামেলা বাক্যালাপ হল যাহোক আমরা সেদিন কয়েকটা বাক্য বিনিময় করলাম।

সে সময় আমি এডামস্টুয়েনে আমার ছাত্রবন্ধু গুনারের সাথে একটা ছোট ফ্লাটে ভাগাভাগি করে বাস করছি। তবে ক্রিসমাস উপলক্ষে আমি হামলেভেইয়েনে আমার পরিবারের সাথে ছুটি কাটাচ্ছি। সেখানে থাকার কথা মা, বাবা আর আমার ভাইয়ের, অর্থাৎ তোমার কাকা আইনারের। আমার চাইতে চার বছরের বয়ঃকনিষ্ঠ আইনার সেবার শীতে মাধ্যমিক স্কুলের শেষ বর্ষের ছাত্র। দাদা-দাদী টন্সবার্গে চলে আসার বেশ কয়েক বছর আগের ঘটনা।

ইতিমধ্যে কমলা সুন্দরীর সাথে আবারো দেখা হওয়ার আশা ছেড়েই দিয়েছি, আর সাদা টয়োটার আরোহী ব্যক্তিটির পরিচয় সম্বন্ধেও নিশ্চিত হতে পারিনি। হঠাৎ হামলেভেইয়েনের বাড়িতে ক্রিসমাস সার্ভিসে যোগ দেয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা অনুভব করলাম। আমি যেন নেশার ঘোরে কল্পনা করতে থাকি যে রহস্যময়ী সেই কমলা সুন্দরীও তার নিকটজনের সাথে মিলিত হতে যাওয়ার আগে অবশ্যই ওখানে ক্রিসমাস সার্ভিসে যোগ দেবে। (লোকটাই বা কে আর তার নিকটজনই বা কারা?) আমার মনে হল ক্যাথিড্রালই ওর সাথে দেখা হওয়ার সবচেয়ে সম্ভাব্য জায়গা, এর চাইতে সঠিক সিদ্ধান্ত অন্যকিছু হতেই পারে না।

এখানে পরিষ্কার বলে রাখা ভালো গল্পের ধারাবাহিকতার স্বার্থে আমি কমলা সুন্দরী সম্বন্ধে কিছু বানিয়ে বলছি না। ভূতেরা মিথ্যা বলে না, গিয়র্গ, কারণ এতে তাদের কোনো লাভ নাই। পক্ষান্তরে আমি কিন্তু সব কিছু খোলসা করেও বলছি না। এমন নিরর্থক অভিমানে কে কখন বের হয়েছে!

কমলা সুন্দরীকে খুঁজে পেতে আমি যেসব ব্যর্থ প্রয়াস করেছি সেগুলো এড়িয়ে যেতে পারি। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ আমি গোটা ফ্রোনার ডিস্ট্রিক্টে চিরুণী অভিযান চালিয়েছি, তবে তার বিস্তারিত বিবরণ দিতে চাই না। তা যদি করতে যাই তবে সেটা হবে এক দীর্ঘ ঘোরালো পেঁচালো গল্প। সপ্তাহে অন্তত চারদিন ফ্রোনার পার্কে দীর্ঘক্ষণ হেঁটে বেড়িয়েছি, প্রায়ই মনে হত ওকে বুঝি দেখেছি, হয় ব্রীজের ওপরে, অথবা পার্কের ক্যাফের সম্মুখে আর না হয় পাথরের স্তম্ভের পাশে, তবে দেখা যেত সেটা অন্য কেউ। মাঝে মাঝে সিনেমাতেও গেছি, যদি সেখানে দৈবাৎ দেখা হয়ে যায়। আমার পুরো ফিল্মটা দেখার প্রয়োজন হত না। এ্যাডভারটাইজমেন্ট শেষ হওয়ার পরে যখন বুঝতাম কমলা সুন্দরী আর আসবে না তখন নিঃশব্দে বেরিয়ে এসে অন্য একটা হলে টিকেট কেটে ঢুকে পড়তাম। আমি শুধু সেই ধরনের ফিল্মই বেছে নিতাম আমার মতে যেগুলি তাকে আকৃষ্ট করতে পারে। এ ধরনের একটা ফিল্মের নাম ছিল

ইন্টারসেকশন এন। আর একটা সুইস ফিল্ম নাম 'দ্য লেস মেকার'। তবে এসব এপিসোডের বিস্তারিত বিবরণ দেয়ার প্রয়োজন নেই।

তবে একমাত্র যোগসূত্র যাকে বলব সেটা হল রহস্যময়ী কমলা সুন্দরীর সাথে আমার সাক্ষাৎ হওয়ার সংখ্যা। তার সাথে সাক্ষাতের আমার যেসব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল, তার বিস্তারিত বিবরণ দেয়ার দরকার নেই। যেমন যে সব লটারির টিকেট বড়সড় দাঁও মারতে ব্যর্থ হয়েছে তাদের বিবরণ দেয়া। তুমি কি কখনও এ ধরনের গল্প শুনেছ? তুমি খবরের কাগজে বা ম্যাগাজিনে এমন কোনো কাহিনী পড়েছ, যাতে লটারির বাজি জিতে লাখপতি হতে পারেনি, এমন কোনো লটারির কাহিনী নিয়ে লিখা গল্প? এই গল্পটার ব্যাপারেও একই কথা খাটে। কমলা সুন্দরীর কাহিনীটাও এক বিশাল লটারির মতো যেখানে শুধু বিজয়ী টিকিটটিই দৃশ্যমান। সপ্তাহব্যাপী আর যেসব লটারির টিকেট কেনা হয়েছিল সেগুলোর কথা একবার ভেবে দেখ। এসব টিকেট জমা করে রাখার জন্য তোমাকে কল্পনা করতে হবে হয়তো এক বিশাল হল ঘরের, এমনকি এক বিশাল জিমনেসিয়ামের। তারপর মনে কর যাদুকরের কৌশলপূর্ণ হস্ত আন্দোলনে হাজারদশেক টিকেট উধাও করে দেয়া হল। তাহলে গিয়র্গ, হলে কিন্তু আর বেশি টিকেট থাকবে না। আর তখন আমরা খবরের কাগজে শুধু সেই কটা টিকেটের কথাই পড়ব।

কমলা সুন্দরীকে খুঁজে বের করার চেষ্টাটা অনেকটা এই ধরনের। আমরা শুধু তারই পিছু নিয়েছি, আর আমাদের গল্পের পুরোটাই শুধু তাকে নিয়ে। কিছুক্ষণের জন্য আমাদের আর সব কিছুই ভুলে যেতে হবে। শহরের আর সব কিছুই আমরা লাইন টেনে আলাদা করে ফেলি। আর সব মেয়েকে আমরা মস্ত এক ব্র্যাকেটের মধ্যে আবদ্ধ করে রেখে দিই। ব্যাপারটা বেশ সহজ।

ক্যাথিড্রালে ঢোকার আগে আমি ওর কোনো হদিস পাই নাই। আর বেহালাবাদক যখন বাখ প্রেলুভ বাজাচ্ছে। হঠাৎ করেই ও আমার দৃষ্টিতে আটকা পড়ে গেল। বরফের মতো জমাট বেঁধে গেলাম। আর ভেতরে যেন দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে।

কমলা সুন্দরী অন্য সারিতে, সে ছাড়া আর কেউ হতেই পারে না। আর একবার সে ঘাড় ঘুরিয়ে ক্যারল গায়িকাদের দিকে দৃষ্টি ফেরাল। এবার তার পরনে কমলা রঙের চামড়ার কোট নাই, আর কোলেও নেই ঢাউস কমলার ব্যাগ। হাজার হলেও এটা ক্রিসমাস। সে পরে আছে কালো কোট আর লম্বা চুল রূপোর ক্লিপ দিয়ে ঘাড়ের ওপর জড়ো করে রাখা, হ্যাঁ রূপকথার কন্যার মতোই খাঁটি রূপোর ক্লিপই হয়তো। রূপকথার সেই সাত বামনের ফ্যাশনে তৈরি রূপোর ক্লিপ যারা বার বার স্নো হোয়াইটের জীবন রক্ষা করেছিল।

কিন্তু সাথের লোকটা কে? তার ডানপাশে বসে রয়েছে এক লোক, তবে সার্ভিস চলাকালে একবারও কেউ কারো দিকে একটু হেললো না। বরং বিপরীত কিছুই ঘটল। সার্ভিস শেষে ডানপাশে বসা লোকটার দিকে হেলে পড়ে তার কানে কানে কী যেন ফিসফিস করে বলল। ভাবগতিকটা আমার কাছে বেশ স্বস্তি কর বলে মনে হল না। একজন লোক ডানদিকে বা বাঁদিকে যে কোনো একদিকে কাত হতেই পারে, সেটা তার ব্যাপার। এক্ষেত্রে এ লোকটাও কোনো ব্যতিক্রম নয়। তবে লোকটা ডানদিকেই কাত হল, এটা তুমি বলতে পার।

কমলা সুন্দরীর বাঁয়ে বসা ছিল গোলগাল এক বৃদ্ধা মহিলা, আর এমন কোনো ইঙ্গিত পাওয়া গেল না যাতে মনে হতে পারে ওরা পরস্পরকে চেনে, হয়তো এর আগে ফলের দোকানে ওদের দেখা হয়ে থাকতে পারে, কারণ চেহারা ছুরতে মহিলাকে একজন দোকানী বলেই মনে হচ্ছিল, সম্ভবত আগে থেকেই তাদের একসাথে ক্রিসমাস ক্যারোলে যাওয়ার অভ্যাস আছে। নয়ই বা কেন, গিয়র্গ, 'কেন নয়? এমনটা কি হয় না? হয়তো দোকানী মহিলার একজন ভালো ক্রেতা কমলা সুন্দরী, আরো সুনির্দিষ্ট করে বললে একজন ভালো কমলার ক্রেতা। হয়তো মহিলার কাছ থেকে সে ভালো ছাড় পেয়ে থাকে। মরক্কোর কমলা প্রতি কিলো সাত ক্রোনার, সুবিধাজনক মূল্য, হয়তো আরো কমদামে সাড়ে ছয় ক্রোনারে, আর তাছাড়া মহিলা হয়তো বাছাই করে ব্যাগ ভরে দিতে খাতির করে আধা ঘণ্টা সময়ও ব্যয় করে থাকে।

পুরোহিত তার ভাষণে কী বলল, তার বিন্দুবিসর্গ আমার কানে গেল না, হয়তো মা মেরী, যোসেফ বা নবজাত যিশুকে নিয়ে মূল্যবান কথাবার্তা বলেছে, তাছাড়া অন্য আর কি-ই বা হতে পারে। তিনি ছেলেদের নিয়ে কথা বলেন, আমার ভালো লাগে, এসব বলাই তো তার কর্তব্য। আমি শুধু অপেক্ষা করছি, কখন সার্ভিস শেষ হয়। প্রার্থনা, আশীর্বচন ধীরে ধীরে সমাপ্ত হল, সমবেত ভক্তজনেরা আসন ছেড়ে দাঁড়াল, আমি নিশ্চিত ছিলাম কমলা সুন্দরী আমার আগেই চার্চ থেকে বেরিয়ে যাবে। সে আমার আসন অতিক্রম করে গেল। যেন সামান্য মাথা ঝাঁকাল, সে আমাকে চিনতে পেরেছে কিনা বুঝতে পারলাম না। তবে সে ছিল একা। তার যে চেহারা আমার স্মৃতিতে আঁকা, ওকে তার চাইতে সুন্দর মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল যেন গীর্জার সব চুমকির রঙ একত্র হয়ে ওকে অমন ঝলমলে করে তুলেছে।

হায়! শুধু আমিই জানি সেই একমাত্র খাঁটি কমলা সুন্দরী, তাই তার মধ্যে লুকানো আছে অনেক মনভুলানো রহস্য আমি জানতাম সে এসেছে অন্য এক রূপকথার রাজ্য থেকে যেখানকার রীতিনীতি আমাদের সাথে মেলে না। এও জানতাম সে এসেছে অন্য এক পৃথিবী থেকে আমাদের ওপর নজরদারী করার জন্য। আর এখন সে আমাদের একজন হয়ে এসেছে ক্যাথিড্রালে, আমাদের

ত্রাণকর্তার জন্মোৎসব পালন করার জন্য। এটাকে অবশ্য আমি খারাপ কিছু ভাবিনি, বরং এটা তার মহানুভবতা।

নিঃশব্দে ওকে অনুসরণ করে চললাম। ক্যাথিড্রালের বাইরে কিছু লোক দাঁড়িয়ে পরস্পরকে মেরী ক্রিসমাস জানাচ্ছে। তবে আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল কমলা সুন্দরীর ঘাড়ের ওপর ঐন্দ্রজালিক রূপালী হেয়ার ক্লিপের ওপর। সারা দুনিয়াতে কমলা সুন্দরী একজনই আছে, কারণ সে পথ করে এসেছে অন্য এক বাস্তবতা থেকে। বেশ কয়েক গজ পেছন থেকে ওকে অনুসরণ করে চলেছি। তুষারপাত শুরু হয়েছে হিমানীপত্রক হাওয়ায় নৃত্য করে চলেছে। আমি এটা বোধ করলাম এ কারণে যে অনেকগুলো হিমানীপত্রক কমলা সুন্দরীর কালো চুলে আটকে আছে। আমি ভাবলাম ওর চুল ভিজে যাচ্ছে। আমার ছাতা থাকলে ভালো হত, অন্তত হাতে যদি একটা খবরের কাগজও থাকত, তাহলে তার মাথা বাঁচানো যেত।

বুঝতে পারি এটা পাগলামি, অন্তত এটুকু বোঝার মতো আত্মসমালোচনার শক্তি আমার ছিল। কিন্তু সেটা ছিল ক্রিসমাস ঈভ। অলৌকিকতার যুগ হয়তো শেষ হয়ে গেছে। তবু জীবনে অন্তত একটা তো যাদুকরী মুহূর্ত আসতে পারে। যে কোনো কিছু। হাওয়ায় ভর করে দেবদূতরা চুপিসারে নেমে আসে, আর কমলা সুন্দরীরা রাস্তায় ঘোরাফেরা করে যেন কিছুই হয়নি।

ঠিক উভর স্লটস্‌গেটের কাছে এসে ওর নাগাল ধরে ফেললাম। কয়েক পা সামনে এগিয়ে গিয়ে ওর দিকে ফিরে বললাম, 'মেরী ক্রিসমাস!'

স্পষ্টতই সে কিছুটা হকচকিয়ে গেল, অন্তত এ ধরনের ভানও সে করে থাকতে পারে, এটা অবশ্য সঠিক করে কেউই বলতে পারে না। সে আমার দিকে একটা সংযত হাসি ছুঁড়ে মারল। এখন আর তাকে গুপ্তচর বলে মনে হচ্ছে না। ওকে এখন একজন রমণী বলে মনে হল যাকে ভালোভাবে জানার জন্য যা কিছু করা যেতে পারে।

সে বলল, 'মেরী ক্রিসমাস!'

এখন তার মুখে প্রফুল্ল হাসি। আমরা কথা বলা শুরু করলাম। ওর সাথে সাথে হেঁটে চলেছি বলে কোনোরকম অসন্তোষ প্রকাশ করল না। আমি নিশ্চিত ছিলাম না, তবে মনে হল ও খুশীই হয়েছে। ওর কালো কোটের পকেটে লুকিয়ে দুটি কমলার রেখাচিত্র আমার চোখে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ল। আকার ও গোলত্বে দুটিই অবিকল এক রকম। ব্যাপারটা আমাকে বেশ ঘাবড়ে দিল। আমার মুখমণ্ডল লাজরক্তিম হয়ে উঠল। ইতিমধ্যেই গোলাকৃতির প্রতি আমি অতি সংবেদী হয়ে পড়েছি।

মনে হল অন্য কিছু বলি; যদি কিছু বলার না থাকে তাহলে আমার তাড়া আছে এই ভান করতে হবে এবং তাকে ছেড়ে চলে যেতে হবে। কিন্তু আমি জীবনে কখনও সময়ের এমন বাহুল্য বোধ করিনি। মনে হয় সময় তৈরির ছাঁচের কাছে চলে এসেছি, এর অর্থই যেন আমার কাছে ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেছে। আমার মন চলে গেছে বিখ্যাত ডেনিশ কবি পিয়েত হাইনের সেই বিখ্যাত লাইনের কাছে, *"যে কখনও এই মুহূর্তের জন্য বাঁচে না, সে কখনই বাঁচে না। ভেবে দেখ তুমি বেঁচে আছ না মরেছ।*

আমি তখন উজ্জীবিত, কারণ বাঁচার জন্য ওটাই উপযুক্ত সময়, কারণ এর আগে আমি কখনও বাঁচিনি। আমার মধ্যে কি যেন একটা উল্লসিত। নিজেকে আর সামলে রাখতে পারলাম না। হড়বড় করে বলে বসলাম: "তাহলে তুমি গ্রীনল্যান্ডের পথে নেই?"

প্রশ্নটা বোকার মতো হয়ে গেল, তবে আমার মনে হল, আমি যে পথে এগিয়ে চলেছি, তাতে এর চেয়ে নিরাপদ কিছু নেই। "অর্থ্যাৎ আমি বলতে চাচ্ছি দশ কুকুরের বরফের ওপর টানা শ্লেজ আর তার সাথে দশ কিলো কমলা।'

সে কি মুখ টিপে হাসছিল, নাকি মুখ গোমড়া করেছিল?

সেই মুহূর্তে আমার মনে হল, ট্রাম যাত্রা থেকে ফ্রোনার পর্যন্ত আমাকে সে হয়তো মনেই রাখেনি। এটা আমাকে হতাশায় ডুবিয়ে দিল, মনে হল পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে, তবে সেই সাথে কিছুটা ভারমুক্তও মনে হল। মোটের ওপর মাস দুয়েক হয়ে গেল যখন ট্রামের মধ্যে তার কমলার ব্যাগ উল্টে দিই, এর আগে কখনও আমাদের দেখা হয় নাই, আর গোটা ব্যাপারটা স্থায়ী হয় মাত্র কয়েক সেকেন্ড।

তবে কার্ল ইয়োহানের কাফেতে দেখা হওয়ার পর থেকে নিশ্চয়ই আমাকে তার মনে রাখার কথা। নাকি সে চিরদিন অজানা লোকের হাতে হাত রেখে বসে থাকে? এটা খুবই অস্বস্তিকর ভাবনা। ঘটনাটা নিশ্চয়ই ওকে বিচলিত করেছে। এমন কি একজন সত্যিকারের কমলা সুন্দরীর এমন উদারভাবে বদান্যতা বিতরণ করার কথা নয়।

'কমলা?' প্রায় ভূমধ্যসাগরীয় উষ্ণতা ছড়িয়ে সে পুনরাবৃত্তি করে, যেন সাহারা মরুভূমিতে ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপ্টা।

'ঠিক তাই,' আমি জবাব দিলাম। গ্রীনল্যান্ড অভিযানে দুজনের জন্য পর্যাপ্ত।

সে দাঁড়িয়ে পড়ে। আমি বুঝতে পারি না আলোচনাটা সে চালিয়ে যেতে চায় কিনা আমি তাকে ঝুঁকিপূর্ণ গ্রীনল্যান্ড অভিযানে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, এরকম কিছু ভাবছে। তবে আবার সে আমার দিকে চোখ তুলে তাকায়। ওর কালো চোখ

আমার চোখের সাথে লুকোচুরি খেলতে থাকে। সে জিজ্ঞেস করে 'তা তুমিই সে, তাই না?'

আমি মাথা দোলাই, যদিও তার কথার সদর্থ পুরোপুরি বুঝতে পারি নাই, কারণ একমাত্র আমিই সেরকম ব্যক্তি নই যে ওকে ব্যাগভর্তি কমলা বয়ে নিয়ে যেতে দেখেছি, আর সে এমনভাবে বক্তব্য রাখে যেন নতুন কিছু মনে পড়েছে, 'ফ্রোনার ট্রামে তোমার সাথেই আমার ধাক্কা লেগেছিল, তাই না?'

আমি মাথা দোলাই।

'তুমি একটা আসল হাঁদারাম।'

'আর সেই হাঁদারামই চায় তোমার কমলার যেটুকু ক্ষতি হয়েছিল, তা পুরণ করতে।'

সে মন খুলে হাসে, যেন এ নিয়ে তার কোনো মাথা ব্যথাই নাই। একদিকে মাথা কাৎ করে সে বলে, 'এ নিয়ে না ভাবলেও চলবে, তুমি দারুণ ভালো।'

এই মুহূর্তে প্রসঙ্গটাতে একটু বিরতি দিতে হচ্ছে বলে ক্ষমা করো, গিয়র্গ, তবে তোমার কাছে একটা দাবি তুমি একটা ধাঁধার সমাধান করে দেবে। আমি নিশ্চিত তুমি বুঝতে পারছ এ নিয়ে আমার আর বেশি দূর এগিয়ে যাওয়ার নেই। সেই বিদঘুটে ট্রামজার্নিতে মেয়েটি আমাকে এমন এক সাড়াজাগানী চাহনী দিয়েছিল, অনেকটা লোভনীয় চাহনীই ছিল সেটা। সেই গিজগিজে ট্রামের ভিড়ে ওর চাহনী আমাকে আলাদা করে বেছে নিয়েছিল, বলা যায় সারা পৃথিবীর মানুষের চেহারা থেকে। তার পর সপ্তাহখানেক বাদে কাফেতে ওর টেবিলে আমাকে বসতে দিয়েছিল। আমার হাতে হাত রাখার আগে পুরো এক মিনিট সে আমার চোখে চোখ রেখেছিল। সেই হাতের পরশে ছিল এক যাদুকরীর উল্লসিত অনুভূতি, তারপর দেখা হল ক্রিসমাসের ঘণ্টাধ্বনির কয়েক মিনিট মাত্র আগে। তবু কি সে আমাকে স্মরণ রাখেনি?

আমাদের ভুললে চলবে না সে এসেছে অন্য এক রূপকথার ভুবন থেকে। যে রূপকথার রাজ্যের তত্তরতরিকা ভিন্ন। যেহেতু আমরা দুটি সমান্তরাল ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি, একটাতে রয়েছে আমাদের সূর্য, চন্দ্র আর অন্যটাতে রয়েছে অপরিমেয় রূপকথার রাজ্য, যার দরজা খুলে দিয়েছে কমলা সুন্দরী। তবু বলব গিয়র্গ, দুটি পৃথক সম্ভাবনা রয়েছে হয় দুটি ঘটনাতেই, এমনকি কমলার দোকানের সাক্ষাতেও সে আমাকে মনে রেখেছে আর ভান করছে সে আমাকে চেনেই না, অথবা ভুলে গেছে। এটা এক ধরনের সম্ভাব্যতা অন্যটা উদ্বেগজনক। ঠিক আছে, তাহলে শোন: বেচারা মেয়েটা আসলে সুস্থ নয়, লোকে যেমন বলে, ওর মন ঠিক নেই। সে আসলে সাংঘাতিক স্মৃতি প্রতিবন্ধী। হয়তো সে এই মুহূর্তের কোনো কথা পর মুহূর্তেই ভুলে যায়, আর

এই সমস্যাটা প্রত্যেক কাঠবিড়ালীরই আছে। কাঠবিড়ালীরা শুধুমাত্র বেঁচে থাকে, কখনও এখানে, কখনও ওখানে, কারণ যে এই মুহূর্তে বাঁচে না, সে কখনই বাঁচে না, তোমার বেলায় ব্যাপারটা কেমন? জীবনের আনন্দময় খেলায় স্মৃতি বা প্রতিবিম্বের কোনো স্থান নেই। এটা স্বতই পরিপূর্ণ। কমলা সুন্দরী যে রূপকথার রাজ্য থেকে এসেছে, সেখানকার রীতিনীতি এমনটাই। প্রসঙ্গক্রমে আমার এইমাত্র মনে পড়ল এই রূপকথার নাম কী: এ নাম হল *এস আমার স্বপ্নের মাঝে*।

তবে আর একভাবে বিবেচনা করলে, গিয়র্গ, আমাকে ভেবে দেখতে হবে এ পর্যন্ত আমি কীভাবে তার সান্নিধ্যে এসেছি। অমিও হাতে হাত রেখে ওর চোখের গভীরে তাকিয়ে থাকতে পারতাম, কিন্তু ক্রিসমাস সার্ভিস সেরে ক্যাথিড্রাল থেকে বেরিয়ে ওকে যখন মেরী ক্রিসমাস বললাম, তখন আমাদের ইতিপূর্বেকার সাক্ষাতের বিষয়ে তাকে কোনো প্রসঙ্গ টেনে না আনা এবং এটা ছিল শোভনীয়। সেটা তো দূরের কথা, বরং জিজ্ঞেস করেছি সে গ্রীনল্যান্ড অভিযানে যাচ্ছে কিনা, আর সাথে ৮টি কুকুর আর দশ কিলো কমলা থাকছে কিনা! কমলা সুন্দরী আমার সম্বন্ধে কী ভেবে থাকবে? হয়তো ভাববে আমি একজন চিড় খাওয়া ব্যক্তিত্বের লোক।

আমরা হয়তো দুজন কথা বলেছি ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে, আমরা হয়তো এমন একটা জটিল বল খেলছি, যার অসংখ্য নিয়মকানুন, আমরা শটের পর শট মারছি, কিন্তু কোনোটাই জালে জড়াচ্ছে না, ঠিক সেই সময়, গিয়র্গ, একটা খালি ট্যাক্সি একের্সগাটার দিক থেকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল, কমলা সুন্দরী হাত বাড়িয়ে দিল, ট্যাক্সিটা থেমে পড়ল, সে ট্যাক্সির দিকে দৌড়ে গেল...

আমি সিন্ডারেলার কথা ভাবছিলাম, যাকে বলড্যান্স থেকে উর্ধ্বশ্বাসে বাড়ির দিকে দৌড় দিতে হয়, যাতে রাত বারোটার আগে অবশ্যই বাড়ি ফিরতে হবে, তা না হলে সম্মোহন ছুটে যাবে। আমি ভাবলাম রাজকুমারীর কথা যাকে নিঃসঙ্গভাবে চুপিসারে চিলেকোঠায় উঠে যেতে হবে।

তবে আমার জানা উচিত এটা ঘটেও থাকতে পারে। অবশ্য ক্রিসমাসের ঘণ্টা বাজার আগেই কমলা সুন্দরীকে বাড়ি ফিরতে হবে, এটা নিয়মের মধ্যে পড়ে। কমলা সুন্দরীরা ক্রিসমাস ঘণ্টা বাজার পর রাস্তায় ঘুরতে পারে না। তা হলে ঘণ্টা বাজার অর্থ কী? এটা কী এজন্য নয় যাতে যুবাবয়সী ছেলেরা কমলা সুন্দরীর রূপের ফাঁদে আটকা না পড়ে? এখন সময় পৌনে পাঁচটা, এবং শীঘ্রই আমি ঈশ্বরপরিত্যক্ত প্রান্তে নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে থাকব।

আমি চিন্তা করছিলাম দ্রুততালে। জিজ্ঞেস করতে পারতাম, আমরা একই দিকে যাচ্ছি কিনা। অথবা তার দশ কিলো কমলা নষ্ট করার জন্য একটা একশ ক্রোনারের নোট এবং অনাহুত কষ্ট দেয়ার ক্ষতিপূরণের জন্য আরো ত্রিশ ক্রোনার তার দিকে

বাড়িয়ে ধরতে পারি কিনা, অবশ্য আমি নিশ্চিত ছিলাম না কমলার কৌতূহলকে শান্ত করার জন্য জিজ্ঞেস করতে পারতাম এত বিপুল পরিমাণ কমলা দিয়ে সে কী করে। অবশ্য খাদ্যবস্তু মজুত করে রাখাটা নতুন কিছু নয়। তবে সেটা কমলাই হতে হবে কেন? আপেল বা কলা নয় কেন? ওর বৃহৎ পরিবারের কক্ষ সিমেস্টার শেষে ছাত্রছাত্রীদের সমাপনী পার্টিতে কমলার রসের আইসক্রিম বানানো, অথবা পেশল বাবার বাহুবেষ্টনে কেবল হাঁটতে শিখছে এমন বাচ্চার জন্য, এমনি আরো কত কী। আমার বিশ্বাস হয় না এই মুহূর্তে কোনো শোরগোলপূর্ণ নার্সারী স্কুল পরিদর্শনে যেতে রাজি হব। বাচ্চাকাচ্চার দঙ্গল আমাকে খুব ঘাবড়ে দেয়।

তবে গিয়র্গ, এত বেশি বিকল্প চিন্তা আমার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল যে, তাকে বলার মতো সঠিক কথাটা আমি খুঁজে পাইনি। তবে সে গাড়িতে চড়ার মুহূর্তে হড়বড় করে বলে বসলাম, 'আমার মনে হয়, আমি তোমার প্রেমে পড়ে গেছি!'

কথাটা সত্যি, তবে বলে ফেলার পরেই মনে মনে আফসোস হল। ট্যাক্সিটা এগিয়ে চলল, তবে গাড়ির মধ্যে কমলা সুন্দরী ছিল না। সে তার মন বদলেছে, ধীরে ধীরে, পেছন ফিরে আমার দিকে এগিয়ে এল, নিজের ইচ্ছাশক্তিকে জাগিয়ে তুলল, আমার হাত ধরল, যেন আমরা গত পাঁচ বছর ধরে হাত ধরাধরি করে আছি আর মাথা দুলিয়ে সামনে চলার ইঙ্গিত করল। সে আমার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে বলল, যদি আর একটা ট্যাক্সি আসে, তাহলে সেটা ধরতে হবে, কারণ আমার আর এক জায়গায় যাওয়ার কথা।'

হয়তো অপেক্ষমাণ স্বামী, অথবা মনোমুগ্ধকর শিশু, আমি ভাবলাম, অথবা হয়তো মা ও বাবা, অথবা পুরোহিত ফাদার, হয়তো যেখান থেকে ক্রিসমাস সার্ভিস শেষ করে আসছি সেই ফাদারের সাথে কোনো অফিসিয়াল ডিউটি অথবা বাড়িতে ওর চার বোন, দুই ভাই, এবং সেই ফ্লাটে একটা ছোট্ট কুকুরছানাও আছে, হয়তো ওর সবচেয়ে ছোট্ট ভাইটি যার নাম পিটার হতে পারে, তার ফেরার অপেক্ষায় ঘ্যানঘ্যান করছে। অথবা বিষণ্ন শিরাবহুল এক গ্রীনল্যান্ড অভিযাত্রীর জন্য মেরু অঞ্চলে ব্যবহার্য চামড়ার ভারী আঙ্গুলবিহীন দস্তানা লোমওয়ালা স্যুট, বরফে চলার জুতা, স্কী স্টিক এবং একটা ডিকশনারী, সবকিছু একত্রে জড়িয়ে রাখা আছে ক্রিসমাস ট্রীর নিচে। কমলা সুন্দরী নিশ্চয়ই আজ রাতে কোনো সিমেস্টার সমাপনী পার্টিতে যোগ দিতে যাচ্ছে না। আজ ওর নার্সারী স্কুলের ছুটি।

"শীঘ্রই ঘণ্টাধ্বনির মাধ্যমে ক্রিসমাসের উদ্বোধন করা হবে, তাই না?" আমি জিজ্ঞেস করি, "ক্রিসমাসের ঘণ্টাধ্বনির পরেই তোমাকে শহরে পৌঁছতে হবে।"

এ কথার কোনো জবাব দিল না ও, শুধু আদর করে আমার হাতে চাপ দিল ঠিক যেন আমরা ভারশূন্য অবস্থায় মহাশূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছি, যেন আমরা আন্ত-নাক্ষত্রিক সুধা পান করে সমগ্র বিশ্বকে নিজের করে নিয়েছি।

আমরা ইতিহাস যাদুঘরের পাশ দিয়ে হেঁটে প্যালেস পার্কে এসে পৌছলাম। আমি জানতাম যে কোনো মুহূর্তে আর একটা ট্যাক্সি এসে পড়তে পারে। আমি আরো জানতাম যে কোনো মুহূর্তে ঘণ্টাধ্বনির মাধ্যমে ক্রিসমাস উৎসবের প্রারম্ভিক ঘোষণা হতে পারে।

আমি থামলাম, ওর সামনে দাঁড়ালাম। ওর ভিজা চুলে আলতো করে হাত বুলালাম, তারপর আমার হাত এসে থামল ওর ঘাড়ের ওপর রূপোর তৈরি চুলের ক্লিপে। ওর ঘাড় বরফ শীতল, তবু আমার শরীরে উষ্ণতা ছড়িয়ে পড়ল। ভাব একবার, আমি ওকে স্পর্শ করছি!

তারপর আমি বললাম, 'আবার কবে আমাদের দেখা হবে?'

ও কিছুক্ষণ চোখ নিচু করে বাঁধানো রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর চোখ তোলে, ওর চোখের তারা অস্বস্তিতে কাঁপছিল, আর আমার মনে হল ওর অধরোষ্ঠও কাঁপছে। তারপর সে আমার সামনে একটা ধাঁধা তুলে ধরল, যা নিয়ে আমার সামনের দিনগুলোতে অনেক ভাবতে হয়েছে। সে বলল: 'তুমি কত দিন অপেক্ষা করতে পারবে?'

এ প্রশ্নের উত্তর আমি কীভাবে দিতে পারতাম, গিয়র্গ? হয়তো এটা একটা ফাঁদ। যদি বলতাম, 'দুই বা তিনদিন' তাহলে ও ভাবত আমি বড় বেশি বেচইন যদি বলতাম 'জীবনভর,' তাহলে ভাবত আমি ওকে সত্যিকার ভালবাসি না, বা আমার মনস্কামনা নিখাদ নয়। কাজেই আমাকে মাঝামাঝি একটা পথ বের করতে হবে।

'আমি ততক্ষণ অপেক্ষা করতে পারি যতক্ষণ না যন্ত্রণায় আমার হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয়,' আমি বললাম।

ওর মুখে এক টুকরা ম্লান হাসি চমক দিয়ে গেল। আমার ঠোঁটে ও আঙুল বুলিয়ে দিল, তারপর বলল: 'আর সেটা কতদিন ধরে?'

আমি কয়েকবার মাথা ঝাঁকালাম, আর স্থির করলাম আমার প্রকৃত মনোভাবটাই খুলে বলব: 'হয়তো আরো পাঁচ মিনিট।'

পরিষ্কার বোঝা গেল সে আমার উত্তরে খুশী হয়েছে, তবে আমার কথাটাকে খণ্ডন করে বলল, 'তুমি যদি আর একটু বেশি অপেক্ষা করতে পারতে, তাহলে ভালো হত।'

এবার আমার পালা, একটা প্রশ্নের উত্তর দাবী করার 'কত দিন?'

'তোমাকে অবশ্যই ছয় মাস ধৈর্য ধারণ করতে হবে,' সে বলল, 'তোমার পক্ষে যদি এই সময়টা অপেক্ষা করা সম্ভব হয়, তাহলে আবার আমাদের দেখা হতে পারে।'

আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম, বুক ভেঙ্গে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। 'এত দেরি কী জন্য?'

কমলা সুন্দরীর মুখের পেশী শক্ত হয়ে এল। মনে হচ্ছে কঠোর হওয়ার জন্য ওকে যুদ্ধ করতে হচ্ছে, 'কারণ ঠিক অতটুকু সময়ই তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে।'

সে বুঝতে পারে কতটা হতাশা আমাকে আঘাত করেছে। আর সে কারণেই সে যোগ করে: 'তবে যদি এতটা অপেক্ষা করা সম্ভব হয়, তাহলে পরবর্তী ছয় মাস প্রতিদিন আমাদের সাক্ষাৎ হতে পারে।'

গীর্জার ঘণ্টা বাজতে শুরু করল, আর শুধু তখনই ওর ভেজা চুল আর রূপোর ক্লিপ থেকে আমার হাত সরিয়ে নেয়ার কথা মনে হল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে ভার্গেল্যান্ডসভেইনের দিক থেকে এক খালি ট্যাক্সি এসে পড়ল। ওটার বোধ হয় আসারই কথা।

সে আমার চোখে চোখ রাখল, মনে হল ও অনুনয় করছে, ওকে বোঝার যেন আমার সবটুকু বোধশক্তি অনুভূতি কাজে লাগাই। আবার ওর চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল। 'আচ্ছা, হ্যাপি ক্রিসমাস... *ইয়ান ওলাফ*!' কাঁপা কাঁপা গলায় বলে ও। তারপর হাত তুলে ও ট্যাক্সি থামিয়ে গাড়িতে চেপে বসে এবং উৎফুল্লভাবে আমার দিকে হাত নাড়ে। তবে নিয়তি শূন্য মণ্ডলে ভারী বোঝা হয়ে ঝুলে রইল। গাড়ি চলতে শুরু করার পর সে আর পেছন ফিরে চাইল না, তারপর মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমার মনে হল সে কাঁদছিল।

আমি সম্পূর্ণ পরাস্ত গিয়র্গ। আমি স্তম্ভিত, আমি কোটি টাকার লটারি জিতেছি তবে তা কয়েক মিনিটের জন্য, তারপর টিকেটের মধ্যে কী যেন একটা গোলমাল ধরা পড়ল, আর পুরস্কারের টাকাটা নেয়া সম্ভব হল না, অন্তত এই মুহূর্তে তো নয়ই।

এই অপার্থিব কমলা সুন্দরীটি আসলে কে? এই প্রশ্নটা আমি আগেও বহুবার করেছি। আর এখন আমার সামনে নতুন একটা প্রশ্ন এসে দাঁড়িয়েছে, *সে আমার নামটা জানল কীভাবে?*

ক্যাথিড্রাল এবং নগর কেন্দ্রের সব গীর্জার ঘণ্টা তখনও বেজে চলেছে। ঘণ্টা ধ্বনির মাধ্যমে ওরা ক্রিসমাস উৎসবকে স্বাগত জানাচ্ছে। রাস্তায় আর একজন লোকও ছিল না। আর সেই কারণে ডিসেম্বরের হিমেল বাতাসে বারবার চিৎকার করে একটা প্রশ্নই ছুঁড়ে দিলাম, ঠিক যেন গান গাইছি। 'ও কীভাবে জানল আমার নাম: 'আরও একটা প্রশ্ন আমার সত্তার ওপর চেপে বসেছে: ওর সাথে আবার দেখা হতে ছয় মাস কেন অপেক্ষা করতে হবে?'

এ প্রশ্নটা নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করার যথেষ্ট সময় পাব। আর ধীরে ধীরে দিন গড়িয়ে যেতে থাকে, প্রশ্নের সমাধানের ব্যাপারে আমি কখনও খেই হারিয়ে ফেলিনি, শুধু বলতে পারছি না কোনটা আসল সত্যি হয়ে টিকে থাকবে।

আমাকে কয়েকটা মূল্যবান ইঙ্গিত ভেবে দেখতে হবে, তবে তুমি তো জানো, ইশারা বিশ্লেষণ এবং লক্ষণ নির্ধারণের ব্যাপারে আমার অনুমান বেশ পোক্ত। হয়তো আমি একটু অতি উৎসাহী। এই ব্যাপারটার অনেকগুলো সমান্তরাল তত্ত্ব দাঁড় করানো যায়।

হয়তো কমলা সুন্দরী সত্যিই সাংঘাতিক অসুস্থ, আর সে কারণে একমাত্র কমলাকেই পথ্য হিসাবে গ্রহণ করার কড়াকড়ি নির্দেশ রয়েছে, হয়তো আগামী ছয় মাসের জন্য তাকে আমেরিকা বা সুইজারল্যান্ডে চিকিৎসার জন্য যেতে হবে, যেহেতু দেশের চিকিৎসকরা তার যথাযথ চিকিৎসা করতে সমর্থ নয়। সব সময় ওর চোখ অশ্রুপূর্ণ থাকত, বিশেষ করে যখনই সে আমার কাছে থেকে বিদায় নিত। কিন্তু অন্য দিকে সে তো বলেছে নতুন বছরের দিনগুলোতে প্রতিদিনই আমাদের সাক্ষাৎ হতে পারে, অর্থাৎ জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত। প্রথমত আমাকে কমলা সুন্দরীর জন্য ছয় মাস অপেক্ষা করতে হবে, আর তারপরে বছরের অবশিষ্ট দিনগুলোতে আমাদের প্রতি দিনই দেখা হতে পারে। এই চিন্তাটা আমাকে উজ্জীবিত করল। এটা খুব ভালো একটা শর্ত, আর এতে আমার দুঃখ করার কিছু নেই। এর অর্থ আগামী বছর আমরা প্রতি একদিন পর পর দেখা করতে পারি। যদি এমনটা হত যে আমরা এখন থেকে ছয় মাস প্রতিদিন দেখা করতে পারব, আর তারপর আর কোনোদিনই আমদের দেখা হবে না, তাহলে সেটা কী সাংঘাতিক পীড়াদায়ক হত না?

আমি সবে চিকিৎসা অধ্যয়ন শুরু করেছি, আর এটা সত্যি যে মেডিকেলের ছাত্ররা নিজেদের এবং অন্যদের মধ্যে অনেক কাল্পনিক রোগের অস্তিত্ব অনুমান করে। রোগ নির্ণয়ের ব্যাপারে ওদের উৎসাহটা অনেকটা ডিটেকটিভদের মতোই অতিরঞ্জিত। যেমন ধর্মতত্ত্বের ছাত্রদের পক্ষে ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দেহ প্রকাশ করাটা অস্বাভাবিক নয়, আর আইনের ছাত্ররা সন্দেহ করে দেশের আইন ও বিচার ব্যবস্থার ওপর। কাজেই নিজের কঠোর আত্মনিয়ন্ত্রণের স্বার্থে কমলা সুন্দরী সাংঘাতিক অসুস্থ আর অপ্রীতিকর চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে যাচ্ছে, এই চিন্তা বাদ দিলাম।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, এমনকি কমলা সুন্দরী যদি সাংঘাতিক অসুস্থ হয়ে থাকে, অথবা মানসিকভাবে সুস্থ না থাকে তা হলে সে যে আমার নাম মনে রেখেছে এটার ব্যাখ্যা কী? আর যতবার সাথে দেখা হয়েছে ততবারই ওর চোখে জল কেন? আমার মধ্যে এমন কী দেখেছে যার জন্য ওকে এমন দুর্বোধ্যভাবে বিষণ্ন হতে হয়েছে?

এই পর্যায়ে এসে আমার মনে হচ্ছে অসচেতনভাবেই তোমাকে এসব কাল্পনিক ভাবনা চিন্তার মধ্যে টেনে আনছি, যেন গালগল্পের এক জাল বুনছি এক

ক্রিসমাস উৎসবের দিনে। যেমন মনে কর, ফ্রোনারের এক বিশাল পরিবার সম্বন্ধে যে গল্প বানিয়েছিলাম তা এক পাশে ঠেলে ফেলে দিলাম। অথবা আগামী ছয়মাস ধরে কমলা সুন্দরীর সাথে দেখা না হওয়ার যেসব কারণ আবিষ্কার করেছি তার একটা লিস্ট বানাতে পারি। যেসব উত্তর বানিয়েছি তার মধ্যে সবচেয়ে স্বাতন্ত্র্যের দাবীদার যেটা তা হল কমলা সুন্দরী এতই উত্তম যে এই মাটির পৃথিবী তার উপযুক্ত জায়গা নয়। সে হয়তো বিশাল মহাদেশ আফ্রিকার দরিদ্রতম মানুষদের জন্য খাদ্য ও অষুধ গোপনে পাচার করে নিয়ে গেছে, বিশেষত যে অঞ্চলগুলোতে ম্যালেরিয়া এবং আরো সাংঘাতিক সব রোগ ধ্বংসলীলা চালাচ্ছে। এই উত্তর কিন্তু অতগুলো কমলার রহস্য উন্মোচন করতে পারে না। কিন্তু নয়ই বা কেন? হয়তো ওগুলো সে আফ্রিকাতেই নিয়ে যাচ্ছে। কথাটা আমি আগে ভেবে দেখিনি কেন? হয়তো ওর সব সঞ্চয় ব্যয় হয়ে গেছে একটা ঢাউস হারকিউলেস বিমান ভাড়া করতে।

তবে গিয়র্গ, আমরা ইতিমধ্যে সম্মত হয়েছি কমলা সুন্দরীর আসল সূত্রটা খুঁজে বের করব। যদি আমি কমলা সুন্দরী নিয়ে যেসব চিন্তা ও কল্পনার জাল বুনেছি তা প্রকাশ করতে চাই, তাহলে হয়তো গোটা একটা বছরই আমাকে কম্পিউটারে বসে থাকতে হবে। কিন্তু আমার হাতে অত সময় নেই। এটা খুবই সরল ব্যাপার, তবে একথা ভাবতে আমাকে অত্যন্ত পীড়া দেয়।

তবে কল্পকাহিনীতে কেন মনোনিবেশ করছি, সেই দুর্লভ মুহূর্ত ছাড়াও– কমলা সুন্দরী বেশ কবার আমার চোখে চোখ রেখেছে। বারদুয়েক সে আমার হাতও ধরেছে, আর একটা বিশেষ মুহূর্তে সে আঙুল দিয়ে আমার ঠোঁট বুলিয়েছে, তবে যে ব্যাপারটাকে আমার সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে তা হল ওর অল্প কয়েকটা কথা, আমরা যা পরস্পরের মধ্যে বিনিময় করেছি। কাজেই যেসব কথা আমাদের মধ্যে বিনিময় হয়েছে তার সঠিক তাৎপর্য অনুধাবন করতে হবে। আমাদের কথাগুলো তাড়াতাড়ি লিখে ফেলতে হবে, আর এসবের নির্গলিতার্থ নিষ্কাশণ করতে আমাকে অনেক মাথা খাটাতে হবে।

আচ্ছা গিয়র্গ তুমি কি কোনো মাথামুণ্ডু বের করতে পারছ? সে অতগুলো কমলা কিনতে গেল কেন? (২) এবার বল সে কাফেতে একটা কথাও না বলে দীর্ঘক্ষণ কেন আমার হাতে হাত রেখে বসে রইল। (৩) কেনই বা ইয়ংস্টর্গেটের ফলের দোকানে কমলা কিনতে সে কমলাগুলো অমন খুঁটে খুঁটে পরখ করছিল যাতে একটা অন্যটার অনুরূপ না হয় (৪) আমাদের মধ্যে কেন ছয় মাস দেখা সাক্ষাৎ হবে না, এর সূত্র কী (৫) সবচেয়ে বড় ধাঁধা, সে আমার নাম জানল কী করে?

যদি তুমি এসব হেয়ালীর কিনারা করতে পার, তাহলে হয়তো মূল প্রশ্নটার উত্তর পেয়ে যাবে: কমলা সুন্দরীটি কে? সে কি আমাদের একজন, নাকি সে

সম্পূর্ণ অন্য এক বাস্তবতা থেকে এসেছে, অন্য এক জগৎ থেকে যে জগতে ওকে ছয় মাসের জন্য ফিরে যেতে হবে, তারপর আবার ফিরে এসে আমাদের মাঝে বাস করবে।

আমি এর সূত্র খুঁজে পাইনি, গিয়র্গ, আমি ডায়াগনোসিস করতে পারি নাই।

কমলা সুন্দরীর ট্যাক্সি ভার্গেল্যান্ডস্‌ভেইয়েনের দিকে চলে যাওয়ার অনেকক্ষণ বাদে আর একটা ট্যাক্সি এগিয়ে এল, আর আমি ওটাতে চড়ে বসলাম। আমি হামলেভেইয়েনে আমার বাড়ির দিকে রওনা দিলাম পরিবার পরিজনসহ ক্রিসমাস উৎসব পালন করার জন্য।

সেবার শীতে আইনানের একটা তীব্র আবেগ ছিল স্ল্যালম স্কী করা। আমি ওকে এক জোড়া অমসৃণ স্কী দস্তানা কিনে দিয়েছিলাম এবং প্রত্যাশা ছিল ক্রিসমাস ডিনারের পরে ওগুলো ও খুলে ফেলবে। আমি ওর ভোজনবিলাসী বিড়ালের জন্যও এক টিন লোভনীয় খাবার কিনে দিয়েছিলাম। মায়ের জন্য চাই বহুল আলোচিত একটা ফিনল্যান্ডীয় কবিতা সংকলন। এটা মার্তা তিকানেনের লেখা, সংকলনটির নাম *শতাব্দীর প্রেমের গল্প*। বাবাকে কিনে দিতে হবে নরওয়ের এক নম্বরের ঔপন্যাসিক আর্লিং গিয়েলস্‌ভিকের লেখা উপন্যাস *মৃতের দৌড়*। সম্প্রতি আমি বইটা পড়েছি এবং মনে হয়েছিল ওটা বাবার জন্য বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। তবে এটার মধ্যে এর চাইতেও বেশি কিছু আছে। ঐসব দিনগুলিতে আমিও কিছু একটা লেখার বাসনা মনে মনে লালন করছিলাম। সেই জন্যই আমি তাগিদ বোধ করছিলাম সদ্য আত্মপ্রকাশ করতে চায় এমন এক উদীয়মান লেখকের লেখা বাবার হাতে তুলে দেব।

সে সময়ে আমি শোবার ঘরের বাইরে ছোট্ট একটা কুঠরিতে ঘুমাতাম, এখন এটা তোমার ঘর, অন্ততপক্ষে লেখার সময় তো বটেই। পড়ার সময়ের কথা বলতে গেলে বলব, সময়ের কোনো ঠিকঠিকানা ছিল না।

আমি এই লেখার ব্যাপারে যে নিয়ম নির্ধারণ করেছি, তা কঠোরভাবে পালন করতে হলে, সেবারের ক্রিসমাস উদ্‌যাপনের বিশদ বিবরণ দেয়া ঠিক হবে না। একমাত্র যে কথাটা ফাঁস করতে চাই তা হল ক্রিসমাস ইভের রাতে আমি দু'চোখের পাতা এক করতে পারিনি।

এ পর্যন্ত আমি বাবার চিঠির অর্ধেকটা পড়ে ফেলেছি, তবে আমাকে এখন একটু ছোট ঘরে যেতে হবে। দোষটা আমারই অবশ্য এটা হল বেসামাল কোক গেলার ফল।

গোল্লায় যাক! ভাবলাম, আমাকে এখন শয়নকক্ষ, হলঘর আর লবির মধ্য দিয়ে সন্ধিৎসু চোখের দৃষ্টি পেরিয়ে যেতে হবে। আমার মনে হয় এটাকেই বলে সৈনিকের শাস্তি ভোগ করার দৌড়। কিন্তু আমার কোনো গতি নেই।

দরজার তালা খুললাম, প্রিন্টআউটটা বিছানার ওপর ফেলে রেখে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দিলাম। তারপর চাবিটা পকেটে পুরলাম।

ওদেব চারজনের চোখই আমার ওপর। আমার পেছনে উৎসুক চোখের চাহনি আমি মোটেই গ্রাহ্য করলাম না।

'তুমি কি ইতিমধ্যে শেষ করেছ,' মা জিজ্ঞেস করে। তার চেহারাটা মনে হল এক বিশাল প্রশ্ন চিহ্ন। আমি যা পড়ছি আদপে সেটা কী বিষয়?

'এটা কি খুবই দুঃখের কাহিনী?' ইয়োর্গেন সাহস করে বলে। সে দেখাতে চায় আমার বাবার মৃত্যুতে সে খুব মর্মাহত, যদিও সে সব সময় চেষ্টা করেছে বাবার শূন্য স্থানটা পূরণ করতে। ভালো কথা, এ পর্যন্ত সব ঠিক আছে, তবে আমার মনে হয় না স্বামীহারা মায়ের প্রতি তার তেমন সমবেদনা আছে, এবং এ সময় তার স্বামীর অভাব পূরণ করতে পারে। আমার অন্তরের অন্তঃস্তল থেকে আমি অনুভব করি বাবার মৃত্যুতে ইয়োর্গেন খুশীই হয়েছে। যদি তার মৃত্যু না হত তাহলে সে মাকে কাছে পেত না, আর মিরিয়ামকেও পেত না। তা না হলে সে আমাকেও পেত না। একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে, *একজনের মাংস, আর একজনের বিষ*।

আমি দেখলাম সে একটা বড় গ্লাস পূর্ণ করে হুইস্কি ঢালল। ওর সাথে মাঝে মাঝেই একটা গ্লাস থাকত, তবে সেটা শুধু শুক্র আর শনিবারে, তবে আজ সোমবার।

আমার মনে হয় না, শয়ন কক্ষে এক গ্লাস কড়া মদ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেও তেমন বিব্রত বোধ করে, অবশ্য সে কারণে আমি কথাটা বলিনি। তবে সে একটু অন্যরকম। কারণ আমি আমার প্রকৃত পিতা যে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে আমার জন্য কিছু লিখে গিয়েছে, সেটা ঘরে তালা বন্ধ করে পড়ছি, এবং লেখাটা লেখা হল দৃশ্যপটে ইয়োর্গেনের আসার অনেক্র আগেই। আমি যখন কমবয়েসী ছিলাম, তখন ইয়োর্গেনকে ডাকতাম নবাগত বলে। এটা ছিল ছেলেমানুষী, ওকে কেবল বিরক্ত করার জন্য করতাম এটা।

'আরো কিছু পড়ার আছে নাকি?' জিজ্ঞেস করে। সে এক একটা সিগ্রেট জ্বালায়। লাঠিটার ঠিক প্রান্তই ধরতে পেরেছে সে। 'এ পর্যন্ত আমি লেখাটার শুধুমাত্র অর্ধেকটাই পড়েছি, আমি জবাব দিলাম। আমার একটু ছোট ঘরে যাওয়ার দরকার।'

'তবে নিশ্চয়ই তুমি লেখাটা উপভোগ করছ?' দাদীমা তার নাকের ডগাটা একটু গলাবার চেষ্টা করে।

'নো কমেন্ট!' আমি বললাম। এই কাজটা করে রাজনীতিকরা যখন তারা সাংবাদিকদের কঠিন প্রশ্নের জবাব দিতে চায় না।

বাবা-মা আর সাংবাদিকদের একটা জায়গায় মিল আছে আর তা হল নাকটা একটু বেশি দূর গলিয়ে দেয়া। রাজনীতিক আর বাচ্চাদের মধ্যে মিলটা হল, এদের

উত্তরের প্রতিই খুব স্পর্শকাতর প্রশ্নগুলো বর্ষণ করা হয়, যেগুলোর উত্তর দেয়া সহজ হয় না।

হয়তো সময় এসেছে এখন আমি আমার গল্পের চরিত্রদের সাথে একটু ভালো করে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই। আমার মাকে দিয়েই শুরু করা যাক, কারণ হাজার হলেও ওকেই তো আমি সবচেয়ে ভালো করে জানি।

মা আর চল্লিশে নামতে পারবে না, আর অন্ততপক্ষে তাকে বর্ণনা করা যায় একজন পরিপক্ব এবং স্বাধীনচেতা মহিলারূপে। সে তার মনের কথা খুলে বলতে কখনই ভয় পায় না। সে অবশ্যই মাতৃস্বরূপিনী, অবশ্য সে মিরিয়ামকে কী দৃষ্টিতে দেখে আমি সেটা ভাবতে চাই না। সে আমাকে একটু বেশিই লাই দিয়ে থাকে, আর মাঝে মাঝে এমন ভাবে কথা বলে যেন আমার প্রকৃত বয়সের চাইতে আমি তিন চার বছরের ছোট। এ নিয়ে আমি তেমন মাথা ঘামাই না, তবে মাঝে মাঝে বেশ কষ্ট হয়, যেমন স্কুল থেকে যদি আমার কোনো বন্ধুবান্ধবকে বাড়িতে নিয়ে আসি, ওদের দেখাতে চায় আমি তার অত্যন্ত আদুরে ছোট্ট ছেলে, আর এটা সে বেশ উপভোগ করে। যদিও আমি ওর চাইতে দুএক ইঞ্চি বেশি লম্বা। একদিন যখন মার্টিন নামে বন্ধুর সাথে আমার ঘরে বসে দাবা খেলছি, সে এসে আমার পাশে সোফায় বসে আমার চুল ব্রাশ করতে লেগে যায়। আমার যেটা ভাবনা তা হল এটা নেহাৎ দেখানোপনা। মায়ের সাথে খিটিমিটি আমার পছন্দ নয়, কিন্তু সেবার আমি যে শুধু বেয়ারাপনা করলাম তাই নয়, একেবারে ফেটে পড়লাম, তবে মার্টিনের উপস্থিতিটা আমাকে হিসাবে নিতে হল: ওকে দেখাতে চাইলাম আমি সব কিছুর সীমা টেনে দিতে সক্ষম। মা রান্নাঘরে পিছটান দিল, তবে মিনিট বিশেক পর গরম গরম চকোলেট ড্রিংক আর ক্রিসমাস কেক নিয়ে হাজির। মার্টিন সমর্থনসূচক সিটি বাজায় আর এবার আমার বিব্রত হওয়ার পালা, এতকিছু ঘটে যাওয়ার পরে আমাদের এমন আদর করে খাওয়াবে। মিনিট দুয়েক পরে আমি রান্নাঘরে গেলাম দেখার জন্য ফ্রিজে এক আধ বোতল বীয়ার পাওয়া যায় কিনা, আর ওখানে পাওয়া না গেলেও আমার জানা আছে ইয়োর্গেন কোথায় তার হুইস্কির বোতল রাখে। সৌভাগ্যবশত মার্টিনের একটু রসবোধ ছিল, আর কী ঘটেছিল সে নিয়ে পরে আমরা কথা বলেছিলাম। যখন আমি বললাম আমার মা ন্যাশনাল অ্যাকাডেমী অভ ফাইন আর্টসের একজন শিক্ষক, তখন মা'র প্রতি ওর শ্রদ্ধাবোধ একটু বেড়ে গিয়েছিল। যদি আরেকজন পিকাসোর আবির্ভাব হয়, তাহলে বলা সম্ভব হবে, সে কোথা থেকে বেরিয়ে এসেছে,' আমি বললাম। যা ঘটে গেল এর পর আমারই স্বার্থ ছিল তার ভাবমূর্তি কিছুটা পুনরুদ্ধার করা।

নিজের মায়ের বর্ণনা করা, অন্ততপক্ষে তার সদ্‌গুণ বা দোষ, এসব বিষয়ে, তখন ব্যাপারটা বেশ শক্ত। তবে কতগুলি বিষয় আছে যা মোটা দাগে সামনে এসে

দাঁড়ায়। মা খেতেন খাঁটি মধু, বিভিন্ন ধরনের খাঁটি মধু, বিভিন্ন দেশ থেকে সংগৃহীত মধু, ইদানীং সে একটা গোপন কক্ষে মধু রেখে ওখানে বসে খায়, কারণ সম্প্রতি আমি ও ইয়োর্গেন দুজনেই তার বদভ্যাসটা ধরে ফেলেছি। ইয়োর্গেন মনে করে মধু খেলে উচ্চরক্তচাপ হওয়ার সম্ভাবনা আছে, যদিও কথাটার মধ্যে অতিরঞ্জন আছে, ব্যাপারটা এতদূর গড়ালো যে সে আমাকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেয়, আমাকে সঙ্গে নিয়ে বাজার থেকে বাক্সভর্তি মধু কেনার কথাটা যেন আমি ইয়োর্গেনকে না বলি।

যদি দুটি শব্দে আমার মায়ের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে বলা হয়, তাহলে বলব "খোশমেজাজী।" কিন্তু তবু আমাকে বলতে হবে ওর চরিত্রের সবচেয়ে খারাপ দিক হল "বদ মেজাজ।" এই দুই চরম বৈপরীত্যের মাঝে আমি অবশ্য বেশি মাঝামাঝি পর্যায় আবিষ্কার করতে পারিনি। মাকে সচরাচর হাসিখুশী থাকতেই বেশি দেখা যায়, তবে হঠাৎ কখনো তাকে অত্যন্ত বিমর্ষ দেখায়। তাই মাকে কোনো না কোনো চরম মেজাজেই দেখা যায়। কখনই মাঝামাঝি পর্যায়ে নয়। মায়ের সবচেয়ে প্রিয় বক্তব্য হল, চল শুতে যাওয়ার আগে একহাত তাস খেলে নেয়া যাক।

তারপর ইয়োর্গেনের কথা। ও মাত্র পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি, উচ্চতায় মা'র সমানই। কাজেই একজন প্রাপ্তবয়সী পুরুষ হিসাবে ওকে তেমন বড়সড় বলা যায় না। অনেকের চোখে ওকে প্রতিবন্ধী মনে হতে পারে, আর তা যদি হয় তাহলে ওটাই ওর একমাত্র ত্রুটি নয়, কারণ ইয়োর্গেনের চামড়া ফ্যাকাশে। গ্রীষ্মকালেও বাদামীর আভাস দেখা যায় না, শুধু রোদে পুড়ে উজ্জ্বল লাল বর্ণ, আর লাল চুল, এমনকি হাতের লোমও লাল। ইতিমধ্যেই আমি উল্লেখ করেছি সে বেশ ফ্যাশান সচেতন, আর সেটার বাহুল্য কৃত্রিমতার পর্যায়ে চলে যায়। অধিকাংশ লোকের বাথরুমের শেলফে তিন রকমের ডিওডোর‍্যান্ট ও চার ব্রান্ডের আফটারশেভ লোশন থাকে না। আর খুব কম লোকই বাইরে বেরোবার সময় কালো সিল্কের স্কার্ফ ও উজ্জ্বল হলদে উটের লোমের জ্যাকেট পরে। কিন্তু ইয়োর্গেন তাই করে। আর সবচেয়ে খারাপ ব্যাপারটা হল, এগুলোতে ওকে বেশ মানায়।

এসব সত্ত্বেও ইয়োর্গেন গোয়েন্দা পুলিশ বিভাগ KRIPOS অর্থাৎ ন্যাশনাল ব্যুরো অভ ক্রাইম ইনভেস্টিগেশনে কাজ করে! সে হামেশাই আমাদেরকে শোনায় ওর কাজের মধ্যে গোপনীয়তার একটা ব্যাপার আছে। কিন্তু প্রায়ই মুখ বন্ধ করে থাকতে পারে না। অন্ততপক্ষে দুটো ক্ষেত্রে আমি দেখেছি গুরুত্বপূর্ণ কিছু অপরাধ তদন্তের বেলায় প্রেসে ছাপানোর আগেই ঘটনার বিষদ বিবরণ আমার জানা হয়ে গেছে। এতে বোঝা যায় সে আমাকে বিশ্বাস করে। এটা খুব ভালো গুণ। ইয়োর্গেন জানে গোপনীয় পুলিশ তদন্তের ব্যাপারে আমি আগেভাগেই ঢোল পিটে বেড়াব না।

ইয়োর্গেন সেই টাইপের লোক যে মনে করে সে অনেক কিছু জানে, কিন্তু তার ধারণা সব সময় ঠিক হয় না। কিছুদিন আগে আমরা ইকেয়ায় গিয়ে আমার রুমের জন্য একটা ওয়ারড্রোব কিনি (প্রায়ই অভিযোগ শোনা যেত আমার কাপড়চোপড়

নাকি সারা বাড়িতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকত। একটু অতিরঞ্জন হয়ে গেল, কারণ আমার এত বেশি কাপড়চোপড় ছিল না যে জাহাজের বোঝা হালকা করার জন্য কিছু কিছু ছাদের ওপর থেকে ছুঁড়ে ফেলতে হবে। আসল সত্য হল আমি ছাদের ওপর উঠতামই না)। ইকেয়া ওয়ারড্রোবটার খণ্ডাংশ একত্র করে দাঁড় করাতে সারাটা বিকাল কেটে গেল, আর এটাকে জায়গামতো সেট করতে সন্ধ্যা পার। ইয়োর্গেনের আইডিয়া ছিল ওয়ারড্রোবটা দরজার পেছনে দেয়াল ঘেঁষে খাড়া করে রাখা হবে, কিন্তু আমি পুরোপুরি দ্বিমত পোষণ করলাম। আমার মত হল ওটা জানালার পাশে রাখা হবে, যদিও এতে পোয়া ইঞ্চিখানেক জানালা ঢাকা পড়ছে। আমি বললাম এটা আমার রুম আর সেজন্য পোয়া ইঞ্চি দৃশ্য থেকে বঞ্চিত হলে আমি কিছু মনে করি না। ওকে স্মরণ করিয়ে দিলাম এখানে আমি ওর চাইতে বেশ কিছুটা বেশি সময় ধরে বাস করে আসছি। আর বেডরুমের দরজা খোলা অবস্থায় ওয়ারড্রোবের বেশ কিছুটা অংশ আয়ত্তের বাইরে থাকবে এটাকে আমি মোটেই বাস্তব সম্মত মনে করি না। কাজটা আমার মতো করেই হল। তবে পুরো একটা দিন সে আমার সাথে কথা বলে নি। আর কথা শুরু করার জন্য ওকে বেশ কষ্ট করতে হয়েছে বোঝা গেল। তবে ইয়োর্গেনের সবচেয়ে ভালো গুণটা হল অবসর সময়ের প্রায় সবটাই সে ব্যয় করত আমাকে এথলেটিক করে গড়ে তোলার কাজে। সবাই পেশি নিয়ে জন্মায় সে বলে, কিন্তু পেশিকে ব্যবহার করা চাই। তার সবচাইতে খারাপ যে স্বভাব তা হল আমি যে স্পোর্টসম্যান ছাড়া অন্য কিছু হতে চাই, সেটা সে মানতেই নারাজ। আমি যে *মুনলাইট সোনাটা* নিয়মিত অভ্যাস করছি, আমার মনে হয় না, ইয়োর্গেন সেটার তেমন মূল্য দেয়। সন্দেহজনকভাবে ইয়োর্গেনের প্রিয় বক্তব্য: 'কোনো কিছু যদি মূল্যবান থেকে থাকে তা হল মনোভাব।'

দাদীমা আর দাদু সম্বন্ধে কিছু বলার আগে জোর দিয়ে বলতে চাই ওদের আমি খুব ভালভাবে জানি, যতটা জানি ইয়োর্গেনকে, কারণ টনস্‌বার্গে আমি দীর্ঘদিন ওদের সাথে থেকেছি। আর এটা সেই সময়ে সবচেয়ে বেশি ঘটেছে যখন মা আর ইয়োর্গেন একসাথে চলাফেরা শুরু করেছে। সে সময় আমার বয়স দশ, আমার মনে হয় না মা আর ইয়োর্গেন প্রকৃত প্রেমিক প্রেমিকার মতো আচরণ করতে পারত যদি না তারা কিছুদিন বা কয়েক সপ্তাহ আমাকে দূরে সরিয়ে রাখতে না পারত। আমি ওদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আনতে যাচ্ছি না, বরং তার উল্টো। আমি সবসময় টনস্‌বার্গে যাওয়াটা উপভোগ করেছি। আমি বরং খুশি যে ওরা ওদের সম্পর্কের প্রাথমিক পর্যায়টা, যাকে বলে প্রণয় নিবেদন সেটা থেকে আমাকে আড়াল করে রেখেছে তা না হলে খাপ খাইয়ে নিতে অসুবিধা হত। একদিন যখন আমি উপরের তলায় ওদের শুভরাত্রি জানাতে গেলাম। দেখি ওরা দুজনে পালকের লেপের নিচে গলা পর্যন্ত ঢেকে শুয়ে আছে। এটা দেখে আমার ভালো লাগেনি, তাই নিঃশব্দে পেছন ফিরে নিচে চলে এসেছি। যদি ইয়োর্গেন আমার প্রকৃত বাবা হত তাহলে

হয়তো আমার প্রতিক্রিয়াটা ভিন্ন হতে পারত। বিষয়টা আমার খুব ঘৃণাব্যঞ্জক মনে হয়েছে তা নয়, তবে তারা তো শয়ন কক্ষের দরজাটা ভেজিয়ে রাখতে পারত। তারা বলতে পারত তারা ঘুমুতে যাচ্ছে। আর তখন নিজেকে অতটা নির্বোধ অনুভব করতে হত না। নিজেকে অতটা নিঃসঙ্গতও মনে হত না।

দাদীমা– আমার বাবার মা– শিগগিরই সত্তরে পা দিতে যাচ্ছে আর সারাজীবন সে ছিল সঙ্গীত শিক্ষক। সে সব ধরনের সঙ্গীত ভালবাসে, বিশেষ করে পাকসিনি। আমাকে *লা বোহেমির* মতো করে গড়ে তোলাকে দাদীমা মনে করে তার জীবনের সবচেয়ে বড় কাজ, তবে সত্যি বলতে কী আমার কাছে ইতালীয় অপেরা অতিমাত্রায় জলো মনে হয়, আর *লা বোহেমিও* তার ব্যতিক্রম নয়। এটুকু ছাড়া দাদীমা একজন মহান প্রকৃতি প্রেমিক, বিশেষ করে পাখীর প্রতি তার উদগ্র আগ্রহ। সামুদ্রিক খাদ্যের প্রতিও তার দারুণ আকর্ষণ আর শেলফিস দিয়ে ও বিশেষ এক ধরনের সালাদ আবিষ্কার করেছে, যার নামকরণ করা হয়েছে 'টনস্‌বার্গ সালাদ' (চিংড়ি, কাকড়া, মাংস আর মাছের বড়া)। প্রত্যেক শরতে সে আমাকে নিয়ে মাশরুম সংগ্রহে বের হয়। বেশ শক্ত মনের মহিলা। দাদীমা সব পাখপাখালীর নাম জানে, আর জানে ওরা কোথায় বাসা বানায়। খারাপ দিকও আছে: পাকসিনির একটা গানের কলি উচ্চকণ্ঠে না গাইলে ও রান্নাই করতে পারে না। আমি তার এই অভ্যাসটা কখনও ছাড়ানোর চেষ্টা করিনি, সত্যি বলতে কী, আমার সাহস হয়নি, কারণ দাদীমার রান্না দারুণ। ওর হামেশা উচ্চারিত বাক্য: 'এখানে বস গিয়র্গ, আমরা একটু গল্প করি।'

অবসর নেয়ার আগ পর্যন্ত দাদু একজন আবহতত্ত্ববিদ হিসাবে কাজ করত, আর এ বিষয়ে ওর আগ্রহে এখনও একটুও ভাটা পড়েনি, যেহেতু এখন সে নিয়মিত কেনে ভাদেনস্ গ্যাং, বিশেষ করে একজন সুদর্শনা আবহতাত্ত্বিকের আবহাওয়ার পূর্বাভাস পাঠ উপভোগ করার জন্য। সে সিগার পান করে, তবে তা শুধুমাত্র পার্টিতে, আমি যতবার টনস্‌বার্গে যাই, ওটাকে সে পার্টি বিবেচনা করে, আর প্রতিবারই আমরা যাই নৌবিহারে। সে ছিল অত্যন্ত হাসিখুশী রসিক ধরনের লোক, কিছুটা উচ্ছ্বাসপ্রবণ, আর মনের কথা খুলে বলতে সে কখনও দ্বিধা করে না। যদি সে মনে করে দাদীমার চুল বিশ্রী দেখাচ্ছে, তাহলে সে বলতে মোটেই ডরায় না। তবে ওর চুল সুন্দর দেখাচ্ছে একথা বলতেও দ্বিধা করে না। দাদু গ্রীষ্মকালের অর্ধেকটা কাটায় মোটরবোটে আর শীতকালটা কাটায় খবরের কাগজ পড়ে। মাঝে মাঝে সে স্থানীয় পত্রিকা টনস্‌বার্গ ব্ল্যাড এ আর্টিকেল লেখে এবং তাকে টনস্‌বার্গের খ্যাতিমানদের একজন ভাবা হয়। তার সবচেয়ে ভালো দিক দাদু সমুদ্রে দারুণ মজা পায়। দুর্বল দিক: মাঝে মাঝে সে নিজেকে টনস্‌বার্গের রাজা ভাবে। তার পছন্দের বাক্য: 'আমরা ধনীরা ভালোই আছি!'

চাচা আইনানের কথা ইতিপূর্বে কয়েকবার উল্লেখ করা হয়েছে। শুনতে হয়তো হাস্যকর মনে হবে, সে আমার সমবয়সী, এখন একটা মার্চেন্ট শীপের ফার্স্ট

অফিসার এবং অবিবাহিত, তবে গুজব আছে প্রত্যেক বন্দরেই ওর একজন করে গার্লফ্রেন্ড আছে। কিছু দিনের জন্য আমারও মনে হয়েছিল বিদেশে তার এক গার্লফ্রেন্ড আছে, অন্তত ইনগ্রীড নামে কেউ একজন ছয় মাস জাহাজে তার সহযাত্রী ছিল তার পর কোনো বন্দরে নেমে গেছে। বেশ কয়েকবার সে আমাকে প্রস্তাব দিয়েছে ওর জাহাজে চড়ে ভ্রমণ করার তবে আমি নিশ্চিত এটা কথার কথা, কারণ বাস্তবে তেমনটা ঘটেনি। তার শক্তিশালী দিক হল: সেই সম্ভবত নরওয়ের সবচেয়ে ঠাণ্ডা চাচা। আর দুর্বল দিক: কখনও তার প্রতিজ্ঞা ঠিক রাখে না। তার মজার কথা: তুমি এখনও সমুদ্রে গেলে না হে ছোকরা!

বাকী রইল আর একজন মাত্র, আর তার বর্ণনা দেয়াটাই সবচেয়ে কঠিন, আর সে হল গিয়র্গ রোয়েদ। আমি পাঁচ ফুট নয় ইঞ্চি, ইয়োর্গেনের চাইতে ইঞ্চি দুয়েক বেশি। আমার মনে হয় না এটা তার পছন্দ, তবে হয়তো সে এটার উর্ধে উঠতে চায় (!) মাঝে মাঝে যদিও তার মুখোমুখি হই, বেকায়দা কোনো মুহূর্তে যখন হয়তো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছি। শুনতে হাস্যকর মনে হবে, আমি সেই দলের মধ্যে যারা নিজের চেহারা নিয়ে মোটামুটি সন্তুষ্ট। আমি বলতে চাই না আমি সুদর্শন, তবে নেহায়েত কুৎসিতও নই। এই ক্ষেত্রে আমার একটু সাবধান হওয়া দরকার। কোনো এক জায়গায় পড়েছি, শতকরা বিশ জনেরও বেশি মহিলা মনে করে তারা দেশের তিন শতাংশ সুন্দরী মহিলার একজন, আর এই গণনাটা মোটেই বাড়িয়ে বলা হয়নি। আমি ঠিক বলতে পারব না শতকরা কতজন পুরুষ নিজেদেরকে তিন শতাংশ কুৎসিতের একজন মনে করে, তবে সারাজীবন নিজের চেহারা নিয়ে অসন্তুষ্ট থাকাটা ভীষণ কষ্টের ব্যাপার। আমি সরলভাবে বিশ্বাস করি ইয়োর্গেন তার লাল চুল আর পাঁচ ফুট ৭ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য নিয়ে নিজেকে অসুখী মনে করে না। এটা নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি, তবে সাহস করে কখনও জিজ্ঞেস করিনি।

আমার চেহারার যে বিষয়টা নিয়ে আমি প্রায়ই উদ্বেগের কাছাকাছি যাই তা হল কপালের কতকগুলি অস্বস্তিকর ব্রন। চার বা আট বছরের মধ্যে এগুলি মিলিয়ে যাবে এই ধারণাটা আমাকে তেমন সান্ত্বনা দিতে পারে না। ইয়োর্গেনের পরামর্শ তার সঙ্গে কিছুদিন নিয়মিত জগিং করলে এগুলো আর থাকবে না, তবে আমি ওর সাথে একমত হইনি। আমার মনে হয়েছে এটা ওর এক ধরনের নির্বোধের ধারণা।

আমার নীল চোখ বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া, সেই সাথে পেয়েছি আমার সুন্দর চুল এবং উজ্জ্বল ত্বক, গ্রীষ্মকালে যা বাদামী বর্ণ ধারণ করে। গিয়র্গ রোয়েদের সর্বোৎকৃষ্ট গুণ হল: সে পৃথিবীর সেই সম্প্রদায়ের একজন যারা বিশ্বাস করে আমরা আকাশগঙ্গা ছায়াপথের এক বিশিষ্ট গ্রহে বাস করি। সবচেয়ে খারাপ গুণ: মেয়েদের সাথে সহজ হতে পারে না। এই দিকটাতে কিছুটা ইতিবাচক হওয়াটাকে আমি আপত্তিকর মনে করি না। ওর সুবচন হল: 'হ্যাঁ, অবশ্যই, আমরা আর একটু ঘনিষ্ঠ হতে পারি।'

ছোটঘর থেকে বেরিয়ে আমি বীরদর্পে আমার রুমের দিকে এগিয়ে গেলাম। তবে এবার কেউ কিছু বলল না। স্পষ্টতই তারা পরস্পরে একমতে এসেছে কিছু না বলার ব্যাপারে। আমি দরজা খুলে রুমে ঢুকলাম, যে রুমটা ছিল আমার বাবার, তারপর তালা লাগিয়ে দিয়ে দেহটাকে বিছানায় ছুঁড়ে দিলাম। শিগগিরই আমি আবিষ্কার করলাম এই রহস্যময়ী কমলা সুন্দরীটি কে। আমার বাবা যদি পুনরায় তাকে দেখে থাকে তাহলে আমার ধারণা সত্য। সে নিশ্চয়ই বাবাকে সম্মোহিত করতে পেরেছিল। তার সম্বন্ধে আমাকে জানানোটা এত গুরুত্ববহ কেন, নিশ্চয়ই তার পেছনে একটা কারণ আছে। স্পষ্টতই এমন কিছু যা জানা আমার জন্য অত্যাবশ্যক, গুরুত্বপূর্ণ কিছু যা আমার বাবার পক্ষ থেকে মৃত্যুর পূর্বে তার পুত্রকে জানিয়ে যাওয়া জরুরী।

আমি এই অনুভূতি থেকে পুরোপুরি মুক্ত হতে পারিনি যে এই কমলা সুন্দরীর সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে হাব্‌ল স্পেস টেলিস্কোপের সম্পর্ক আছে, অন্তত পক্ষে মহাবিশ্ব অথবা মহাশূন্যের সাথে তো বটেই। বাবা কিছু অদ্ভুত কথা লিখে গেছে, এমন কিছু যা আমার এই ধারণাকে পোক্ত করে। আমি পাতা উল্টে পেছনে গেলাম... *সে আমার হাতে দৃঢ়ভাবে এবং মোলায়েম ভাবে চাপ দিল– ঠিক যেন আমরা ওজনহীনভাবে মহাশূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছি, ঠিক যেন আন্তছায়াপথের দুগ্ধ আকণ্ঠ পান করেছি এবং গোটা বিশ্বকে নিজের করে নিয়েছি।*

এমনকি হতে পারে যে কমলা সুন্দরী অন্য কোনো গ্রহ থেকে এসেছে? অন্ত তপক্ষে এটুকু ইঙ্গিত পাওয়া যায় সে আমাদের পরিচিত পৃথিবী থেকে ভিন্ন কোনো জগৎ থেকে এসেছে। হয়তো সে কোনো ইউএফওতে করে এসেছে? অবশ্যই তা হতে পারে না, আমি এসবে বিশ্বাস করি না, বাবাও নিশ্চয়ই করত না। হয়তো সে নিজেকে তা মনে করে থাকবে। সেটাও তেমন ভালো কথা নয়।

হাব্‌ল স্পেস টেলিস্কোপ ঘণ্টায় ২৮,০০০ কিলোমিটার বেগে একবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে সাতানব্বই মিনিট সময় নেয়। সে তুলনায় প্রথম বাষ্পীয় এঞ্জিনের ট্রেনের অসলো থেকে আইদভল পর্যন্ত আটাশ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে সময় লাগত আড়াই ঘণ্টা। কাজেই হাব্‌ল স্পেস টেলিস্কোপের গতিবেগ নরওয়ের প্রথম ট্রেনের গতিবেগের চাইতে হাজার গুণ বেশি (আমার শিক্ষক মনে করেন এই তুলনা একটা মনোজ্ঞ উদ্ভাবন।)

ঘণ্টায় ২৮,০০০ কিলেমিটার! এর অর্থ হল স্পেসশিপটা ওজনহীনভাবে শূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছে। হয়তো তুমি "আন্তছায়াপথ দুগ্ধ আকণ্ঠ পানের" কথাও বলতে পার, অন্তত যখন আকাশগঙ্গা থেকে কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূরের ছায়াপথের ছবি পাঠাচ্ছে।

হাব্‌ল স্পেস টেলিস্কোপের দুটি সোলার প্যানেল ডানা রয়েছে। এর প্রত্যেকটা বার মিটার লম্বা এবং আধা মিটার চওড়া এবং এরা স্যাটেলাইটে ৩০০০ ওয়াট

বিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহ করে। কিন্তু ক্যাথেড্রাল থেকে উড়ে আসা দুটি টার্টল ডাভ এর ডানায় বসতে পারবে না ইতিহাসের যাদুঘরে ঠাঁই নেয়ার আগে গোটা বিশ্বকে এর ডানায় করে তুলে আনতে পারবে না। তবে কে জানে হয়তো ওরা সপ্তম স্বর্গে গিয়ে ঠাঁই নেবে।

আমি কাগজের তাড়াটা হাতে নিয়ে আবার পড়তে শুরু করলাম।

ক্রিসমাস আর নববর্ষের মাঝের সময়টাতে আমি আর কমলা সুন্দরীর খোঁজাখুজি করলাম না। ক্রিসমাসের পবিত্রতাকে কিছুটা শ্রদ্ধা দেখানো উচিত। তবে জানুয়ারির মাঝামাঝির আগেই আবার আমার সন্ধান কাজে লেগে পড়লাম, এবার আমার প্রবল উৎসাহ।

ওর পাত্তা লাগানোর শতেক চেষ্টা করলাম, কিন্তু কোনোটাই সফল হল না, কাজেই আমার বলারও কিছু রইল না। আমি নিশ্চিত ইতিমধ্যে তুমি গল্পের ছন্দ আর যৌক্তিক প্রবাহমানতার কিছুটা আঁচ করতে পেরেছ।

তবে আপাতত একটা ব্যতিক্রম আনতে চাই, আর সেটা এ পর্যন্ত যে সব হেয়ালীর সমাধান তোমার কাছে প্রত্যাশা করেছি তাঁর একটা গুরত্বপর্ণ পয়েন্ট বাদ পড়ে গেছে। মনে আছে গিয়র্গ, সেই যে পুরনো লোমওয়ালা চামড়ার কোটের কথা বলেছিলাম। সেটার কী বৃত্তান্ত? আমি যে কল্পনায় গ্রীনল্যান্ড অভিযানের ইঙ্গিত দিয়েছিলাম তার মূলে ছিল ওটাই। প্রথম থেকেই ভেবে এসেছি কমলা সুন্দরী নিশ্চয়ই খুব দরিদ্র ঘরের। তবে সবার চাইতে ওর যে স্বভাবটা লক্ষণীয় তা হল বহির্মুখিতা।

সেবার শীতে আমি বেশ কয়েকবার স্কী করতে গেছি আর সম্ভবত এই কারণেই আমার সব তৎপরতা অসলোর আশেপাশে যে বনভূমি আছে, তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছি যাতে অন্তত কিছু দিনের জন্য সাংঘাতিক কোনো অসুস্থতাকে কাবু রাখতে পারি। এখানে আমি যা বলতে চাই তার মূল প্রতিপাদ্য আমার স্কী অভিযানের কাহিনী শোনানো নয়, কারণ ওকে আমি ওখানে দেখতে পাইনি, পাহাড়ের ঢালেও নয় বা কুটিরেও নয়। তবে মার্চের শুরুতে, হোমেনকোলেন সানডে এগিয়ে আসছে। ইতিমধ্যেই স্কী জাম্পিং প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়ার চিন্তাটা আমার মনের ওপর জেঁকে বসছে।

আবহাওয়া ভালো থাকলে, রোববারের ইভেন্ট ৫০,০০০ এর বেশি লোক জড়ো হয় হোমেনকোলেনে। ওদিন অসলোর বিপুলসংখ্যক লোক পাহাড়ে চড়ে। বলতে পার লোমওয়ালা চামড়ার পুরনো কোটপরা লোকের শতকরা হার কত হতে পারে? তুমি যদি আমাকে বিজ্ঞেস করো তাহলে বলব, শতকরা একশ ভাগ।

সেদিন রোববারে আমি হোমেনকোলেনে গেলাম। আবহাওয়া তেমন খারাপ ছিল না। আমি নিশ্চিত ছিলাম কমলা সুন্দরীর সাক্ষাৎ পাওয়ার সম্ভাবনা ৫০,০০০ এরও বেশি। আর আমি তোমাকে একটা কথা বলতে পারি: মার্চের সেই রোববার ওসলোর ছাদে লোমওয়ালা চামড়ার পুরনো কোট পরা লোকের সংখ্যা মোটেই কমতি ছিল না; প্রায় প্রত্যেকেই ছিল সেখানে। হোমেনকেলেনের রোববারকে বলা যায় রোদে রঙচটা লোমওয়ালা চামড়ার কোটের স্বর্গভূমি। আমি এমন কি উল্লম্ফনের দিকে একবার তাকিয়েও দেখলাম না। আমার নজর শুধু ঘোরাঘুরি করছিল লোকওয়ালা চামড়ার পুরনো কোটের দিকে। কমলা সুন্দরীকে আমি বেশ কয়েকবার দেখেছি। প্রতি বার আমার বুকের মধ্যে হোমেনকোলেনের গর্জন শুনেছি। তবে তার মধ্যে ওর কণ্ঠ ছিল না। বারদুয়েক সেই মোহনীয় হেয়ারক্লিপও দেখেছি কিন্তু মাথাটা ওর ছিল না।

সে ওখানে ছিল না, গিয়র্গ। ওটাই সত্যি, আর আমিও এটা বের করতে পেরেছি। কে জয়ী হল আমি সেটাও খেয়াল করিনি। কমলা সুন্দরী হারিয়ে গেছে, এটা ছাড়া সেদিন রোববারে আমি আর কিছুই লক্ষ্য করিনি। সেখানে কী নাই শুধু তার পরেই আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল।

তখন থেকে আমি শুধু আর একবার মাত্র হোমেনকোলেনে গেছি। আমি জানি না এটা তোমার মধ্যে কোনো প্রতিধ্বনি তুলবে কিনা। তোমার কি মনে রাখা সম্ভব যে তোমার সাড়ে তিন বছর বয়সের সময় আমরা দুজনে একসাথে কিছু একটা করেছিলাম?

সে বছর আমরা দুজনে নিচে দাঁড়িয়ে স্কী জাম্পারদের কলাকৌশল লক্ষ্য করছিলাম। সেবার মার্চের আবহাওয়া ছিল সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী। একটা মৃদুমন্দ বাতাস ভূভাগের ওপর দিয়ে মৃদু শ্বাস ফেলে প্রায় গ্রীষ্মের আবহ সৃষ্টি করছিল। সেই বিশাল স্কী জাম্পের ফলে তুষারপুঞ্জ দূরদূরান্তে ছিটকে পড়েছিল। সেবারে জঁ-ভাইজফ্লগ স্বর্ণবিজয়ী হয়েছিল। নরওয়েজীয় দর্শকদের জন্য এটা ছিল এক বড় আঘাত, তবে এটা তেমন উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারেনি, কারণ ভাইজফ্লগ গত বছরও স্বর্ণ জিতেছিল।

এবার আমি তোমার কাছে একটা গোপন তথ্য ফাঁস করব। এমন কি ছয় মাস আগে মার্চের সেই মনোরম দিনেও, হোমেনকোলেনের সেই উন্মাতাল অবস্থার মধ্যেও আমার দৃষ্টি বারবার খুঁজে ফিরেছে কমলা সুন্দরীকে। এক দশক গত হওয়ার পরেও সেই হতাশা আমার ওপর জেঁকে বসে আছে।

আমি আর বেশি সময় পাইনি, গিয়র্গ। তবে সেটাই একমাত্র কারণ নয় যার জন্য আমি কয়েক সপ্তাহ আগে চলে গিয়েছি। সেখানে পৌঁছার আগে আমার তেমন কিছু বলার নেই।

হঠাৎ এপ্রিলের শেষ দিকে আমাদের পোস্টবক্সে একটা পোস্টকার্ড পেয়ে গেলাম। দিনটা ছিল শনিবার এবং আমি হামলেভেইয়েনে আমার মা-বাবার সাথে দেখা করতে গিয়েছি। আমি তখন এডামস্টুয়েনে গুনারের সাথে কয়েকমাস ধরে বাস করেছি, আর কার্ডটা আমাকে সেখানে পাঠানো হয়নি, তবু ওটা আমারই ছিল।

আচ্ছা তাহলে শোনই কথাটা: কার্ডের ওপরের পৃষ্ঠায় সুন্দর একটা কমলাকুঞ্জের ছবি আর তাতে PATIODE LOS NARANJOS কথাগুলো ঝকঝকে অক্ষরে ছাপানো। আমি স্প্যানিশ ভাষা যতটা বুঝি তাতে এর অর্থ *কমলা প্রাঙ্গণ* এই ধরনের কিছু। আমি আগেই বলেছি কোনো কিছুর অর্থ বের করার ব্যাপারে আমি বেশ দড়।

কমলা প্রাঙ্গণ! বুকের মধ্যে আমার হৃৎপিণ্ড ধড়াস ধড়াস করতে থাকে। একটা ব্যাপার আছে যাকে বলে ব্লাডপ্রেশার, গিয়র্গ, চরম অবস্থায় সেই অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। তবে মহান অভিজ্ঞতা বা গভীর ধারণা থেকে কেউ পিছপা হয় না। এটা আসলে এক নির্দোষ প্রতিক্রিয়া (তা সত্ত্বেও আমি কিন্তু তোমাকে গ্লাইডিং বা প্যারাসুটিং এর পরামর্শ দেব না।)

কার্ডটা উল্টে দেখলাম তাতে সেভিলের ছাপ মারা আর একমাত্র যে কথাটা লেখা তা হল: *আমি তোমার কথাই ভাবছি, তুমি কি আর একটু অপেক্ষা করতে পার?*

এর বেশি আর কিছু নেই, না আছে প্রেরকের নাম, না ঠিকানা। তবে কার্ডের ওপরে একটা মুখের ছবি আঁকা। এটা তারই মুখ, গিয়র্গ, সেই কাঠবিড়ালীর মুখ। দেখে মনে হয় কোনো শিল্পীর আঁকা, আর সে শিল্পীও নেহাৎ কাঁচা নয়।

আমি অবশ্য তেমন অবাক হইনি। স্বাভাবিবকভাবেই কমলা সুন্দরী কমলার প্রাঙ্গণেই থাকবে, আর কোথায় বা থাকতে পারে? সে নিশ্চয়ই ফিরে গেছে তার রানীর সাম্রাজ্যে, কমলার দেশে। এটা আমার পূর্বানুমানের সাথে পুরোপুরি খাপ খায়। যিশু খৃস্ট কি তার পিত্রালয়রূপী মন্দিরে ফিরে যায়নি?

কোনো কিছুই আর দুর্বোধ্য রইল না। সব ধাঁধার উত্তর মিলে গেল। গোপন রহস্য আলোয় এসে গেল। সেখানে তার আপন ভূবনে যাতে ছয় মাস ধরে বুক ভরে শ্বাস নিতে পারে, আর মনের মতো করে বিচিত্র ধরনের কমলার বাগান শৈল্পিক আবেগে সাজাতে পারে। তারপর আশায় বুক বেঁধে তার স্বর্গরাজ্য থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে মাটির পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারে যাতে ছয় মাস ধরে প্রতিদিন একবার করে আমার সাথে দেখা করতে পারে। তারপর হয়তো আবার নিজেকে উজ্জীবিত করার জন্য তার আপন ভুবনে ফিরে যাবে, তবে সেটা পরের কথা।

আমি আহ্লাদে আটখানা, আমার মস্তিষ্কে অতিমাত্রায় একটা রসায়ন ক্ষরণ হতে থাকে ডাক্তাররা বলে এন্ডরফিন। এই রসায়নজাত অতিউল্লাসের একটা নামও আছে, আমরা এ ধরনের রোগীকে বলি ইউফোরিক। আমি নিজেকে এই অবস্থার মধ্যে আবিষ্কার করলাম, ফল হল এই যে আমি মা-বাবার কাছে ছুটে গেলাম। ওরা দুজনেই বসে ছিল কনজারভেটরিতে, মা বসেছিল সবুজ রকিং চেয়ারে আর বাবা তার পুরনো শেইজ লাউঞ্জে শনিবারের খবরের কাগজের পেছনে ডুবে ছিল, আমি হুড়মুড় করে ঢুকে পড়েই ঘোষণা করলাম আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি। ঠিক ওই কথাটাই বলেছিলাম, ব্যাখ্যা করে বোঝালাম আমার বিয়ে করার ইচ্ছে হয়েছে। কথাটা আমার ওভাবে বলা ঠিক হয় নাই, কারণ মিনিট পনেরর মধ্যেই প্রতিক্রিয়াটা জানা গেল। আমার মস্তিষ্ক এন্ডরফিন ক্ষরণ পুরোপুরি বন্ধ করে দিল, আমি আর ইউফোরিক রইলাম না। আমার মাথা আর কাজ করছে না। এত কম বোধশক্তি জীবনে আর কোনোদিন অনুভব করিনি।

কমলা সুন্দরী ইতিমধ্যেই আমার নামের আদ্যাংশ জেনে গেছে। আর এখন মনে হচ্ছে সে আমার ডাকনামও জানে। তার চাইতেও বড় কথা, গিয়র্গ, অরেঞ্জল্যান্ডে থেকে সে আমার হামলেভেইয়েনের বাড়ির ঠিকানাও নোট করেছে। তাতে কী আসে যায়? এটা খুবই চমৎকার ব্যাপার, ভাবতে বেশ ভালো লাগে, রহস্যটার কুলকিনারা করতে না পারলেও। কিন্তু এর মধ্যে কি একটা তিক্ত প্যাঁচ রয়ে যায়নি? সেই যাদুকরী মুহূর্তগুলিতে যখন আমরা হাত ধরাধরি করে একসাথে প্যালেস পার্কে ঘুরে বেড়িয়েছি, তারপর ক্রিসমাসের ঘণ্টাধ্বনি শুরুর মুহূর্তে কিছু না বলে সিভারেলা তার গাড়িতে উঠে বসল আর মুহূর্তের মধ্যে ওটা কুমড়াতে পরিণত হয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে স্পেনের পথে অদৃশ্য হয়ে গেল?

সে ঘটনার পরে সাড়ে তিন মাস পার হয়ে গেছে, আর কমপক্ষে পঁচিশটা স্কী প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে।

কমলা সুন্দরী তো মরক্কো, ক্যালিফোর্নিয়া অথবা ব্রাজিলেও চলে যেতে পারে? এখন কমলা সুন্দরী এক বৈশ্বিক প্রপঞ্চ গিয়র্গ, আমার ব্যাপারে বলতে গেলে সে বহুদিন পূর্বের প্রকৃতির এক অনন্য ফল, হয়তো কমলা সুন্দরী জাতিসংঘের কমলা পর্যবেক্ষণ বাহিনীর (UNIO) একজন গোপন সদস্য। কমলার কোনো ভয়ংকর নতুন ধরনের রোগ দেখা দিয়েছে কি? সেজন্যই কি সে প্রায়শই ইয়ংস্টর্গেট মার্কেটে কমলা পরীক্ষা করতে যায়? সেজন্য কি সে সাপ্তাহিক র‍্যান্ডম স্যাম্পল সংগ্রহ করে বেড়ায়?

হয়তো সে এখন চীনের পথে রওনা দিয়েছে। অনেকদিন আগেই আমি জানতে পেরেছি কমলার উৎপত্তি চীনে। কিন্তু যদি সে চীনের পথে যাত্রা করে থাকে, যে দেশে প্রথম কমলার ফুল প্রস্ফুটিত হয়েছিল, আমি এখন পর্যন্ত *কমলা*

সুন্দরী. চীন এ ধরনের লেখা কোনো পোস্টকার্ড লিখতে পারিনি। আর চীনের উদ্দেশ্যে এ ধরনের কোনো পত্র পাঠালে ১০০ কোটি জনসংখ্যার দেশে চীনের ডাকপিয়ন ওকে খুঁজে বের করতে পারবে কিনা এ ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আমি হলে হয়তো সম্ভব হত কিন্তু চীনের ডাক পিয়ন এতটা করিৎকর্মা কিনা, সে ব্যাপারে কোনো গ্যারান্টি দিতে পারি না।

ভালো কথা গিয়র্গ, আমরা অবশ্যই এগিয়ে যাব।

কিছু দিনের জন্য আমার লেখাপড়া থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখলাম। বাবা-মার কাছ থেকে এক হাজার ক্রোনার ধার নিলাম এবং মাদ্রিদের একটা সস্তা শ্রেণীর প্লেন টিকেট কিনে ফেললাম। সেখানে গিয়ে রাতের মতো আশ্রয় নিলাম আমার পুরনো এক সহপাঠীর চাচার বাসায়। পরদিন আমি উড়াল দিলাম সেভিলের পথে।

অবশ্য তাকে খুঁজে পাবই এমন ভরসা ছিল না, যদিও সম্ভাবনাটা হোমেন কোলেনের প্রায় বরাবর। তবে অন্য একটা বিষয়ও ছিল, যদিও সেভিলে তার সাথে মুখোমুখি দেখা নাও হয়, তবু এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত অতি সম্প্রতি সে সেভিলে ছিল তারপর ধরে নেয়া যাক সে মরক্কো চলে গিয়েছে। অন্ততপক্ষে আমার অরেঞ্জ ল্যান্ডে পা রাখা তো হল, আর যে কমলার ঝাঁঝালো বাতাসে সে শ্বাস নিয়েছে, সেই বাতাসের অংশীদার তো হওয়া গেল। ও যে পথে পা ফেলে চলে হেঁটে বেড়িয়েছে আমি সেই পথে চলতে চাই, হয়তো যে বেঞ্চে সে বসেছিল, আমিও সে বেঞ্চে বসতে পারি। এখানে ঘুরে বেড়ানোর সেটাও যথেষ্ট কারণ গণ্য করা যেতে পারে। এটা চিন্তা করাও অমূলক হবে না যে হয়তো তাকে খুঁজে বের করার কোনো সূত্র পেয়ে যেতে পারি, যেটা সে পেছনে ফেলে গেছে হয়তো সেটা কমলা প্রাঙ্গণও হতে পারে, যদি সেখানে প্রবেশ করতে পারি। কল্পনা করলাম সেটা পরিখাবেষ্টিত হতে পারে, ভয়াল দর্শন কুকুর থাকতে পারে, থাকতে পারে পাহারাদার। এমন পবিত্র স্থানে এগুলো থাকাই স্বাভাবিক।

তবে সেভিলে অবতরণের আধঘণ্টার মধ্যেই আমি সোজা গিয়ে ঢুকে পড়লাম কমল প্রাঙ্গণে। এটা ছিল মনোরম প্রশান্ত এক ক্যাথেড্রাল প্রাঙ্গণে, আর প্রাচীরবেষ্টিত এক কমলাকুঞ্জ, সাধারণ বাগানের মতোই। পাকা কমলার ভারে নুয়ে পড়া সারি সারি কমলার গাছ।

কিন্তু সেখানে ছিল না কমলা সুন্দরী। হয়তো একটু আগেই সে শহরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গেছে। শীঘ্রই ফিরে আসবে...

আমি সরল রেখায় চিন্তা শুরু করলাম। নিজেকে বোঝালাম কমলা সুন্দরীর সাক্ষাৎ পাওয়াটা খুব সহজ হবে না, হয়তো প্রথম কয়েকদিনে সেটা নাও হতে

পারে। কাজেই আমি অরেঞ্জ প্রাঙ্গণে ঘণ্টা তিনেকের বেশি রইলাম না। তবে চলে যাওয়ার আগে একটা নোট লিখে রেখে এলাম। আর নিরাপত্তার খাতিরে কুঞ্জের মাঝখানে একটা পুরনো ঝরনার পাশে নোটটা রেখে এলাম। লিখলাম, *তোমার কথা আমিও ভাবছি, না, আমি আর অপেক্ষা করতে চাই না*। নোটটার ওপর একটা নুড়ি চাপা দিয়ে রাখলাম।

আমার নাম সই করলাম না, এমনকি নোটটা কার বরাবরে তাও লিখলাম না, তবে ম্যাচের কাঠি দিয়ে আমার মুখের একটা আদল একে দিলাম। মুখটার কোনো সামঞ্জস্যই রইল না আমার মুখের সাথে, তবে, নোট পড়ে ও নিশ্চয়ই বুঝবে, ওটা কার লেখা, কাকে লেখা। ওর ফিরে আসতে নিশ্চয়ই খুব দেরী হবে না। তাকে লেখা নোটটা নিশ্চয়ই ওর চোখে পড়বে।

ঘণ্টাখানেকেরও কম সময়ের মধ্যে আমি আবার শহরে ফিরে গেলাম। মনের মধ্যে খচ খচ করে বিঁধতে লাগল, আমি বোধহয় কোনো ভুল কাজ করলাম।

ও বলেছিল: *তোমাকে অবশ্যই ছয় মাস অপেক্ষা করতে হবে। যদি ততদিন অপেক্ষা করা তোমার পক্ষে সম্ভব হয়, তাহলে আবার আমাদের দেখা হবে।*

তুমি কি বুঝতে পারছ গিয়র্গ? আমি কিন্তু ওয়াদা রক্ষা করিনি। ওর জন্য ছয় মাস অপেক্ষা করার ধৈর্য্য আমার ছিল না। কাজেই পরবর্তী প্রতিদিন আমাদের দেখা হবে বলে ওর দেয়া কথা রক্ষিত হবে, তেমন আশাও আমি আর করতে পারি না।

সে অমোঘ চুক্তিতে আমরা আবদ্ধ হয়েছিলাম, তাতে এমন দুর্বোধ্য কোনো শর্ত ছিল না, শুধু পালন করাটাই একটু কঠিন ছিল। তবে প্রত্যেক রূপকথার গল্পের মধ্যেই কিছু নিয়ম কানুন থাকে, আর এই নিয়মের মাধ্যমেই একটা কাহিনী থেকে আর একটা কাহিনীর পার্থক্য সূচিত হয়। এসব নিয়মে বোঝার মতো কিছু নেই, শুধু এগুলি আবশ্যিকভাবে পালিত হতে হয়। যদি তা করা না হয় তাহলে প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হয় না!

তুমি কি বুঝতে পারছ, গিয়র্গ? কেন সিন্ডারেলাকে মধ্যরাত্রির পূর্বেই বল পার্টি থেকে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল? আমি কোনো সূত্র খুঁজে পাইনি, এবং আমি নিশ্চিত সিন্ডারেলাও পায়নি। তবে যাদুর কাঠির স্পর্শে যখনই কেউ বিস্ময়কর স্বপ্নের রাজ্যে প্রবেশ করে তখন তার আর কোনো প্রশ্ন করার অধিকার থাকে না। যতই দুর্বোধ্য মনে হোক না কেন বিনা বাক্যব্যয়ে তা অবশ্যই পালন করে যেতে হবে। যদি সিন্ডারেলার রাজকুমারকে পেতেই হয়, তাহলে অবশ্যই তাকে মধ্যরাতের পূর্বেই বল পার্টি থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে। আমার ব্যাপারটাও ছিল তেমনি সরল আর সহজবোধ্য। সে যদি নিয়ম ভঙ্গ করে তাহলে তার শরীর থেকে বল গাউন উধাও হয়ে যাবে আর তার

ঘোড়াও পরিণত হবে একটা কুমড়ায়। কাজেই তাকে উৎকর্ণ থাকতে হয় যেন বারটার ঘণ্টা বাজার আগেই সে হলঘর থেকে বেরিয়ে আসতে পারে ঠিক ঠিক সে তা করতে পারে– রাস্তায় শুধু ওর স্যান্ডেলটা ফেলে যায়। তাজ্জব ব্যাপার, এই স্যান্ডেলের নিশানা ধরেই শেষ পর্যন্ত রাজকুমার তাকে খুঁজে বের করে। কুৎসিত দুই বোন নিয়ম ভঙ্গ করায় ওদের শাস্তি পেতে হয়।

রূপকথার গল্পে আরো কিছু নিয়ম কানুন আছে। যদি আমি ব্যাগ বোঝাই কমলা সমেত কমলা সুন্দরীকে তিনবার ধরতে পারি তাহলে সে আমার হয়ে যাবে। তবে ক্রিসমাস ঈভের দিনও অন্তত এক নজর ওর দেখা পেতে হবে, তাছাড়াও ঘণ্টা বাজিয়ে ক্রিসমাসকে যখন আবাহন করা হবে, সেই মুহূর্তে তার চুলের রূপালী ক্লিপ আমাকে স্পর্শ করতে হবে। এরপর বাকী রইল আর একটামাত্র অগ্নিপরীক্ষা: ছয় মাস ধরে ওকে অদর্শনের জ্বালা আমাকে সইতে হবে। কেন একথা জিজ্ঞেস করবে না গিয়র্গ, তবে ওগুলিই নিয়ম, চূড়ান্ত পরীক্ষাটাতে আমি যদি উতরাতে না পারি– কমলা সুন্দরীর কাছ থেকে ছয় মাসের জন্য নিজকে সরিয়ে রাখা, তাহলে আমার আগের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যাবে, সবকিছু হাতছাড়া হয়ে যাবে।

আমি ছুটতে ছুটতে কমলা কুঞ্জে ফিরে এলাম। তবে নোটটা ওখানে নেই, আর আমি নিশ্চিত হতে পারলাম না সে-ই ওটা নিয়েছে কিনা, হয়তো কোনো নরওয়েজীয় পর্যটক ওটা কুড়িয়ে নিয়ে থাকবে।

যে নুড়িটা দিয়ে কাগজটা চাপা দিয়ে রেখেছিলাম, সেটার ওপর চোখ পড়তেই আমার মনে এক নতুন চিন্তার উদয় হল। এটা এমন কিছু যাতে আমার মনে নতুন আশা ঝলক দিয়ে গেল, যদিও আমি নিয়ম পালন করিনি, বুঝলে গিয়র্গ, কমলা সুন্দরীই প্রথম আমাকে লিখেছিল, কারণ সে আমার ঠিকানা জানত। তারপর আমি যেটা লিখলাম সেটা তার উত্তর, তবে যেহেতু আমি তার ঠিকানা জানতাম না কাজেই ক্যুরিয়ার পদ্ধতিতে নিজেকেই ওটা কমলা কুঞ্জে পৌঁছে দিতে হল, যেখান থেকে আমার নামে সম্ভাষণপত্র পাঠানো হয়েছিল।

আমরা কি দুজনেই সমান দোষে দুষ্ট নই? সেও কি কিছু নিয়ম ভঙ্গ করেনি? তুমি কী মনে কর, গিয়র্গ? আমি যেমন রূপকথার নিয়মকানুনের ব্যাখ্যা দিতে পারি তুমিও তা পার।

তবে অন্যদিকে সে আমাকে *একটু বেশি সময় অপেক্ষা করতে বলেছে*। সে শুধু আমাদের চুক্তিটারই নবায়ন করেছে। আমি জবাব দিয়েছি আমি শর্তটা মানতে পারছি না, অতএব নিয়ম পালন করারও প্রয়োজন পড়ছে না।

সে লিখেছে *আমি তোমার কথাই ভাবছি, তুমি কি আর একটু অপেক্ষা করতে পার?*

কিন্তু গিয়র্গ, ঐ প্রশ্নের উত্তর যদি হয় আমি পারছি না, তাহলে সে আমাকে কী করতে বলতে পারে?

এ ব্যাপারে বিচার বিশ্লেষণ করার মতো মানসিকতা আমার নেই, কারণ আমি বেশি ব্যক্তিগতভাবে জড়িয়ে গেছি। একমাত্র যেটা করতে পারি, তাহল ওকে খুঁজে বের করার চেষ্টা চালানো।

আগে কখনও সেভিল্ল যাইনি, এমনকি স্পেনেও যাইনি। কিন্তু দেখলাম পর্যটকদের স্রোত বেয়ে চলেছে শহরের ইহুদি বসতি অঞ্চলের দিকে। আমিও ওদের অনুসরণ করে এগিয়ে চললাম। এটার নাম সান্তাক্রুজ, এবং ঐতিহ্যবাহী উদ্ভিদ কমলাকে উৎসর্গ করা এক বিশাল মন্দির। সর্বত্রই বিশাল প্লাজা আর মার্কেট ঘিরে রয়েছে অসংখ্য কমলার গাছ।

প্লাজার পর প্লাজা ঘুরে কমলা সুন্দরীর সন্ধান না পেয়ে অবশেষে একটা কাফেতে গিয়ে বসলাম, সেখানে সতেজ কমলা গাছের নিচে একটা খালি চেয়ার পেয়ে বসে পড়লাম। আমি সান্তাক্রুজের সবগুলি প্লাজাই পরিদর্শন করেছি, তবে এটাকেই সবচেয়ে সুন্দর মনে হল। এটার নাম প্লাজা দ্যলা আলিয়াঞ্জা।

বসে বসে একটা সমস্যা নিয়ে এলোমেলো ভাবতে থাকি। তুমি যদি একটা বড় শহরে কাউকে খুঁজে বের করতে চাও, তাহলে তোমার কি সারা শহরময় তাকে খুঁজে বেড়ানো উচিত না একটা নির্দিষ্ট জায়গায় বসে বসে অপেক্ষা করা উচিত, যতক্ষণ না কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিটি সেখানে এসে হাজির হয়?

তোমার মতামত স্থির করার পূর্বে তুমি বাক্যটা দুবার পড়, গিয়র্গ, আমি সিদ্ধান্তে পৌছলাম সান্তাক্রুজই সেভিলের সর্বোত্তম এলাকা, আর প্লাজা দ্যলা আলিয়াঞ্জা হল শ্রেষ্ঠ স্কোয়ার। আমার সাথে কমলা সুন্দরীর যদি সামান্যতম মিলও থাকে তাহলে একবার না একবার সে এখানে আসবেই। আমরা একবার অসলোর এক কাফেতে মিলিত হয়েছিলাম। আর একবার দেখা হয়েছিল ক্যাথেড্রালে। কমলা সুন্দরী আর আমার মধ্যে যদি ভালো কিছু থেকে থাকে তাহলে একবার না একবার আমরা দৈবক্রমে মুখোমুখি হবই।

যেখানে বসে আছি, ওখানেই বসে থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম। এখন সাড়ে তিনটে বাজে, কাজেই আর আটঘণ্টা আমি প্লাজা দ্য লা আলিঞ্জায় বসে থাকতে পারি। আমার মনে হয় না অতক্ষণ আমাকে অপেক্ষা করতে হবে। অসলো ছাড়ার আগেই আমি এখানে কাছাকাছি একটা ছোট হোটেলে রুম বুক করেছিলাম, ওরা বলেছিল মাঝরাতের আগেই হোটেলে ফিরতে হবে, কারণ ঐ সময়ে তারা গেট বন্ধ করে, (এমনকি স্প্যানিশ গেস্টহাউসেরও নিয়ম কানুন আছে যা পালন করতে হবে।) সেদিন যদি কমলা সুন্দরী রাত দশ বারটার মধ্যে

হাজির না হয়, তাহলে আমি স্থির করলাম পরদিন আবার একই জায়গায় ওর জন্য অপেক্ষা করব, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বসে থাকতে রাজি।

আমার অপেক্ষার প্রহর দীর্ঘায়িত হচ্ছে, স্কোয়ারে যারা আসছে, স্থানীয়ই হোক আর পর্যটকই হোক, সবার ওপর নজর রাখছি। আমি অভিভূত হয়ে গেলাম, পৃথিবীতে এত সুন্দর জায়গাও থাকে! চারপাশের সবকিছুর প্রতিই আমার এক তুরীয় আনন্দানুভূতি মিশে যেতে থাকে। যারা এখানে রয়েছি, তারা কারা? এই প্লাজায় প্রত্যেকটি মানুষেরই নিজস্ব চিন্তা ও স্মৃতি, স্বপ্ন ও বাসনা রয়েছে। আমি রয়েছি আমার ক্ষুদ্র জীবন নিয়ে মগ্ন, তবে এই কথাটা এখানকার সব মানুষ সম্বন্ধেই খাটে। মনে করা যাক ওয়েটার, যে মগ্ন তার গ্রাহকদের সেবাদানে, চতুর্থ বার কফির অর্ডার দেওয়ার পর সে নিশ্চয়ই ভাবছে আমি বেশিক্ষণ ধরে আমার জায়গা দখল করে রয়েছি, এখানে এসে বসার তিন ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। চতুর্থ কাপ শেষ হওয়ার পর সে তড়িঘড়ি করে এসে বলল, আমি মূল্য পরিশোধের কষ্ট স্বীকার করব কিনা, কিন্তু আমি যেতে পারি না, আমি অপেক্ষা করছি কমলা সুন্দরীর। তাই একটা বড়সড় পিজা আর কোকের অর্ডার দিলাম। কমলা সুন্দরী না আশা পর্যন্ত বিয়ার বা অন্য কোনো কড়া পানীয় চলবে না, সে এলে পরে শ্যাম্পেনের অর্ডার দেয়া যাবে। তবে কমলা সুন্দরীর আবির্ভাব ঘটল না। ঘড়িতে সাতটা বাজে। কাজেই বিলের কথা জিজ্ঞেস করার তাগিদ বোধ করলাম। হঠাৎ অনুভব করলাম, নিজেকে কত নিচে নামিয়েছি। হামলেভেইয়েনের মেলবক্সে পোস্টকার্ডটা পাওয়ার কতদিন হয়ে গেল। ওটা ওখানে পৌঁছতেও নিশ্চয়ই অনেকগুলো দিন পার হয়ে গেছে।

কমলা সুন্দরী আগের মতোই ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেল। নিশ্চয়ই আমার সাথে লুকোচুরি খেলার চাইতে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়ে গেছে ওর। হয়তো সে সালামাঙ্কা বা মাদ্রিদে স্প্যানিশ ভাষা শিখছে। কাফের পাওনা পরিশোধ করে উঠতে যাচ্ছি, আমার ত্রুটিপূর্ণ বিচার বুদ্ধির উপর আমি বিরক্ত, গলার মধ্যে একটা শক্ত পিণ্ড অনুভব করলাম, পরদিন সকালেই নরওয়েতে নিজের বাড়িতে ফিরে যাব বলে স্থির করলাম।

আমি জানি না, পরিপূর্ণ নিরর্থক কোনো কাজ করার পর অনুভূতিটা কেমন হয়, সে সম্বন্ধে তোমার ধারণা আছে কিনা। ভীষণ খারাপ আবহাওয়ায় হয়তো প্রয়োজনীয় কিছু কেনার জন্য শহরের উদ্দেশে বেরিয়েছ, আর দোকানে পৌঁছে দেখলে মাত্র দু'মিনিট আগে দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। এরকম পরিস্থিতিতে ভীষণ রাগ হয় এবং নিজের বোকামীর জন্য বিরক্তি আসে। এমনই ব্যর্থ অভিযাত্রার বিড়ম্বনা আমাকে গ্রাস করে ফেলেছে। শহরে ফেরার কোনো বাসও ধরতে পারলাম না। সেভিলে এসেছি একমাত্র একটা ছবির পোস্টকার্ডের ওপর ভরসা করে। এখানে আমার কোনো চেনাশোনা লোক নেই। সবে একটা নোংরা

গেস্টহাউসের কামরা ভাড়া নিতে যাচ্ছি, আর স্প্যানিশ ভাষার একটা শব্দও উচ্চারণ করতে পারি না। আমি যেন কানে একটা চিমটি অনুভব করলাম, ব্যাপারটা এমন আহাম্মকী হয়ে গেছে যে নিজের কাছেই নিজেকে লজ্জিত মনে হয়, কাজেই আমি প্রতিজ্ঞা করলাম গিয়র্গ, আমি অন্য একভাবে নিজেকে শাস্তি দেব। একটা উপায় হল জীবনে যাই ঘটুক না কেন, কমলা সুন্দরীর সাথে আমার কোনো সম্পর্ক থাকবে না।

এবং তারপর সে এল গিয়র্গ। তখন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা বাজে, আর হঠাৎ করে সে এসে হাজির হল প্লাজা দ্য লা আলিয়াঞ্জায়!

কমলা গাছের নিচে সাড়ে চার ঘণ্টা বসে থাকার পর সে প্রজাপতির মতো পত-পত করতে করতে উড়ে এল অরেঞ্জ প্লাজায়। অবশ্য ওর পরনে সেই পুরনো লোমওয়ালা চামড়ার কোট নেই– আন্দালুসিয়া উপক্রান্তীয় অঞ্চলের দেশ। সে পরেছিল ছোট্ট পরীর দেশের সামার ফ্রক, লাল বোগেনভিলিয়ার মতো জ্বলছিল, যে ফুল উঁচু দেয়াল ঢেকে দিয়ে এতক্ষণ আমার প্রশংসা কুড়িয়েছে। আমি ভাবলাম হয়তো সে ওটা ঘুমন্ত রাজকন্যা অথবা কোনো পরী রানীর গা থেকে তুলে নিয়ে এসেছে।

সে আমাকে লক্ষ্য করে নাই। অন্ধকারের কোলে ঢেকে যেতে শুরু করেছে প্লাজা। আবহাওয়া বেশ গরম, তা সত্ত্বেও আমার মধ্যে একটা শৈত্যপ্রবাহ বয়ে গেল। আমি কাঁপতে লাগলাম।

তবে গিয়র্গ, আমি তোমার কাছ থেকে কিছুই লুকবো না– আমি বুঝতে পারলাম সে স্কোয়ারে এসেছে পঁচিশ বছর বয়সী এক যুবককে সঙ্গে করে। সে ছিল দীর্ঘদেহী সুদর্শন আর খেলোয়ারদের মতো সুন্দর দাড়িমুখে। ওর চেহারাটাও ছিল মেরু অভিযাত্রীর মতো। আমাকে যেটা সবচেয়ে বেশি দুঃশ্চিন্তায় ফেলে দিল, তা হল ওকে মোটেই সহানুভূতিহীন মনে হচ্ছিল না।

কাজেই আমার সব শেষ। তবে ভুলটা আমারই। আমি নিয়ম মেনে চলিনি। একটা পবিত্র ওয়াদা ভঙ্গ করেছি। এমন একজনের সাথে নিজেকে জড়িয়েছি, আমার সাথে যার কোনো সম্পর্ক নেই, আমি তো আর রূপকথার রাজপুত্র নই। 'তোমাকে অবশ্যই ছয় মাস অপেক্ষা করতে হবে,' সে বলেছিল। যদি এটুকু সময় ধৈর্য ধারণ করতে পার, তাহলে আবার আমাদের পরস্পরের সাক্ষাৎ হতে পারে... ।'

যে মুহূর্তে ওদের দৃষ্টি আমার ওপর পড়ল তখন নিশ্চয় আমাকে বিধ্বস্ত সিন্ডারেলার মতো দেখাচ্ছিল, যখন তার সৎ মা আর ডাকিনী বোনদের কবল থেকে উদ্ধারের জন্য রাজপুত্র এসে হাজির হয়েছিল যারা তাকে জোর করে ধোয়ামোছার কাজে লাগিয়েছিল। আমি বলেছি ওরা আমাকে লক্ষ্য করেছিল,

তবে প্রথমে যার নজর আমার ওপর পড়ে সে কমলা সুন্দরী নয়, বরং সেই দাড়িওয়ালা লোক (তুমি কি এর কোনো মাথামুণ্ডু পাচ্ছ, গিয়র্গ? আমি কিন্তু পাইনি)। সে কমলা সুন্দরীর বাহু আঁকড়ে ধরে এত উচ্চকণ্ঠে 'ইয়ান ওলাফ!' বলে চিৎকার করে উঠল যে গোটা প্লাজার লোক তা শুনতে পাওয়ার মতো। উচ্চারণভঙ্গি শুনে বুঝতে পারলাম সে ডেনিশ। এর আগে কখনই তার সাথে দেখা হয়নি।

এরপর যা কিছু ঘটল, তা কয়েক সেকেন্ডের ব্যাপার, তবে তুমি এর চিত্রটা কল্পনা করতে পার। কমলার গাছের নিচে বসা আমাকে আবিষ্কার করল কমলা সুন্দরী। দুই এক মুহূর্তের জন্য ও প্লাজার ফোয়ারার পাশে পাথরের মূর্তির মতো স্থির দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তবে সে এতই নিঃস্পন্দ দাঁড়িয়ে ছিল যে মনে হচ্ছিল অনাদিকাল ওখানেই দাঁড়িয়ে, আর কখনই তার স্থিতি গতিময় হয়ে উঠবে না। তবে সে তার গতি ফিরে পেল। ঘুমন্ত রূপবতী একশ বছর ঘুমিয়ে ছিল, তারপর সে আবার প্রাণের স্পন্দন ফিরে পেল, যেন সে মাত্র কয়েক সেকেন্ড ঘুমিয়েছিল। সে আমার দিকে দৌড়ে এল, দুহাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরে ডেন ইতিপূর্বে যা বলেছিল তারই পুনরাবৃত্তি করল, 'ইযান ওলাফ!'

এবার ডেনের পালা, গিয়র্গ, সে এলোমেলো পা ফেলে আমি যে টেবিলে বসেছিলাম সেখানে এল, আমার দিকে ওর শক্ত হাত বাড়িয়ে দিয়ে বন্ধুসুলভ কণ্ঠে বলল, 'তোমাকে সশরীরে দেখে দারুণ লাগছে ইয়ান ওলাফ! কমলা সুন্দরী ইতিমধ্যে একটা চেয়ারে বসে পড়েছে, আর ডেন একটা হাত ওর কাঁধে রেখে বলে, 'মনে হচ্ছে এখানে আমি কাবাবের মধ্যে হাড্ডি,' একথা বলে সে সটান পেছন ফিরে প্লাজা থেকে বেরিয়ে যায়, ঠিক যেভাবে সে এসেছিল। সে চলে গেল। আমরা ওর হাত থেকে মুক্তি পেলাম। এবার আমার অভিভাবক ফেরেশতা আমার পাশে।

সে টেবিলে বসল আমার মুখোমুখি। তার দুহাত আমার হাতে রাখা। ওর মুখে উদ্ভাসিত হাসি। যদিও তার মাঝে চাপল্য ছিল তবু ছিল যথেষ্ট উষ্ণতা।

'তাহলে তোমার ধৈর্য ধারণ সম্ভব হল না' সে বলে। আমার জন্য অপেক্ষা করা তোমার সম্ভব হল না।

'নাহ্,' আমি কবুল করলাম, কারণ বেদনায় আমার হৃদপিণ্ডে রক্তক্ষরণ হচ্ছে।

আমি ওর দিকে চোখ তুললাম, ওর মুখে তখনও হাসি। আমি হাসি টেনে আনার চেষ্টা করলাম, তবে সেটা সম্ভব হল না।

'অতএব বাজিতে হেরে গেছি,' আমি যোগ করলাম।

সে একটু ভেবে নিল, তারপর বলল, 'জীবনে মাঝে মাঝে আমাদের এক ইয়ে সবুর করতে হয়। আমি তোমাকে লিখেছিলাম, চেয়েছিলাম তোমার মানসিক শক্তিকে একটু টেনে লম্বা করতে।'

মনে হল আমার কাঁধ ওঠানামা করছে, 'আর তাই আমি খেই হারিয়ে ফেললাম,' আমি আবার বলি।

'বটেই, তুমি খারাপ করেছ,' সে বলে মুখে অনিশ্চিত হাসি, 'তবে পরিস্থিতি একেবারে আয়ত্তের বাইরে যায়নি।'

'কিভাবে?'

'এটা ঠিক আগের মতোই আছে, ব্যাপারটা হল তুমি কতটা ধৈর্যশীল।'

'আমি এর কিছুই বুঝলাম না,' আমি বলি।

সে আমার হাতে মৃদু চাপ দিল, 'তুমি কী বোঝ না, ইয়ান ওলাফ?' সে ফিস-ফিস করে শুধু এই কথাটুকুই বলল, যেন কথাগুলো দীর্ঘশ্বাস হয়ে ওর বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে।

'এই সব নিয়ম কানুন,' আমি ওগুলো বুঝতে পারি না।

আর এভাবেই শুরু হল আমাদের দীর্ঘ কথোপকথন।

গিয়র্গ! সেই সন্ধ্যায় এবং সেই রাতে আমাদের মধ্যে কী কথোপকথন হয়েছিল তার বিশদ বিবরণ দেওয়ার প্রয়োজন নেই, আর আমার সব কথা মনেও নাই। তবে আমি জানি তোমার মনে অনেকগুলো প্রশ্নের উদয় হয়েছে, যার ত্বরিত উত্তর আমার কাছে থেকে আশা কর।

প্রথম যে জিনিসটার ব্যাখ্যা দিতে চাই তা হল, কমলা সুন্দরী আমার নাম জানল কী করে, আর আমার মা-বাবা কোথায় বাস করত। ওর সাথে সেভিলের সেই পোস্টকার্ডের সম্পর্ক আছে। আর মোটের ওপর সেটাই সর্বশেষ ঘটনা। আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে রইলাম, তারপর সে কোমল কণ্ঠে বলল, 'ইয়ান ওলাফ... তুমি কি সত্যিই আমাকে স্মরণ করতে পার না?'

আমি ওকে খুঁটে খুঁটে দেখলাম। ওর দিকে এমন করে তাকালাম যেন প্রথমবার তাকে দেখছি। ওর কালো চোখের দিকে বা পরিচিত মুখের দিকে তাকালাম না। আমার দৃষ্টি তার খোলা কাঁধের ওপর পতিত হতে দিলাম– কোনো আপত্তি দেখা গেল না ওর তরফ থেকে, তার পাতলা পোশাকের ওপর দৃষ্টি দিলাম। কিন্তু ক্রিসমাসের পূর্বের কয়েকবার সাক্ষাতের বাইরের কোনো প্রসঙ্গ আবিষ্কার করা সহজ বলে মনে হল না। যদি আমার প্রথম জীবনে কোনো দিন সাক্ষাৎ হয়েও থাকে, তবে এখন তা স্মরণ করা অসম্ভব। কারণ ওখানে বসে ওর অসাধারণ সৌন্দর্যের বাইরে অন্য কিছুতে মনঃসংযোগ করা সম্ভব হচ্ছিল না। সে ঈশ্বরের অনন্য সৃষ্টি, আমি ভাবলাম, অথবা হয়তো পৌরাণিক

বীরপুরুষ পীগম্যালিয়ন যে তার আদর্শ নারীকে সৃষ্টি করেছিল মর্মর খোদাই করে, আর প্রেমের দেবী দয়াপরবশ হয়ে তার ভাস্কর্যে প্রাণ সঞ্চার করেছিল। সর্বশেষ কমলা সুন্দরীকে দেখেছিলাম শীতের কালো কোট পরিহিতা, আর এখন সে এত পাতলা পোশাক পরে আছে যে আমার বিব্রত বোধ হচ্ছে। আমার বোধ হল ওর খুব কাছে চলে এসেছি। কিন্তু তবু ওকে স্মরণে আনতে পারছি না, অথবা হয়তো সে কারণেও বটে।

তুমি কি আমাকে স্মরণ করার চেষ্টা করছ না? সে পুনরাবৃত্তি করে। 'আমি কিন্তু তাই চাইছি।'

'আমাকে কি কোনো সুরাগ দিতে পার?' আমি অনুনয় করি।

হামলেভেইয়েন, বোকার ধাড়ি!'

'হামলেভেইয়েন। ওই রাস্তাতেই আমি বেড়ে উঠেছি। ওই রাস্তাতেই আমার জন্ম। ওই রাস্তাতেই আমার সারাটা জীবন কাটিয়েছি। আমি এ্যাডামস্টুয়েনে আছি মোটে ছয়মাস ধরে।

'অথবা আইরিশভেইয়েন,' ও বলে।

ঐ রাস্তাটাও একই এলাকায়। হামলেভেইয়েন দুভাগ হয়ে একদিকে চলে গেছে আইরিশভেইয়েন।

'আচ্ছা, তাহলে ক্লোভারভেইয়েন!'

একই এলাকার আর একটা রাস্তা। যখন ছোট ছিলাম, তখন ক্লোভার ভেইয়েনের বিচ্ছিন্ন বাড়িঘরের মাঝখানে এক বিশাল খোলা মাঠে খেলাধূলা করতাম। এখানে ছিল গাছগাছালি আর ঝোপঝাড়ে ঢাকা একটা বালিয়াড়ীর গর্তও ছিল, আর ছিল একটা সীস (বাচ্চাদের দোল খাওয়ার একপ্রকার ঢেঁকিফল)। কয়েক বছর আগে ওখানে কয়েকটা বেঞ্চিও বসানো হয়েছে।

আমি কমলা সুন্দরীর দিকে আর একবার তাকালাম। তারপর আমার দেহের ওপর দিয়ে একটা বিদ্যুৎঝলক খেলে গেল মনে হল যেন এক সম্মোহন থেকে জেগে ওঠলাম। ওর হাত আঁকড়ে ধরলাম শক্ত করে। মনে হল চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসবে। তারপর বললাম, 'ভেরোনিকা!'

ওর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, তবে চোখের কোণে জমাট অশ্রু মুছে ফেলল কিনা মনে নেই।

ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বসে রইলাম, এবার আর আমার দৃষ্টি কম্পিত হচ্ছে না। এখন আর কিছুই আমাকে পেছনে টেনে রাখতে পারবে না, সব লাজুকতা ঝেড়ে ফেলে দিলাম। হঠাৎ আমার আত্মা উন্মুখ করে দেয়ার সাহস পেলাম। কোনো রাখঢাক না করে কমলা সুন্দরীর কাছে নিজেকে সমর্পণ করার সাহস পেলাম। মনে হল আমার কাঁধ থেকে এক বিরাট বোঝা নেমে গেল।

সম্ভবত দৃঢ়তা ও সংকল্প এবং একে অন্যকে ছাড়ব না এই দুই পৃথক অনুভূতি সঞ্জাত যে চোখের দৃষ্টি তার মধ্যে এক বিশাল ব্যবধান আছে।

বাদামী চোখের মেয়েটি থাকত আইরিশভেইয়েনে। আর কথা বলতে শেখার পর থেকেও বটে। স্কুলেও আমরা এক ক্লাশেই লেখাপড়া শুরু করি তবে সেবার ভেরোনিকা ও তার মা-বাবা শহর ছেড়ে চলে যায়। সে সময় আমাদের বয়স সাত বছর। এটা মাত্র বার তের বছর আগের কথা। তবে এরপর আর কখনও আমাদের দেখা হয় নি। আমরা দুজনে সারাক্ষণ ক্লোভারভেইয়েনের গোলাকার টিলাটার ওপর পুষ্পিত ঝোপঝাড় আর গাছপালার মাঝে খেলা করেছি। ওটা ছিল আমাদের কাঠবিড়ালীর জীবনযাপন, পরিপূর্ণ কাঠবিড়ালীর জীবন। যদি ভেরোনিকা আইরিশভেইয়েন ছেড়ে চলে নাও যেত, তাহলেও আমাদের সেই শেকল ছেঁড়া শৈশব-জীবনের একদিন পরিসমাপ্তি ঘটত। ইতিমধ্যেই কানাঘুষা শুরু হয়ে গিয়েছিল মেয়েদের সাথে খেলতে আমি নাকি বেশি পছন্দ করি।

আমার মনে আছে আমাদের একজন বাড়িতে একটা গান শুনেছিলাম, আর আমরা খেলতে খেলতে সর্বদাই ওই গানটা গাইতাম: *জানতাম এক ছোট্ট ছেলে, ভালবাসত, খেলত এক ছোট্ট মেয়ের সাথে, সারাদিন মগ্ন থাকত, মহা আনন্দে, তাদের একান্ত স্বপ্নের ভুবনে...*

'কিন্তু তুমি তো আমাকে চিনতেই পারনি,' সে বলছিল, ওর হতাশার সুর আমার কাছে চাপা রইল না, এটা প্রায় বিষণ্নতার সীমানা স্পর্শ করছিল। হঠাৎ যেন আমি এক সাত বছর বয়সী মেয়ের সাথে কথা বলছি বিশ বছর বয়সী পূর্ণ যৌবনা নারীর সাথে নয়।

ওর দিকে আর একবার তাকাতে হল। আমার মনে হল ওর মনোরম লাল পোশাকের মধ্যে সম্মোহনী শক্তি আছে। পোশাকের নিচে ওর বুকের ওঠানামা দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল, ঠিক যেন কোনো সুষম সমুদ্র সৈকতে সীব্রেকার, পোশাক হল ওর সৈকত।

আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ করলাম শূন্যে। তারপর আমার চোখে ধরা পড়ল কমলা গাছের পত্রপুঞ্জে একটা হলদে প্রজাপতি। আজকের দিনের দেখা এটা প্রথম প্রজাপতি নয়।

ওটার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম: 'প্রজাপতিতে পরিণত হওয়ার দীর্ঘদিন পরে কী করে আমি একটা শুয়োপোকাকে চিনব?'

'ইয়ান ওলাফ! কঠোর কণ্ঠে সে বলে ওঠে। এর পর ওর শৈশব থেকে যৌবনে রূপান্তরের কোনো কথা বলা হল না।

আমার অনেক প্রশ্নের উত্তরই আমি তখন পর্যন্ত পাইনি। কমলা সুন্দরীর সাথে আমার পরিচয় আমাকে প্রায় উন্মাদ করে তুলেছে, আমার অস্তিত্বের গোড়া ধরে নাড়া দিয়েছে। নিজেকে এর সাথে বিলীন করে দিয়েছি।

'অসলোতে আমাদের পরস্পরের দেখা হয়েছিল। আমাদের মোট তিনবার দেখা হয়। এরপর থেকে আমি আর কিছুই ভাবতে পারছি না। তারপর তুমি হঠাৎ উধাও হয়ে গেলে, পাখী উড়ে গেল। খালি হাতে একটা প্রজাপতি ধরে রাখার চাইতে তোমাকে ধরে রাখা কঠিন হল। তবে আমাদের পুনরায় দেখা হওয়ার জন্য ছয় মাস কেন?'

স্বভাবতই ওকে সেভিল যেতে হচ্ছিল বলে। আমি কেবল ঐটুকু বুঝতে পারি। কিন্তু ছয় মাস স্পেনে থাকাটা ওর জন্য কেন এত জরুরী হয়ে পড়ল? এটা কি ডেনের কারণে?

আমি নিশ্চিত উত্তরটা তুমি অনুমান করতে পারবে গিয়র্গ। আমি কিন্তু পারিনি।

আমি যে দীর্ঘ সময় ধরে তোমাকে দীর্ঘ পত্র লিখছি, এখনও কি কমলা গাছের বিরাট ছবিটা আলিন্দে ঝুলছে? যে সময়টাতে লিখছি, তখন ওর ছবির কাজ শেষ হয়েছে, তবে আমার আশা ওটা সে নষ্ট করে ফেলেনি বা চিলেকোঠায় ফেলে রাখেনি। যদি এমনটা হয়ে থাকে, তাহলে তুমি ওকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে পার।

'আমি আর্ট স্কুলে পড়ার সুযোগ পেয়েছি,' সে বলেছিল। 'অথবা পরিষ্কার করে বলতে গেলে ছবি আঁকার ইস্কুলে। আমি কোর্সটা শেষ করার ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এটা আমার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

'ছবি আঁকার স্কুল?' আমি জিজ্ঞেস করি। আমার অবাক হওয়ার পালা। কিন্তু তুমি ক্রিসমাস ঈভে সে কথা বললে না কেন?

ওর থেকে তৎক্ষণাৎ কোনো উত্তর এল না, আমি বলে চলি: তোমার কি মনে পড়ে কেমন তুষারপাত হচ্ছিল? তোমার কি মনে আছে কিভাবে তোমার চুলের ঘ্রাণ নিচ্ছিলাম? তোমার কি মনে আছে কেমন করে ক্রিসমাস বেল বাজার সাথে সাথেই ট্যাক্সিটা এসে হাজির হল? তারপর তুমি চলে গেলে!

'আমার সব মনে আছে,' সে বলল। ফিল্মের মতোই সব কথা মনে আছে। একটা রোমান্টিক ফিল্মের প্রারম্ভিক দৃশ্যের মতোই মনে আছে।

কিন্তু আমার মাথায় আসছে না, তখন তোমার অত রাখঢাক কেন? অবাক হয়ে জানতে চাইলাম।

ওর মুখমণ্ডলে একটা কঠোর রেখা ভেসে উঠে মিলিয়ে গেল। "আমার মনে হয় ফ্রোনার ট্রামে আমাদের যেদিন টক্কর লেগেছিল সেদিন থেকেই তোমাকে আমার ভালো লেগেছিল," সে বলে। বলতে পার তোমাকে আমার ভালো লেগেছিল। তবে এবার সম্পূর্ণ নতুন একভাবে। পরবর্তী কালে আমাদের আরো

কয়েকবার দেখা হয়। আমি ভাবলাম ছয় মাস পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকাটা বোধ হয় সয়ে নিতে পারব। আরো ভাবলাম, এটা আমাদের জন্য দরকারী। ছেলেবেলায়? আমরা এত ঘনিষ্ঠ ছিলাম। তবে আমরা আর এখন ছোট নই, হয়তো পরস্পরের আকাঙ্ক্ষা কমে গিয়ে থাকবে। আমি বোঝাতে চাই, ঝট করে পুরনো অভ্যাসের ওপর নির্ভর করে নতুন খেলা শুরু করা উচিত নয়। আমি চেয়েছিলাম তুমি আমাকে নতুন করে আবিষ্কার কর, আমি চেয়েছিলাম তুমি আমাকে চেন, যেভাবে আমি তোমাকে চিনেছিলাম। সে কারণেই আমি প্রকাশ করিনি আমি কে?"

আমার মনে পড়ছে না আমি এর কী উত্তর দিয়েছিলাম, আর কমলা সুন্দরী যেসব কথা বলেছিল সেগুলোও সব মনে নেই, তবে ধীরে ধীরে আমাদের কথাবার্তা যতই এগুতে থাকে, আমরা এক প্রসঙ্গ থেকে লাফিয়ে অন্য প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছিলাম।

'আর তোমার ডেনিশ বন্ধু?' সুযোগ পেতেই প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলাম। মনে হল ওর পেটের কথা টেনে বের করার চেষ্টা করছি। বোকামী মনে হচ্ছিল। মনে হল আমি ক্ষুদ্র হয়ে যাচ্ছি।

সে শক্ত হয়ে গেল, প্রায় কঠোর। ওর নাম মর্গেন্স সেও পেইন্টিং কোর্স করছে। খুব ভালো ছেলে সে। খুবই আনন্দের ব্যাপার যে এখানে আরো একজন স্ক্যান্ডিনেভিয়ান আছে।'

আমার মাথায় চক্কর দিল, 'কিন্তু সে কী করে আমার নাম জানল?' আমার সন্ধানী প্রশ্ন।

আমি মনে করার চেষ্টা করছি এতে সে ব্লাশ করেছিল কিনা, তবে নিশ্চিত হতে পারছি না, হয়তো ওর লাল পোশাকের কারণেই, তাছাড়াও ততক্ষণে পুরোপুরি অন্ধকার নেমে এসেছে। শুধু কয়েকটা ঝাড় লণ্ঠন থেকে প্লাজার মধ্যে মৃদু আলো ছড়াচ্ছিল। আমরা এক বোতল লাল বিবেরা আর ডেল ডুয়েরো অর্ডার দিলাম আর দুজনে গ্লাস হাতে নিয়ে বসে রইলাম।

'আমি তোমার এক পোর্ট্রেট এঁকেছি, শুধু স্মৃতি থেকে,' ও বলল, তবে ঠিক তোমার আদল চলে এসেছে। মর্গেন্স এটা পছন্দ করেছে। এ সময় তোমাকে দেখাব, এটার শিরোনাম দিয়েছি শুধু *ইয়েন ওলাফ*।

তাহলে ভেরোনিকারই আঁকা। আমার প্রশ্ন করার প্রয়োজন হল না। তবে অন্য একটা বিষয় আমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছিল। 'তাহলে সাদা টয়োটায় যে লোকটা ছিল সে মর্গেন্স নয়,' আমি জানতে চাইলাম।

সে হেসে ফেলল। যেন প্রসঙ্গটা বদলাতে চায়। 'তুমি নিশ্চয়ই কল্পনা করনি আমি তোমাকে সেদিন ফলের বাজারে লক্ষ্য করিনি? আমি শুধু তোমার জন্য ওখানে গিয়েছিলাম।

আমি বুঝলাম না সে কী বোঝাতে চায়। সে যেন ধাঁধার ভাষায় কথা বলতে চায়। তবে সে বলে চলে: প্রথমে আমাদের দেখা ফ্রোনার ট্রামে। তারপর আমি কিছুক্ষণ শহরে ঘুরে একটা ভালো কাফে খুঁজে বের করলাম। একদিন ভেতরে ঢুকলাম– আগে কখনই ওখানে যাইনি এবং আমি স্পেনিশ চিত্রশিল্পী ভেলাকুইয়েজের একটা বই কিনলাম। ওখানে বসে বসে পাতা ওল্টাচ্ছিলাম। আমি অপেক্ষা করছিলাম।

'আমার জন্য?'

আমি বুঝলাম বোকার মতো প্রশ্ন হল। ওর উত্তরটাও বিরক্তির কাছাকাছি। "নিশ্চয়ই তুমি মনে কর না খুঁজে বেড়ানোটা একমাত্র তোমারই কাজ? আমিও এই গল্পের অংশ। আমি কেবলমাত্র একটা প্রজাপতি নই যাকে তুমি ধরবে।"

এ ধরনের প্রশ্নের গভীরে যাওয়ার সাহস আমার হল না, সেই মুহূর্তে এটা বিপজ্জনকও বটে। শুধু প্রশ্ন করলাম, আর ইয়ংস্টর্গেটের ব্যাপারটা?'

'ছেলেমি করো না, ইয়ান ওলাফ। আমি ইতিমধ্যেই বলেছি। ইয়ান ওলাফ কোথায় থাকতে পারে, আমার কৌতূহল ছিল। আর আমাকে কোথায় কোথায় খুঁজতে পারে, অর্থাৎ যদি সে সত্যিই আমাকে খুঁজতে চায়, আর বড় বড় কমলার ব্যাগের কথা বলছ? আমি নিশ্চিত হতে পারছিলাম না, ভাবলাম হয়তো তুমি আমাকে শহরের সবচেয়ে বড় ফলের দোকানে খুঁজতে যাবে। আমি তোমাকে খোঁজার জন্য ওখানে বহুবার গেছি। তবে অন্য জায়গাতেও গেছি। আমি গেছি ক্লোভারভেইয়েনে, গেছি হামলেভেইয়েনে। একবার গিয়ে দেখা পেয়েছিলাম তোমার মা-বাবার। আমার দুঃখ হয়েছিল এটা ঠিক দরজা খোলার মুহূর্তে, তবে যা হবার হয়ে গেছে। ছেলেবেলায় আমার ঘুরে বেড়ানোর কথা। তবে তোমার অবগতির জন্য বলছি ওদেরকে আমার নাম বলিনি, ওরা মুহূর্তেই আমাকে চিনে ফেলেছিল, তবে আমি বলেছিলাম, আমার একটু তাড়া আছে। আমি বলেছিলাম, সেভিলে আমার ছবি আঁকার একটা ব্যাপার আছে।'

আমি বুঝতে পারছিলাম না ওর কথা বিশ্বাস করা যায় কিনা। 'ওরা আমাকে এ নিয়ে একটা কথাও বলেনি,' আমি বললাম।

ও বসে রইল মুষড়ে যাওয়া ফুলের মতো, মুখে এক রহস্যময় হাসি। মনে হল ওকে মোনালিসার মতো দেখাচ্ছে, হয়তো এ কারণে যে ও একজন আর্ট স্কুলের ছাত্রী। 'আমি ওদের বলেছিলাম, আমার ওখানে যাওয়ার কথা যেন তোমাকে বলা না হয়, সে বলল, 'আমি বাধ্য হয়ে এর একটা ব্যাখ্যা বানিয়েছিলাম, তোমার সেটা না শোনাই ভালো।'

আমি হতবাক। মাত্র কয়েক দিন আগেই আমি মা-বাবাকে সেভিলের একটা পোস্ট কার্ড দেখিয়েছি। ছুটে এসে ঘোষণা করেছি আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি। এখন বুঝতে পারছি ওরা এত তাড়াতাড়ি আমাকে প্লেনের টিকেটের পয়সা দিতে

রাজি হয়ে গেল কেন? আমাকে একবারও প্রশ্ন করেনি অসলোতে কয়েকবার মাত্র দেখা হওয়া একটা মেয়ের পেছনে ধাওয়া করে সিমেস্টারের মাঝখানে সেভিলে চলে যাওয়া কতটা যুক্তিযুক্ত।

'একটা বড় শহরে একজন বিশেষ ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়া খুব সহজ কাজ নয়, আর তুমি যেমনটা বলছ দৈবাৎ দেখা হয়ে যাবার ঝুঁকি নিয়ে সেখানে যাচ্ছ। আমি যাচ্ছিলাম পেইন্টিং কোর্স করার জন্য। সেই জন্য চাইনি, যাবার আগে কারো সাথে সম্পর্ক তৈরি করে যেতে, তবে দুজন লোক যদি একে অন্যকে খুঁজে পাওয়ার জন্যই ঘোরাঘুরি করে তাহলে দৈবাৎ একদিন হয়তো দেখা হয়েও যেতে পারে।

আমি বিষয়টা পরিবর্তন করলাম, অথবা বলা যায় ঘটনাস্থল।

'ইতিপূর্বে কখনও কি তুমি ক্যাথিড্রাল সার্ভিসে যোগ দিয়েছিলে?' আমি জিজ্ঞেস করি। সে মাথা ঝাঁকায়।

'না, কখ্খনো না, আর তুমি?'

আমিও মাথা ঝাঁকাই।

সে বলে: 'ভালো কথা, হ্যাঁ, আমি বিকাল দুটার প্রার্থনাতেও গিয়েছিলাম। তারপর পরবর্তীর জন্য আমি রাস্তায় পায়চারী করেছিলাম। তোমার অবশ্যই ওখানে আসার কথা। তখন ক্রিসমাস, আর শীঘ্রই আমি বাইরে যাচ্ছি।'

আমার মনে পড়ল আমরা দীর্ঘ সময় ওখানে নির্বাক বসেছিলাম। তবে একটা যোগসূত্রে ফিরে আসতে হচ্ছে আমাকে। 'তাহলে টয়োটাতে মর্গেন্স ছিল না?'

'না,' ও বলে।

'তাহলে লোকটা কে?'

উত্তর দেয়ার আগে কয়েক মুহূর্ত ওকে দ্বিধাগ্রস্ত মনে হয়। 'কেউ না,' সে বলে।

'কেউ না?' আমার কৌতূহলী প্রশ্ন।

'বলতে পার সে একজন পুরনো বয়ফ্রেন্ড। ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে কলেজ পর্যন্ত আমরা এক সাথে পড়েছি।

আমার মনে হয় আমি মৃদু হেসেছিলাম, তারপরে সে আরো যোগ করে, 'আমরা পরস্পরের অতীত নিয়ে বসে থাকতে পারি না, ওলাফ। প্রশ্নটা হল আমাদের একটা যৌথ ভবিষ্যৎ আছে কিনা।'

ঠিক তখনই আমি তীব্র একটা খোঁচা অনুভব করতে পারি। সেটা এ কারণে যে কমলা সুন্দরী আর আমার একটা যৌথ ভবিষ্যৎ কল্পনা করতে পারছিলাম না। '*টু বি অর নট টু বি, দ্যাট ইজ দ্য কোশ্চেন।*'

মনে হয় সে ভাবল এটা বেদনাদায়ক। এটাকে ঢাকা দেয়ার জন্য আমি সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলতে শুরু করলাম। 'কিন্তু অত সব কমলাগুলো?' আমার উচ্ছ্বাসময় প্রশ্ন। 'তুমি ওগুলো দিয়ে কী করতে যাচ্ছিলে? অত কমলা কোন্ কাজে লাগে?'

সে উচ্চশব্দে হেসে উঠে। হ্যাঁ আমার মনে হয় এটা নিয়ে তুমি ধাঁধায় পড়ে গিয়েছিলে। কমলাগুলোর কারণেই আমি তোমাকে ইয়ংস্টর্গেট মার্কেটে টেনে আনতে পেরেছিলাম। ওগুলোর কারণেই তুমি গ্রীনল্যান্ডে অভিযানের কথা বলতে পেরেছিলে। আট কুকুরের দল আর দশ কিলো কমলা।'

এটা অস্বীকার করার মতো কারণ খুঁজে পেলাম না, তবে আবার জিজ্ঞেস করলাম: 'তুমি অতগুলো কমলা দিয়ে কর কী? সে কথায় ও আমার চোখের দিকে তাকায়, যেমনটা তাকিয়েছিল অসলোর কাফেতে, তারপর ধীরে ধীরে বলে, 'আমি ওগুলো পেইন্ট করতাম।'

'কিন্তু অতগুলো?'

হ্যাঁ, আমাকে অনেক কমলা পেইন্ট করতে হত। ঐ কাজটাই আমি প্রাকটিস করছিলাম।'

আমি হাতাশভাবে মাথা ঝাঁকাই। সে কি আমাকে বোকা বানাতে চায়? 'কিন্তু তুমি কি একটা কমলা কিনে সেটার ওপর বার বার অঙ্কনের অভ্যাস করতে পারতে না?'

সে ওর মাথা একদিকে কাৎ করে উদাসভাবে বলে, 'আমার মনে হয় তুমি আর আমি দুজনে মিলে ভবিষ্যতে অনেক কথা বলার সময় পাব, কারণ আমার মনে হয় তোমার একচোখ কানা।'

'কোন চোখটা?'

কোনো দুটো কমলাই এক রকম হয় না, ইয়ান ওলাফ, এমনকি দুটি ঘাসের পাতাও একমত নয়! আর সেই কারণেই তুমি এখানে এসেছ।'

নিজেকে নির্বোধ মনে হল। বুঝলাম কোন্ কথাটা সে আমার মাথায় ঢোকাতে চায়। 'কারণ দুটি কমলা এক রকম হয় না?'

'তুমি এতটা পথ পাড়ি দিয়ে সেভিলে এসেছ, এ কারণে নয় তুমি যে এক নারীর' সাথে দেখা করতে চাও। যদি তা চাইতে তাহলে তোমাকে এক গাদা ঝামেলা পোয়াতে হত, কারণ সারা ইউরোপময় নারী গিজগিজ করছে। তুমি এসেছ আমার সাথে দেখা করতে। আর "আমি" বলতে একজনই। আমি সেভিল থেকে অসলোতে একটা কার্ড পাঠিয়েছি "একজন মানুষের কাছে নয়। আমি পাঠিয়েছি তোমার কাছে। আমি বলেছি আমার প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে, আমি অনুরোধ করেছিলাম আমার ওপর আস্থা রাখতে।

কাফে বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরও আমরা দীর্ঘক্ষণ ওখানে বসে রইলাম। যখন আমরা উঠলাম, তখন সে আমাকে কমলা গাছের গুড়ির কাছে টেনে নিয়ে গেল, যার চাঁদোয়ার নিচে আমরা এতক্ষণ বসেছিলাম নাকি আমিই ওকে টেনে নিয়েছিলাম, এখন আর মনে নাই। কিন্তু কথাটা সে-ই বলেছিল। 'এখন তুমি আমাকে কিস করতে পার, ইয়ান ওলাফ, কারণ অবশেষে আমি তোমাকে ধরতে পেরেছি।'

আমি ওর কাঁধে হাত রেখে আলতো করে মুখে চুমো খেলাম। ও বলল, 'না, তুমি আমাকে ঠিকমতো চুমো খাও। তুমি আমাকে বাহু বন্ধনে জড়িয়ে ধর।'

কমলা সুন্দরীর আদেশ যথাযথ পালন করলাম। 'সে-ই নিয়ম বেঁধে দিয়েছে। ওর মুখে ভ্যানিলার স্বাদ। ওর চুলে তাজা লেবুর গন্ধ।

আমার চূড়ান্ত অনুভূতি হল, দুটি প্রাণবন্ত কাঠবিড়াল কমলা গাছের মগডালে ছুটাছুটি করে বেড়াচ্ছে। আমি নিশ্চিত ছিলাম সে কী খেলা খেলছে, তবে যাই হোক না কেন সেটা বন্য উন্মাদনায় অভিভূত।

সেদিনের সন্ধ্যাবেলার আর বেশি কথা বলব না গিয়র্গ, আমার মনে হয় এর থেকে তোমাকে ছাড় দেয়াই সঙ্গত। তবে তোমাকে শুনতে হবে সে রাতটা কীভাবে কেটেছিল?

মধ্যরাতের আগে আর আমার গেস্ট হাউসে ফিরে যাওয়া সম্ভব হল না। তবে কমলা সুন্দরী এক বৃদ্ধা মহিলার রসুইঘর ভাড়া নিতে সক্ষম হয়েছিল। দেয়ালে অনেকগুলো কমলা ফুল ও কমলা গাছের জলছবি ছিল। আর ঘরের এক কোণে আমার এক মস্ত বড় অয়েল পেইন্টিং। ছবিটার ওপর কোনো মন্তব্য করলাম না, সেও কিছু বলল না। এতে রূপকথার বিস্ময়কর রাজ্যের মধ্যে নিজেকে ঠেলে দেয়া হত। সবকিছু ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এগুলোই এখানকার নিয়ম। তবে মনে হল সে আমার চোখ এঁকেছে অনেক বড় করে আরও বেশি নীল করে। মনে হয় চোখগুলোর মধ্যে সে আরো বেশি করে ব্যক্তিত্ব আনার চেষ্টা করেছে।

সেই রাতে শুয়ে শুয়ে গভীর রাত পর্যন্ত ভেরোনিকাকে লম্বালম্বি মজাদার গল্প শুনালাম। আমি ওকে এক পুরোহিতের গল্প শোনালাম যার ছিল এক অসুস্থ কন্যা আর তার চার বোন ও দু ভাই, আর ছিল বেয়াড়া চাকর। আর শোনালাম গ্রীনল্যান্ডে স্কী অভিযানের দুঃসাহসিক গল্প, যাদের ছিল আট কুকুরের শ্লেজ আর দশ কিলো কমলা। আর শোনালাম জাতিসংঘের এক গোপন সংস্থার কমলার বিপজ্জনক ভাইরাস পর্যবেক্ষক দলের সদস্য, যারা সেই ভাইরাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করছে। আর শোনালাম এক মেয়ের গল্প যাকে এক নার্সারী স্কুলের ছাত্রছাত্রীর জন্য প্রতিদিন ঠিক এক রকমের ছত্রিশটা করে কমলা কিনতে হয়।

আরো তথ্য ফাঁস করলাম যাতে বলা হয়েছে ম্যানেজমেন্ট স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য এক মেয়ের ওপর দায়িত্ব রয়েছে কমলার জুস তৈরি করার। আর বর্ণনা দিলাম উনিশ বছর বয়সী এক মেয়ের যার বিয়ে হয়েছে এক ছাত্রের সাথে– লোকের চোখে যে বিতৃষ্ণ, আর তাদের এক কন্যাও রয়েছে। আর এক সাহসী কন্যার কথাবার্তা শোনালাম যে দারিদ্রপীড়িত আফ্রিকান শিশুদের জন্য গোপনে কমলা পাচার করে।

কমলা সুন্দরী মাঝে মাঝে হামলেভেইয়েন এবং আইরিশভেইয়েনে আমাদের যৌথ দিন যাপনে কিছু কিছু ঘটনা নিয়ে টিপ্পনী কাটে। আমি নিজে অবশ্য এসব ঘটনা সবটুকুই ভুলে বসে আছি। তবে ওর বলার ফলে কিছু কিছু মনে পড়ে।

আমরা যখন জেগে উঠলাম, তখন সূর্য আকাশের অনেকটাই ওপরে উঠে এসেছে। প্রথমে সে'ই নড়ে উঠল, আমাকে জেগে তোলার ওর যে অনুভূতি সেটা জীবনে কখনও ভোলার নয়। এখন আর বলতে পারব না কোন্‌টা কল্পনা আর কোনটা বাস্তব। সম্ভবত দুটোর সীমারেখা লোপ পেয়ে গিয়েছিল। শুধু এটুকু জানতাম কমলা সুন্দরীর খোঁজে আমি আর ঘুরে বেড়াচ্ছি না। এবার ওকে পেয়ে গেছি।

এখন আমি জানতে পেরেছি কমলা সুন্দরীটি কে, আর ওর নাম ভেরোনিকা এটা জানার অনেক আগেই আমার অনুমান করা উচিত ছিল...

এ পর্যন্ত পড়া শেষ হতে মা এসে আর একবার দরজায় টোকা দিল। 'সাড়ে দশটা বেজে গেছে, গিয়র্গ, টেবিলে খাবার দেয়া হয়েছে। তোমার কি আরো অনেক পড়ার বাকী আছে?' সে জিজ্ঞেস করে।

আমি একটু আলংকারিক ভাষায় বললাম: 'প্রিয় ক্ষুদে কমলা সুন্দরী, আমি তোমাকে নিয়েই ভাবছি। আর একটু অপেক্ষা করতে পার না?'

দরজার ওপারে তার চেহারা দেখতে পেলাম না, তবে তার নীরবে দাঁড়িয়ে থাকা বুঝতে পারলাম। 'মাঝে মাঝে জীবনে আমাদের বাসনা একটু বেশি হয়ে যায়,' আমি বললাম।

যখন কোনো উত্তর এল না, তখন বললাম, 'আমি এক ছোট্ট বালকের কথাও জানি... '

দরজার ওপারে তখনও পরিপূর্ণ নৈশব্দ। কিন্তু তারপর মায়ের পদশব্দ শুনলাম দরজার দিকে এগিয়ে আসার। দরজার ফ্রেমের সাথে মুখ লাগিয়ে সে গানের সুরে বলল, ছোট্ট মেয়েটার সাথে কে ভালবাসত খেলতে... ?

সে গানটা আর এগিয়ে নিতে পারে না, কারণ এরপর সে কাঁদতে শুরু করে, ফোঁসফোঁসানী কান্না।

দীর্ঘ দিবস রজনী বয়ে চলবে আনন্দের ফল্গুধারা দুজনের স্বপ্নের ভুবনে... আমিও ফিসফিসিয়ে জবাব দিলাম।

ওর দীর্ঘশ্বাস কানে এল, কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলে, "সত্যি একথা লিখেছে সে?'

'লিখেছিল,' আমি বললাম।

সে কোনো জবাব দিল না, তবে দরজার হাতল দেখে বোঝা গেল সে দরজার সাথে হেলান দিয়ে আছে।

'শীঘ্রই আসছি মা,' আমি ফিসফিস করে বললাম, 'আর মাত্র পনের পৃষ্ঠা বাকি।'

এ কথার কোনো উত্তর এল না। হয়তো ওর কোনো উত্তর নাই। আমি বুঝতে পারছি না কী ভয়াবহ ঝড় তুলেছি আমি ওখানে।

বেচারা ইয়োর্গেন, আমি ভাবলাম। কারণ এবার ওকে বেহালার দ্বিতীয় বাজনা শুনতে হবে। মিরিয়াম ঘুমিয়ে। এখন বাবা, মা আর আমি কথা বলছি। একদা হামলেভেইয়েনে আমাদের ছোট্ট এক পরিবার ছিল। তখন শয়নকক্ষে থাকত দাদা ও দাদীমা, আর ওরাই বানিয়েছিল বাড়িটি। ইয়োর্গেন শুধু মাঝে মাঝে বেড়াতে আসত।'

এ পর্যন্ত যা পড়েছি, তা নিয়ে গভীরভাবে ভাবলাম, ইতিমধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেছে। বাবা আমাকে অশ্বারোহণে নিয়ে যেত না। সে কমলা সুন্দরীকে নিয়ে কোনো রূপকথার গল্পও আবিষ্কার করেনি। হয়তো সে সব কথা প্রকাশও করেনি। তবে সে যা কিছু বলেছে সব সত্যি।

আমি লবিতে কোনো কমলা গাছের চিত্রাঙ্কন লক্ষ্য করিনি। আমি মায়ের আঁকা অনেক ছবিই দেখেছি। আমাদের বাগানে ফোটা লাইলাক ও চেরী ফুলের অঙ্কনও দেখেছি।

মাকে বলার মতো কত কথাই না আছে। আমি জানতাম ছোটবেলায় মা আইরিশভেইয়েনে থাকত। আমাদের মেইলবক্সে আসা একটা চিঠি পৌঁছে দেবার জন্য আমি একবার ঐ হলুদ বাড়িটাতে গিয়েছিলাম।

হয়তো চিঠি পড়ায় আর একটু এগিয়ে গেলে অরেঞ্জ পেইন্টিং সম্বন্ধে আরো অনেক কথা জানতে পারব। আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে। বাবা দি হাব্‌ল স্পেস টেলিস্কোপ নিয়ে আরো কিছু বলেছে?

হাব্‌ল স্পেস টেলিস্কোপের নামকরণ করা হয় জ্যোতির্বিদ এডুইন পাওয়েল হাবলের নামে। তিনি সেই ব্যক্তি যিনি প্রমাণ করেছেন মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ হচ্ছে। তিনিই প্রথমে আবিষ্কার করেন আমাদের গ্যালাক্সিতে এ্যান্ড্রোমিডা নীহারিকা শুধুমাত্র ধূলিকণা আর গ্যাসের মেঘপুঞ্জ নয়, প্রকৃতপক্ষে এটা আমাদের আকাশগঙ্গার বাইরে সম্পূর্ণ নতুন একটা ছায়াপথ। আকাশগঙ্গা অনেক ছায়াপথের মাত্র একটি, এই আবিষ্কার জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মহাবিশ্বের ধারণায় এক বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সূচিত করে।

হাবলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারটি আসে ১৯৯২ তে যখন তিনি দেখতে সক্ষম হন যে গ্যালাক্সী আকাশগঙ্গা থেকে যতদূরে সেটা তত দ্রুতবেগে ধাবিত হচ্ছে। বিগব্যাং তত্ত্ব এই আবিষ্কারের ওপরই প্রতিষ্ঠিত। এই তত্ত্ব, যা পৃথিবীর প্রায় সকল জ্যোতির্বিজ্ঞানী মেনে নিয়েছে, তা হল প্রায় ১২/১৪ বিলিয়ন বৎসর আগে এক মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি। আর এটা সত্যিই অনেক অনেক বৎসর আগের কথা।

যদি সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ইতিহাস একটা দিনের সময় কাঠামোর মধ্যে বেঁধে দেয়া যায় তাহলে পৃথিবীর সৃষ্টি শেষ বিকেলের আগে নয়। ডাইনোসরদের সৃষ্টি মধ্যরাতের কয়েক মিনিট আগে। আর মানুষের আবির্ভাব শেষ দুই সেকেন্ডের মধ্যে।

তুমি কি এখনও ওখানে বসা, গিয়র্গ? তোমাকে নার্সারী স্কুলে পৌঁছে দিয়ে আমি আবার কম্পিউটার নিয়ে বসেছি। আজ সোমবার।

আজ তোমাকে একটু ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। তোমার তাপমাত্রা নিয়ে দেখলাম, খুব বেশি ওঠেনি। তোমার গলার ভেতর ও কানও পরীক্ষা করে দেখলাম, তোমার কিছু গ্ল্যান্ডও দেখলাম, কিছুই ধরা গেল না। মনে হয় তোমার একটু সর্দি লেগেছে, তাছাড়া সপ্তাহান্তে তুমি কিছুটা ক্লান্তও হয়ে পড়েছ।

আমার আশঙ্কা হচ্ছিল তোমার কিছু অসুবিধা আছে, কাজেই তুমি আজ আমার সাথে বাড়িতেই রয়ে যেতে পার। অবশ্য আমাকে লেখার কাজটাও চালিয়ে যেতে হবে।

এ সপ্তাহান্তে আমরা আবার ফিয়েলোস্টলেনে গিয়েছিলাম। শনিবারে খুব সকালে মা একটা পুরনো দুধের ক্যান নিয়ে হাঁটা পথে অনেকদূর গিয়েছিল, আর ফিরে আসে চার কিলো ক্লাউড বেরী নিয়ে। ব্যাপারটা নিয়ে গিয়র্গ, তুমি বোধহয় একটু মন খারাপ করেছ। তুমিও বেরী সংগ্রহের জন্যে পাহাড়ে যেতে চেয়েছিলে, আর বিকালে তুমি নিজে নিজেই আধা কিলোর মতো ক্রোবেরী সংগ্রহ করেছিলে। অবশ্য কেবিন থেকে আমরা তোমার ওপর চোখ রেখেছিলাম। তারপর মাকে ক্রোবেরী জেলি বানাতে হয়েছিল। রোববারে আমরা ওটা খেয়েছিলাম। আমার মনে হয় তোমাকে একটু টক লেগেছিল, কিন্তু যেহেতু নিজে বেরী সংগ্রহ কবেছিলে তাই তোমাকে ওটা খেতেই হয়েছিল।

এবার গ্রীষ্মকালে অনেক লেমিং (সুমেরু অঞ্চলের মুসিক জাতীয় প্রাণী) দেখা গিয়েছিল, আর তুমি ড্রইং খাতায় হলুদ ও কাল ক্রেয়ন দিয়ে একা লেমিং এঁকেছিলে। বেশ ভালো হয়েছিল, একটু কল্পনা শক্তি প্রয়োগ করলে বেশ বোঝা যায় ওটা লেমিংই হয়েছে। শুধু লেজটা একটু বেশি লম্বা হয়ে গিয়েছিল। সেই জন্য যাতে কেউ ভুল করে না বসে তাই মা ওটার নিচে

"লেমিং কথাটা লিখে দিয়েছিল। তার পর সে লিখেছিল "গিয়র্গ ১/৯/১৯৯০।"

হয়তো বইটা কেবিনে এখনও রয়ে গেছে? তাই না গিয়র্গ? সেদিন সারাটা বিকেল আমি বইটা আগাগোড়া উল্টেপাল্টে দেখলাম। তুমি ঘুমুতে যাবার পর আবার আমি বইটা পড়লাম। তোমার ছবিটার দিকে আরো একবার চেয়ে দেখলাম। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত উল্টে গেলাম। আমি বুঝতে পারলাম ক্রিসমাসের আগে এটাই আমাদের শেষবারের মতো কেবিনে আসা। শেষ পর্যন্ত ভেরোনিকা এসে আমার হাত থেকে বইটা কেড়ে নিল। ওটা সে বুকশেলফের সবচেয়ে ওপরের তাকে রেখে দিল। যদিও স্বাভাবিকভাবে এটা রাখার জায়গা ম্যান্টল পিসের ওপর।

'এবার একটু পান করে নেয়া যাক,' কথার মধ্যে এটুকুই ওর মুখ থেকে বেরোল।

স্পেনের কথায় ফিরে যাওয়া যাক।

আমি ভোরোনিকার সাথে সেভিলে দিনদুয়েক ছিলাম। তারপর বাড়ি ফেরার সময় হল, এ ব্যাপারে ভেরোনিকা ও গৃহকর্ত্রী একমত হল। ওর পেইন্টিং কোর্স শেষ পর্যন্ত আমাকে আরো তিন মাস অপেক্ষা করতে হবে। তবে এখন আমি ধৈর্যধারণ করতে শিখেছি, কমলা সুন্দরীকে বিশ্বাস করতেও শিখেছি।

অবশ্য তাকে জিজ্ঞেস করতে হল পরবর্তী ছয় মাস আমাদের প্রতিদিন সাক্ষাৎ হওয়ার প্রতিজ্ঞা সে রাখবে কিনা। আমি এটাকে আর অখণ্ডনীয় বলে মানতে পারছি না, যেহেতু আমি নিজেই কথা রাখিনি। উত্তর দেয়ার আগে সে অনেকক্ষণ ভেবে নিল। মনে হয় একটা রসালো জবাব খুঁজছিল। তারপর মুখে মৃদু হাসি টেনে এনে বলল, "সম্ভবত আমরা এখানে আগাম যে দুদিন একসাথে থাকলাম সেটা কেটে বাদ দিতে পারি।"

বাসে করে আমার সঙ্গে বিমান বন্দরে যাওয়ার পর আমরা দেখলাম ড্রেনের মধ্যে একটা শ্বেত পারাবত মরে পড়ে আছে। ভেরোনিকা চট করে থেমে গেল। তার সারা শরীর কাঁপছিল। আমার কাছে অদ্ভুত লাগল, ব্যাপারটা তার মনের ওপর এমন তীব্র প্রতিক্রিয়া করবে, তার পর সে আমার দিকে ফিরে আমার বুকে মাথা রেখে কাঁদতে শুরু করল। আমিও কাঁদতে শুরু করি। এমন নাবালক ছিলাম আমরা। আমরা যেন একটা রূপকথার গল্পের মধ্যে আটকা পড়ে গেছি। পয়ঃপ্রণালীতে একটা শ্বেত পারাবত মরে পড়ে থাকবে। কী ভয়ংকর! অবশ্য পুরো সাদা নয়। ঐগুলিই নিয়ম। আমরা কেঁদে চললাম। সাদা কবুতরটা এক অমঙ্গলের লক্ষণ।

অসলোয় ফিরে এসে আমি পড়াশোনায় মন দিলাম। অনেকগুলো চিঠির উত্তর দেয়া বাকী পড়েছে। গত কয়েক মাস স্কী করা আর শহরে উদ্দেশ্যহীন ঘোরাফেরায় লেখাপড়ার অনেক কাজ জমা হয়ে আছে। তবে সময়েরও অনেক সাশ্রয় হচ্ছে কারণ কোনো রহস্যময়ী কমলা সুন্দরীর সন্ধানে উন্মাতাল হয়ে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে না। তাছাড়া আমার অনেক বন্ধুকেই যেমন মেয়ের পেছনে ঘুরে অনাবশ্যক সময় নষ্ট করতে হয়; আমাকে তাও আর করতে হচ্ছে না।

কোনো এক উষ্ণ দিনে হঠাৎ কোনো কালো কোট পরা বা লাল গ্রীষ্মের পোশাকে কোনো মহিলাকে দেখলে এখনও আমি চমকে উঠি। আর যতবারই কমলার ওপর চোখ পড়ে আমার ভেরোনিকার কথা মনে পড়ে শপিং-এ গিয়ে কমলার স্তূপ আমাকে দিবাস্বপ্নের মধ্যে ঠেলে দেয়। এখন আমি বেশ ভালো করে বুঝতে পারি কোনো দুটি কমলাই এক রকম নয়। আমি দাঁড়িয়ে খুঁটে খুঁটে দেখি। আর নিজে কমলা কিনলে ঠাণ্ডা মাথায় পরখ করে সর্বোত্তমগুলোই বাছাই করি। মাঝে মাঝে আমি কমলা চিপে রস বের করতাম, আর একবার তখন আমরা ফ্লাটে ব্রীজ খেলছিলাম, আমি কমলার জুস তৈরি করে গুনার এবং তার সাথে আর আর বন্ধুদের খাইয়েছিলাম।

গুনার ছিল রাষ্ট্রবিজ্ঞানেরর দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র, আর আমাদের দুজনের মধ্যে সে-ই ছিল পাকা রাধুনী। সে প্রায়ই আমাদের বীফ বা কড মাছের মজাদার রান্না খাওয়াত। আর যদিও সে বিনিময়ে কিছু প্রত্যাশা করত না, তবু মাঝে মাঝে কমলার জুস দিয়ে ওকে অবাক করে দিতাম। সেই পুডিংয়ের মধ্যে আমি অনেকটাই মনপ্রাণ ঢেলে দিতাম। মা, অর্থাৎ তোমার দাদীমা আমাকে একটা পুরনো রান্নার বই থেকে রেসিপি দিয়ে সাহায্য করত। এমনকি সে আমার জন্য কমলার মোরব্বা তৈরিরও প্রস্তাব দিয়েছিল। সে বুঝতে পারেনি যে পুরো আইডিয়াটাই ছিল আমার নিজের তৈরি। সে ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেনি আমার পরিকল্পনার সাথে ভেরোনিকার কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে।

তারপর গিয়র্গ, সে ফিরে এলো নরওয়েতে। জুলাইয়ের মাঝামাঝি সেভিল থেকে। আমি ফর্নেবু এয়ার পোর্টে গেলাম ওকে অভ্যর্থনা জানাতে। সে কাস্টমস্ থেকে বিশাল দুটি সুটকেস, পেইন্টিং ও ড্রইংয়ের বড় সড় পোর্টফলিও নিয়ে বাইরে এলে পরে আমাদের পুনর্মিলনের সাক্ষী হয়ে রইল অগণিত মানুষ। প্রথমে আমরা আধ মিনিটতক পরস্পরের দিকে অপলক নেত্রে তাকিয়ে রইলাম। হয়তো আমরা এটা দেখাতে চাই যে আরো দুএক সেকেন্ড ধৈর্যধারণের ক্ষমতা আমাদের আছে। তারপর এক আবেগঘন আলিঙ্গনে দুজনে দুজনায় মিশে গেলাম, নিতান্ত আবেগময়তায় আমরা ভুলেই গেলাম এটা এয়ারপোর্ট। এক বৃদ্ধা মহিলা আমাদের পাশ দিয়ে যেতে যেতে কী যেন বলল, 'তোমাদের একটু লাজশরম থাকা উচিত!' ঘোত ঘোত করে মহিলা। আমরা হো হো করে হেসে

উঠলাম। আমাদের লজ্জা পাওয়ার কী আছে? ছয় মাস ধরে আমরা পরস্পরের জন্যে অপেক্ষা করেছি।

ভেরোনিকার আর তর সইছিল না। বিমান বন্দর থেকে বেরিয়ে আসার আগেই ও পোর্ট ফলিও খুলে দেখাল ওর শিল্পকর্ম। ইয়ান ওলাফের ছবির পাতাটা ও ঝটপট উল্টে চলে গেল। তার মধ্যেই দেখে নিলাম ছবিটার গভীর নীল চোখ থেকে যেন আলো বিকীর্ণ হচ্ছে। এ নিয়ে আমি কিছু বলতে পারলাম না, তবে ভেরোনিকা অন্য ছবিগুলি নিয়ে অনর্গল মন্তব্য করে যাচ্ছিল। কথার যেন শেষ নাই। ছবিগুলি নিয়ে ওর অহংকার গোপন করার কোনো চেষ্টাই করল না। সে যে গত ছয় মাসে মেলা কিছু শিখেছে সেটা লুকোবার কোনো চেষ্টাই করল না।

পরবর্তী ছয় মাস আমরা রোমান্সের মধ্যে ডুবে রইলাম। আমরা বেড়াতে গেলাম অসলোফিওর্ডের দ্বীপে, ঘুরে বেড়ালাম পল্লী এলাকায়, যাদুঘর ও আর্ট এক্সিবিশন পরিদর্শন করলাম। তাসেনের শহরতলীতে ঘুরে বেড়িয়ে সারাটা গ্রীষ্ম কাটিয়ে দিলাম।

তুমি তাকে শহরে ঘুরতে দেখেছ। প্রদর্শনীতে যেতে তার উৎসাহ কত প্রবল তাও তোমার জানা। তুমি জানতে ওর হাসির ধরন। আমারও হাসি ছাদফাটানো। আমি জানি হাসির সাংঘাতিক সংক্রমণ ক্ষমতা আছে।

আমরা "সর্বনামটা ঘন ঘন ব্যবহার করতে শুরু করলাম। আজব শব্দ একটা। আমরা সচরাচর বলে থাকি 'আমি আগামী কাল এটা বা ওটা করতে যাচ্ছি।' অথবা জিজ্ঞেস করি 'ঐ লোকটা বা তুমি' কী করতে যাচ্ছ?" এটা বোঝা তেমন কঠিন নয়। কিন্তু হঠাৎ করেই "আমরা" শব্দটার আবির্ভাব হয় আর ঘনঘন ওটার এস্তেমাল হতে থাকে। "আমরা" কি একটা বোট নিয়ে দ্বীপে গিয়ে সাঁতার কাটব? 'নাকি বাড়িতে বসেই "আমরা" পড়াশোনা করব? "আমরা" কি ঐ নাটকটা উপভোগ করেছিলাম?' 'আর তারপর একদিন,' "আমরা" সুখী!'

আমরা যখন "আমরা" সর্বনামটা ব্যবহার করি তখন একটা যৌথ উদ্যোগের পেছনে দুজন ব্যক্তিকে একসাথে দাঁড় করিয়ে দেই, ঠিক যেন একটা যৌগ সত্তা। অনেক ভাষায় শুধুমাত্র দুজনকে বোঝানোর জন্য একটা বিশেষ সর্বনাম শব্দ অছে। এই সর্বনামটাকে বলা হয় *দ্বিবচন*, অথবা একটা কোনো কাজ যা শুধু দুজনে মিলে করে। আমার মনে হয় এটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটা রূপকল্প। কারণ এমন কতকগুলি মুহূর্ত আসে যখন কর্তা *একও* নয় আবার *বহুও* হতে পারে না। তখন *দোহে মিলে*, আর *দোহে* বিচ্ছিন্ন করা যায় না। যখন এই দৃশ্যপটে ওই সর্বনামের আবির্ভাব তখনই রূপকথার নিয়ম কানুন লাগু হয়ে যায়,

ঠিক যেন যাদুদণ্ডের আন্দোলনে। 'আমরা এখন ডিনার করব,' 'মদের বোতল খুলব আমরা' 'আমরা শুতে যাব।' এধরনের কথাবার্তা নিতান্তই বেলাজ, তাই না? সে যাহোক, 'তোমাকে এখন বাস ধরতে হবে, কারণ এখন আমি ঘুমোব:' এ ধরনের বক্তব্য সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী।

যখন আমরা দ্বিবচন ব্যবহার করি; তখন সম্পূর্ণ নতুন নিয়মকানুন প্রযোজ্য হয়। 'আমরা এখন বেড়াতে যাব,' খুব সাদামাটা বক্তব্য, গিয়র্গ, মোটে চারটা শব্দ। তবু এর মধ্যে এমন এক তাৎপর্য নিহিত আছে, যা পৃথিবীতে দুটি মানুষের অস্তিত্বের গভীরে প্রোথিত। আর এই শক্তির ভাণ্ডার শুধু কথার মধ্যে আবদ্ধ নয় 'আমরা গোসল করব,' ভেরোনিকা বলে। 'আমরা খাব! আমরা শুতে যাব!' তখন তোমার দুটি শাওয়ার, দুটি রান্নাঘর বা দুটি বিছানার প্রয়োজন নেই।

আমার কথা বলতে গেলে এই নতুন সর্বনামটা আমার কাছে এল এক মহাচমক রূপে। "আমরা" কথাটা দিয়ে যেন একটা বৃত্ত পূর্ণ হল। যেন সমগ্র বিশ্বকেন্দ্রিত হল এক মহত্তর ঐক্য।

যৌবন, গিয়র্গ, যৌবন সুলভ উল্লাস!

আমার মনে আছে আগস্টের এক সন্ধ্যার কথা, যখন আমরা বীগডয় অন্ত রীপ থেকে ফিওর্ডের ওপর দিয়ে আমাদের দৃষ্টি প্রসারিত করে দিয়েছিলাম। জানি না আমি কথাটা কোথায় পেলাম, তবে উচ্ছ্বসিত ভাবে বলে বসলাম: 'এই পৃথিবীতে আমরা একবারের জন্যই এসেছি।'

'আমরা এসেছি এই মুহূর্তের জন্য,' ভেরোনিকা বলে, মনে হয় যেন এই সত্যটা আমাদের নতুন করে উপলব্ধি করতে হবে।

তবে আমার বোধ জন্মাল, আমি যা বলতে চাই সে তা ঝেড়ে ফেলতে চায়। তাই আমি বললাম, 'মনে হয় আজকের এই সন্ধ্যার মতো আর কোনো সন্ধ্যা আমার জানা হবে না... ।' আমি জানতাম ভেরোনিকা, ওলাফ বুলের এ ধরনের একটা লাইন স্মরণ করতে পারবে। এই কবিতাটা আমরা এক সময় এক সাথে পড়তাম।

হঠাৎ ভেরোনিকা আমার দিকে ফিরে আমার কানে চিমটি কাটল। 'তাহলে অন্তত তুমি এখানেই আছ, উঁচু কপালে!'

শরৎ এল। ভেরোনিকা তার আর্ট স্কুল শুরু করল। আমি মেডিকেলে ফিরে গেলাম। প্রাথমিক কোর্স শেষ হতেই আমার কাছে পড়াশোনা বেশ আকর্ষণীয় হয়ে উঠল। বিকেল এবং সন্ধ্যেবেলাটা যতটা সম্ভব বেশি সময় একসাথে কাটাতে লাগলাম, আর এটাও নিশ্চিত হলাম যে দিনে অন্তত একবার আমাদের দেখা হবেই। কিন্তু কমলা সুন্দরী এর মধ্য থেকে হঠাৎ দুদিন কাট করল। আমার মনে হয় সে আমাকে খেপাবার জন্যেই এমনটা করল, হয়তো: একটা

দৃষ্টান্ত স্থাপনের প্রয়াসও হতে পারে। আমাদের তখনও নিয়ম মেনে চলতে হচ্ছিল: রূপকথার গল্প এখনও শেষ হয়নি, সবে শুরু হয়েছিল ওটা। আর চারপাশে নতুন নতুন রূপকথার কাহিনী গজাচ্ছিল, কাজেই আরো বেশি নিয়মের বন্ধনে আবদ্ধ হতে হচ্ছিল। তোমার কি মনে আছে এসব নিয়মের ব্যাপারে আমি কী বলেছিলাম? গুরুত্বপূর্ণ কথা হল তুমি ওগুলো হয় মানবে নয়তো মানবে না, তবে ওগুলো তোমাকে বুঝতে হবে এমন কোনো কথা নেই। এমন কি এগুলো নিয়ে তোমার কথাও বলা চলবে না।

ভেরোনিকা অসলোতে একটা ছোট্ট বাসা নিয়েছিল শোয়া ও বসার জন্য একটিমাত্র ঘর আর এক চিলতে রান্নাঘর ছিল। বাসাটা সে এক বৃদ্ধা মহিলার কাছ থেকে ভাড়া নিয়েছিল। শর্ত ছিল ওকে গ্রীষ্মকালে মহিলার লনের ঘাস ছাটাই, শীতকালে বেলচা দিয়ে বরফ সাফাই, দুচার দিন পর পর মহিলার জন্য বাজার করে দেয়া, আর লাইসেন্সবিহীন দোকান থেকে সপ্তাহে এক বোতল করে পোর্ট এনে দেয়া। তবে মহিলা, যার নাম ছিল মোউয়িংকেল, মাঝে মাঝে এই কাজগুলো আমার করে দেয়ায় আপত্তি করত না। এটা এক দিক দিয়ে ভালোই, কারণ এতে সুবিধা হয়েছিল যে সেই সংকীর্ণ ঘরে মাঝে মাঝে আমার রাত্রিবাস মহিলা মেনে নিয়েছিল। বাসা ভাড়াটাও আমিই দিতাম।

ক্রিসমাস এসে গেল আবার। আবার আমরা ক্যাথিড্রালে প্রার্থনায় যোগ দিতে গেলাম। আমরা ভাবলাম এটুকু আমাদের পরস্পরের কাছে প্রত্যাশা। ভেরোনিকার পরনে সেই কালো কোট আর চুলে সেই চমক লাগানো ক্লিপ। এখন আমি নিজেও সেই রূপকথার কাহিনীর অংশ, সেই অতলস্পর্শী রহস্যের। অবশ্য এবার আমরা গীর্জার একই আসন সারিতে বসলাম। এবার কোন্ লোক কোন্ দিকে তাকাচ্ছে, সে নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই। কেউ যদি ভেরোনিকার দিকে তাকায় তাহলে তাকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত, আর কেউ কেউ সত্যিই ওর দিকে তাকিয়েছিল। আমি অহংবোধ করলাম। ভেরোনিকা যেন আলো ছড়াচ্ছে, আর ও-ও খুব খুশী, অবশ্য আমিও খুশী। বোধহয় ওর মনেও অহংবোধ জেগে থাকবে।

প্রার্থনার শেষে আমরা গত বছর যে পথে চলেছিলাম, ঠিক সেই পথ ধরলাম। এ নিয়ে আমরা কথাও বললাম। ঐতিহ্যের ব্যাপারেও আমরা সচেতন। আমরা নিঃশব্দে হাঁটতে হাঁটতে প্যালেস পার্ক পর্যন্ত এগিয়ে গেলাম। নৈঃশব্দটা আমাদের কাম্য ছিল না, তবে এটা ঘটে যাচ্ছিল।

আগের বছর ঠিক যেখানে সে ট্যাক্সি ধরেছিল, ওখানে আমরা পরস্পরকে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কারণ এই ক্রিসমাসেও আমাদের পথ এখান থেকে দুভাগ হয়ে গেছে।

ভেরোনিকা তার এক ফুপুর বাড়ি স্কিলেবেকে যাচ্ছে, ওখানে ওর বাবার সাথেও দেখা হবে, ওখান থেকে ওরা কারে এ্যাস্কারে ওর মা-বাবার বাড়িতে যাবে। আমি হামলেভেইয়েনে আমার বাবা-মা ও চাচা আইনারের সাথে থাকব।

দৃশ্যপট ঠিক আগের বছরের মতোই। ভার্গেল্যান্ডস্‌ভেইয়েনে আমরা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নেব, আর একটা খালি ট্যাক্সি আসা মাত্রই ভেরোনিকা ওটাতে লাফিয়ে উঠবে। তবে ট্যাক্সি আসার পর কী ঘটবে? রূপকথার কাহিনী কি শেষ হয়ে যাবে? সম্মোহন কি ভেঙ্গে পড়বে? এ নিয়ে আমরা কিছু বলিনি। গত ছয় মাস ধরে প্রতিদিন পরস্পরের সাথে দেখা হয়েছে, শুধু মাঝের নিষ্ঠুর সেই দুই দিন বাদে। কমলা সুন্দরী তার পবিত্র ওয়াদা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। তবে আগামী বছরগুলির জন্য নিয়ম কানুন কী হবে?

এ বছর ক্রিসমাসটা বেশি ঠাণ্ডা। ভেরোনিকা কাঁপছিল। আমি ওকে জড়িয়ে ধরে পিঠে হাত ঘষে দিলাম। তারপর ওকে বললাম, আমি গুনানের সাথে যে ফ্লাটটা শেয়ার করতাম, নববর্ষের শুরুতে ওটা সে ছেড়ে দিচ্ছে। ওর পড়াশোনা সে বার্গেনে গিয়ে চালাতে চায়। আমাকে এখন আর একজন ছাত্র খুঁজে বের করতে হবে যার সাথে শেয়ার করতে পারি।

এত ভীরু ছিলাম আমি গিয়র্গ। আমার মনে হয় সে-ও এমনটাই ভাবছিল। তার মধ্যে কঠোরতা অনুভব করলাম। গুনার চলে যাচ্ছে? আমার আর একজন ছাত্র খুঁজতে হবে? আমি কি ওর সাথে আলোচনা না করেই এসব পরিকল্পনা করছিলাম? ওকে রাগান্বিত মনে হল। আমার ভয় হচ্ছিল বোধহয় ক্রিসমাসের বিদায়পর্বটা তিক্ততার মধ্য দিয়েই শেষ হবে। তারপর সে বলল, 'কিন্তু আমিও তো তোমার সাথে নতুন জায়গায় উঠে যেতে পারি। অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি, তুমি আর আমি তো এক সাথেই থাকতে পারি। আমরা অবশ্যই তা পারি, পারি না কি, ইয়ান ওলাফ?'

আমিও ঠিক এটাই চাইছিলাম। তবে আমি ওর চেয়ে অনেক কম সাহসী। আমার ভয় ছিল নিয়ম ভঙ্গ করার।

প্লাজা এলিয়াঞ্জার একটা কমলা গাছের মতোই সে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, যখন আমরা সম্মত হলাম যে জানুয়ারিতে সে এ্যাডাস্ট্রয়েনে চলে আসতে পারে। এখন শুধু প্রতিটা দিনই নয়, প্রতিটা রাতও আমরা এক সাথে থাকতে পারব। এগুলোই এখনকার নতুন নিয়ম।

তবে একটু পরেই ওর মুখমণ্ডলে একটা উদ্বেগের ছায়া খেলে গেল। হয়তো কোনো এক ধরনের সন্দেহ, আমি ভাবলাম, হয়তো সে কোনো এক ধরনের শর্ত আরোপ করতে চায়। অথবা ওর মনে কী এমন কোনো ভাবনার উদয় হয়েছে যা বলা শক্ত? ব্যাপার কী ভেরোনিকা? আমি ফিসফিস করে বললাম। ওর মনের কথা বোধ হয় আমি ঠাওর করতে পারছি।

'তাহলে গুনারের ঘরটা খালি হয়ে যাচ্ছে, সে বলল। আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম, তবে ঠিক বুঝতে পারলাম না কেন সে এটা উল্লেখ করতে গেল। আমি বললাম গুনার চলে যাচ্ছে।

'বেশ, তাহলে তো আমাদের আলাদা রুমে ঘুমুতে হবে না!' সে বলল।

'অবশ্যই না,' আমি বললাম।, তখনও ধরতে পারলাম না ওর মতলবটা কী।

এবার আর ওর সন্দেহের কোনো অবকাশ রইল না। সে তৎক্ষণাৎ গেয়ে উঠল: সেক্ষেত্রে 'গুনারের ঘরটাকে আমার স্টুডিও হিসাবে ব্যবহার করতে পারি? চকিতে একবার সে দেখে নিল আমার প্রতিক্রিয়াটা কী? আমি শুধু ওর ঘাড়ের রূপালী ক্লিপের ওপর হাত রাখলাম আর বললাম, একজন শিল্পীর সাথে একসাথে বাস করতে আমি দারুণ গর্ববোধ করব।

দুএক মিনিটের মধ্যেই ওর ট্যাক্সি এসে হাজির। হাত ইশারায় ওটাকে থামায়। গাড়িতে উঠে বসে, এরপর দারুণ উচ্ছ্বাস ভরে দুই হাত নেড়ে আমাকে বিদায় জানায়।

ট্যাক্সি চলে যাওয়ার পর আমি কোনো কাঁচের স্যান্ডেলের খোঁজ করলাম না। আমাদের রূপকথার গল্পের আর কোনো শর্ত রইল না। আমরা আর রূপকথার সেইসব ঝাপসা শর্তের ওপর নির্ভরশীল থাকব না, কোনটা করা যাবে আর কোনটা করা যাবে না। এখন সব সুখ আমাদের আয়ত্তে।

তবে একজন ব্যক্তি বলতে কি বুঝায়, গিয়র্গ? একজন ব্যক্তির মূল্য কত? আমরা বাতাসে ঝেড়ে ফেলে দেয়া ধুলোর চাইতে বেশি কিছু নই?

যে মুহূর্তে এই পংক্তিগুলি লিখছি তখন হাব্‌ল স্পেস টেলিস্কোপ পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে। ইতিমধ্যেই পৃথিবীর চার পাশে ওর নিজস্ব কক্ষপথে চারমাস অতিক্রান্ত হয়েছে। যে মাসে উৎক্ষেপণের পর থেকে ইতিমধ্যেই মহাশূন্যের বিশাল আবর্জনা স্তূপের ছবি পাঠিয়েছে যার থেকে আমাদের পৃথিবীর জন্য। তবে ওরা শীঘ্রই আবিষ্কার করে যে এর নির্মাণে সাংঘাতিক ধরনের ত্রুটি রয়েছে। ইতিমধ্যেই আলোচনা শুরু হয়েছে যে স্পেস শার্টেলে করে কিছু ক্রু পাঠানো হবে সেই ত্রুটি মেরামতের জন্য। আর তাতে করে মহাবিশ্ব সম্বন্ধে আমরা আরো পরিষ্কার জ্ঞান লাভ করতে পারব।

তুমি কি হাব্‌ল স্পেস টেলিস্কোপের হালচাল সম্পর্কে কিছু জান? এটা কি মেরামত করা সম্ভব হয়েছে?

মাঝে মাঝে আমার মনে হয় স্পেস টেলিস্কোপ মহাবিশ্বের চোখ। কারণ যে চোখ পুরো মহাবিশ্বকে দেখতে পায়, তাকে অনায়াসে মহাবিশ্বের চোখ বলা

যায়। তুমি কি বুঝতে পারছ এর দ্বারা আমি কী বলতে চাইছি? আসলে মহাবিশ্বই এই অবিশ্বাস্য যন্ত্রটা উৎপন্ন করেছে।

যে রূপকথার গল্পের মধ্যে আমরা জীবন যাপন করছি এবং তার অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য আমরা অতি স্বল্প সময় পাব, তুমি কি জান সেই রূপকথার গল্পটি কী? হয়তো স্পেস টেলিস্কোপ এই রূপকথার গল্প আরো ভালোভাবে বুঝতে আমাদের সাহায্য করতে পারবে। আমরা মানব জাতি কী তার উত্তর হয়তো লুকিয়ে আছে ছায়াপথের ওপারে।

আমার বিশ্বাস এই চিঠির মধ্যে ধাঁধা শব্দটি বহুবার ব্যবহার করেছি। মহাবিশ্বকে বোঝার চেষ্টাকে কোনো জটিল গোলকধাঁধার সমাধানের চেষ্টার মতো। যদিও সম্ভবত এই ধাঁধাটা মানবিক বা যৌক্তিক যার সমাধানটা নিজের মধ্যেই খুঁজতে হবে। অন্ততপক্ষে আমরা এখানে তো আছি। আমরাই মহাবিশ্ব।

সম্ভবত আমরা পূর্ণ বিকশিত হই নাই। মানবিক বিকাশের পূর্বেই মানুষের দৈহিক বিকাশের প্রয়োজন ছিল। হয়তো বিশ্বের বস্তুগত প্রকৃতি তার আত্মিক চেতনার বস্তুগত রূপমাত্র।

আমার একটা উদ্‌ভ্রান্ত ধারণা আছে: নিউটন হঠাৎ করেই বৈশ্বিক মহাকর্ষের অস্তিত্ব অনুধাবন করেছিলেন। খুব ভালো। ডারউইন স্বতঃস্ফূর্তভাবে পৃথিবীতে জৈবিক বিকাশের ধারণা লাভ করেছিলেন। দারুণ! তারপর আইনস্টাইন আবিষ্কার করলেন বস্তু, শক্তি ও আলোর গতির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক। চমৎকার! আর ১৯৫৩ সালে ক্রিক এবং ওয়াটসন উদ্ভিদ ও প্রাণীর জেনেটিক উপাদানের অনু ডিএন এর নির্মাণকৌশল প্রদর্শন করলেন। অসাধারণ! তারপর কেউ হয়তো কল্পনা করতে পারবে এমন এক দিনের যেদিন কোনো এক মানব সন্তানের মাথায় বিদ্যুৎ চমকের মতো বিশ্বের রহস্য ছবির মতো ভেসে উঠবে। আমার মনে হয় এ ধরনের কিছু একটা হঠাৎ করেই ঘটে যাবে। (আমার বাসনা যদি আমি এই ঘটনার কোনো সংবাদপত্রের হেডলাইন লেখক হতে পারতাম)! তবে আরো কিছু কথা আছে বলার মতো।

হাব্‌ল স্পেস টেলিস্কোপ! আবার ঐ কথায় আসা যাক। এখন আমি পুরোপুরি নিশ্চিত বাবার মনে যে বিরাট প্রশ্ন তার সাথে মহাশূন্যের কোনো সম্পর্ক আছে।

আমি বিছানা ছেড়ে উঠে জানালা দিয়ে তাকালাম। তখনও কঠিন তুষারপাত হচ্ছে। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না, আমি ভাবলাম। এমনকি গোটা পৃথিবীও যদি তুষারে ঝাপসা হয়ে যায় তাহলেও হাব্‌ল স্পেস টেলিস্কোপ আমাদের আকাশ গঙ্গার বাইরে লক্ষ কোটি আলোকবর্ষ দূরের বস্তুপুঞ্জের স্ফটিক-শুভ্র ছবি তুলে পাঠাতে পারবে। আর চব্বিশ ঘণ্টাব্যাপী ওটা এই কাজটাই করে চলেছে। ইতিমধ্যেই সে লক্ষ লক্ষ ছবি পাঠিয়েছে এবং বেশ কয়েক হাজার মহাশূন্যের বস্তুপিন্ডের

বিশ্লেষণধর্মী তথ্য পাঠিয়েছে। হাব্‌ল টেলিস্কোপ প্রতিদিন সে সব তথ্য পাঠাচ্ছে তা দিয়ে অনেক কম্পিউটার ভরে গিয়েছে।

কিন্তু বাবা কেন আবার স্পেস টেলিস্কোপের কথায় ফিরে গেল? আমি বুঝতে পারছিলাম না কমলা সুন্দরী এর সাথে কীভাবে সম্পর্কিত হতে পারে। তবে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল বাবা হাব্‌ল স্পেস টেলিস্কোপের ব্যাপারে জানত। সে অনুধাবন করতে পেরেছিল মানব জাতির জন্য এটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করার আগেই তার এই বোধ জন্মেছিল। এটাই ছিল তার সর্বশেষ কৌতূহলের বিষয়।

মহাবিশ্বের চক্ষু! হাব্‌ল স্পেস টেলিস্কোপ নিয়ে আমি এভাবে ভাবিনি। আমি এটাকে দেখেছি মহাবিশ্বের দিকে মানব জাতির খোলা জানালা রূপে। তবে স্পেস টেলিস্কোপকে মহাবিশ্বের চক্ষু রূপে বর্ণনা করাটা মোটেই অতিরঞ্জন নয়।

সম্ভবত অসলোর সাথে আইডস্‌ভল প্রথম সংযোগ রেলওয়ে স্থাপনের পর নরওয়েতে যেমন প্রশংসার তুফান উঠেছিল, সেটার মধ্যে কিছুটা অতিরঞ্জন ছিল। নরওয়ের জনসংখ্যা পৃথিবীর জনসংখ্যার এক হাজার ভাগের একভাগ মাত্র। আর ১৮৫০ সালে অসলো আইডস্‌ভল রেলপথ মাত্র দশ হাজার ভাগের এক ভাগের সেবা দিতে পেরেছিল। আর হাব্‌ল স্পেস টেলিস্কোপের সাহায্যে পৃথিবীর সব মানুষ মৃত্যুর মাত্র ছয় মাস আগে যখন এটাকে ভূকেন্দ্রিক কক্ষ পথে স্থাপন করা হয়, তখন এর ব্যয় দাঁড়ায় ২.২ বিলিয়ন ডলার। আমি হিসাব করে দেখেছি সমগ্র বিশ্বের জনসংখ্যার মাথাপিছু ব্যয় দাঁড়ায় চল্লিশ সেন্ট বা চার ক্রোনার। আমার মনে হয় গোটা বিশ্ব পরিভ্রমণের মাশুল হিসাবে অনেক কম। তুলনামূলক বিচারে অসলো থেকে আইডস্‌ভলের ফিরতি টিকিটের বর্তমান মূল্য দুইশত ক্রোনার। এটাকে সস্তা বলা চলে না। আর সর্বসাধারণের সম্মতি থাকলে এ ব্যাপারে আমরা নরওয়ে সরকারের কাছে এ নিয়ে নালিশ জানাতে পারি। (আমি নরওয়ের রেল কর্তৃপক্ষ বা তৎকালীন লিলিপুটীয় অসলো আইডস্‌ভল ট্রেনের প্রতি কোনো অশ্রদ্ধা প্রকাশ করছি না। তবে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি হাব্‌ল স্পেস টেলিস্কোপ মানব জাতির জন্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে রেললাইনের ধারে বসবাসরত মানুষের কাছে। হাব্‌ল্ স্পেস টেলিস্কোপকে মহাবিশ্বের চক্ষু বলাটা মোটেই অতিশয়োক্তি নয়। আমার বাবা কোনোক্রমেই এমনটা ভাবেননি, এমন কি সে নতুন লেন্স লাগানোর ব্যাপারটাও জেনে যেতে পারেনি)।

সে লিখেছে, হাব্‌ল স্পেস টেলিস্কোপ হল কসমিক সেন্সরী অর্গান। আমার ধারণা সে কী বলতে চায়– তা আমি বুঝেছি, আমরা সম্ভবত বলতে পারি, আমাদের গ্রহের চারপাশে কক্ষপথে হাব্‌ল স্পেস টেলিস্কোপ স্থাপন একটি ক্ষুদ্র পদক্ষেপ, কারণ ১৯৯০ সালে আমাদের ছিল শক্তিশালী টেলিস্কোপ ও স্পেস শাট্‌ল্। তবে বৈশ্বিক প্রেক্ষিতে এটা ছিল এক বিরাট পদক্ষেপ। কারণ এটা ছিল সমগ্র মহাবিশ্বের

পক্ষ থেকে মানুষের মহাবিশ্বকে বোঝার এক প্রচেষ্টা। এর চেয়ে একটুও কম নয়। *কারণ মহাবিশ্বের বাইরে এক চক্ষু সংযোজন করতে পনের বিলিয়ন বছর কেটে গেছে, যে চক্ষু দিয়ে সে নিজেকে দেখতে পাবে।* (এই বাক্যটা লিখতে আমার পুরো একঘণ্টা সময় লেগেছে। সে জন্যই এটা আমি মোটা হরফে লিখলাম।

ভাবলাম, আমি নিকটবর্তী হচ্ছি। আমি দ্রুত তালে পড়ে চললাম, আর শীঘ্রই আমি আমার জন্ম প্রত্যক্ষ করলাম। খুবই দর্শনীয় ব্যাপার, অধিকাংশ শিশুরাই জন্মে ককটেল পার্টির মধ্যে।

ঠিক আছে বাবা, তুমি বলে যাও। আমি কোনো বাধা দেব না। তুমি জিজ্ঞেস করেছ হাব্‌ল স্পেস টেলিস্কোপের হালহকিকৎ কী, আর এখন অন্ততপক্ষে সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি।

এখন থেকে সংক্ষেপে বলব। আমাকে তা করতে হচ্ছে, কারণ সময় দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। আগামীকাল আমার একটা গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকার আছে। কাজেই মা তোমাকে নার্সারী স্কুলে নিয়ে যাবে।

আমরা এ্যাডামস্টুয়েনের ফ্লাটে চার বছর একত্রে বাস করি। ভেরোনিকার আর্ট স্কুলের পাঠ শেষ হয়, তারপর সে ছবি এঁকে চলে। তুমি তো জান, তার পর সে কলেজে আর্টের ওপর শিক্ষকতা শুরু করে। নতুন পাশ করা ডাক্তার হিসাবে আমি হাউস অফিসারের ছোটখাটো একটা কাজ পেয়ে যাই। এর অর্থ আমাকে একটা হাসপাতালে দু'বছর কাজ করতে হবে।

তুমি এও জান তোমার দাদু ও দাদীমা দুজনেই টনস্‌বার্গে জন্মেছিল। তাদের একটা স্বপ্ন ছিল অবসর গ্রহণের পর ওরা শহরে বাস করবে, একদিন আমাদের বলল লর্ড বিয়েন ডিস্ট্রিক্টে ওরা একটা শান্ত মনোরম বাড়ি কিনেছে। আমার ভাই, তোমার চাচা আইনার সমুদ্রে চলে যায়। সম্ভবত সে একটা অসুখী প্রেমঘটিত ব্যাপার থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছিল। এতে করে ব্যাপারটা দাঁড়ায় হামলেভেইয়েনের বিশাল বাড়িটাতে আমাকে আর ভেরোনিকাকে থাকতে হল। প্রথম দিকে আমাকে বাড়ি বন্ধক রেখে একটা মোটা অঙ্কের টাকা ধার নিতে হয়েছিল,তবে ইদানীং আয় উপার্জন কিছু বেড়েছে।

প্রথম বছরে হামলেভেইয়েনের বাগানে অনেক কাজ করতে হয়েছিল। বাগানে দুটি আপেল, একটা নাসপাতি আর কয়েকটা চেরী গাছ ছিল। আমাদের কাজ হল গাছগুলো ছাটাই এবং সার প্রয়োগ করা। পুরনো র‍্যাপসবেরী ঝোপটাও রেখে দিয়েছিলাম। গুজবেরী, ব্লাককুরান্ট ও রূবার্ব ঝাড়গুলোও কেটে সাফ করতে মন টানেনি। তবে আমরা নতুন করে লাগিয়েছিলাম লাইলাক, রডাডেনড্রন এবং হর্টেন্সিয়া। এসবের দায়িত্ব ভেরোনিকার। আমার সারাজীবন

আমি এই বাগানের সাথেই কাটিয়েছিলাম। এখন থেকে এটা ওর একার হবে। হয়তো কোনো গ্রীষ্মের এক দিনে বাগানে ওর ঈজেল বসিয়ে গাছ পালার ছবি আঁকবে।

একদিন আমরা যখন র‍্যাপস্‌বেরী সংগ্রহ করছি, তখন দেখলাম একটা মস্ত ভোমরা ফ্লোভার ফুল থেকে উড়ে উঠে দারুণ বেগে উধাও হয়ে গেল। আমার মনে হল ভোমরাটা জাম্বো জেটের চেয়ে বেশি গতিতে উড়ে গেল, অবশ্য যদি ওর শরীরের ওজন বিবেচনা করা যায়। কথাটা আমি ভেরোনিকাকে বললাম, আর আমরা একটা সরল হিসাব নিকাশ করলাম। আমরা হিসাব করে দেখলাম একটা ভোমরার ওজন বিশ গ্রাম এটা ঘণ্টায় দশ কিলোমিটার বেগে চলে। তারপর আসা যাক জাম্বো জেট বিমানের কথায়। এর গতি ঘণ্টায় ৮০০ কিলোমিটার। অন্য কথায় ভোমরার চাইতে আটগুণ বেশি। কিন্তু বিশ গ্রামের আশি গুণ মাত্র ১.৮ কিলোগ্রাম। ভেরোনিকা ও এবং আমি এক মতো হলাম যে বোয়িং ৭৪৭ এর ওজন এর চাইতে বেশি। শরীরের ওজনের বিচারে ভোমরার গতি হাজার গুণ বেশি। আর বোয়িং ৭৪৭ এর থাকে চারটি জেট এঞ্জিন। ভোমরার তা নাই। ভোমরা চলে বাতাসের শক্তিতে! আমরা হেসে উঠলাম। হাসলাম কারণ ভোমরা ততো জোরে উড়তে পারে না, হাসি আরো এজন্য যে আমরা হামলেভেইয়েনে বাম্বলবী (ভোমরা) রোডে বাস করি।

ভেরোনিকাই আমাকে শিখিয়েছে প্রকৃতির সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়গুলির দিকে দৃষ্টি দিতে, আর প্রকৃতিতে দেখার মতো এতো কিছু আছে! আমরা একটা এ্যনিমোন বা ভায়োলেট তুলে নিয়ে মিনিটের পর মিনিট পর্যবেক্ষণ করতে পারি, গোটা পৃথিবীটা কি বিশাল রূপকথার কাহিনী নয়?

আজ যখন আমি লিখছি, তখন সেদিনের র‍্যাপসবেরী তোলার মুহূর্তের সেই ভোমরার উড়ে যাওয়ার কথাটা মনে পড়ে কেমন যেন বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। আমরা এমনি ভেসে আসা, গিয়র্গ, এমনি মুক্ত বন্ধনহীন। আমার মনে হয় তুমিও উত্তরাধিকারসূত্রে এমন এক মন পেয়েছ যা ছোটখাটো রহস্যের সাথে সম্পৃক্ত। এগুলি তারকা ও ছায়াপথের চাইতে কম চিন্তা উদ্দীপক নয়। আমার মনে হয় একটা ভোমরা তৈরি করতে কৃষ্ণ গহ্বর তৈরির চাইতে মোটেই কম বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না।

আমার জন্য এই পৃথিবী যাদুর খেলা। শৈশব থেকেই আমি এমনটাই ভেবে আসছি অসলোর রাস্তায় কমলা সুন্দরীর ওপর নজরদারী শুরু করারও অনেক আগে থেকে। এখনও বিশ্বাস করি আমি এমন কিছু দেখেছি, অন্যে যা দেখেনি। সাদামাটা কথায় এর ব্যাখ্যা দেয়া কঠিন, এই যে এত সব প্রাকৃতিক নিয়মের ছড়াছড়ি, অভিব্যক্তিবাদ, অনু, ডিএনএ পরমাণু, জীবরসায়ন স্নায়ুকোষ ইত্যাদি, এসব আধুনিক হাঙ্গামা শুরুর আগের পৃথিবীর কথা ভাব, এসব ঘোট পাকাতে

শুরুর আগে, মহাশূন্যে বিক্ষিপ্ত বস্তুনিচয়ের গ্রহরূপ ঘনীভূত হওয়ার আগে, মানবদেহ যখন হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, কিডনি, লিভার, মস্তিষ্ক, রক্তসংবহনতন্ত্র। পেশী, পাকস্থলী; ক্ষুদ্রান্ত্র ইত্যাদি যন্ত্রাংশে বিভক্ত হয়নি তখনকার কথা। আমি সে সময়ের কথা বলছি যখন মানব ছিল এক নিটোল গর্বিত মানব, কমও নয়, বেশিও নয়। তখন পৃথিবী ছিল এক ঝলমলে রূপকথার গর্জন।

হঠাৎ ঝোপ থেকে লাফিয়ে বের হয় এক বল্গা হরিণী, ভোমরার দিকে সাগ্রহে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকে, তারপর আবার হারিয়ে যায়। কেমনতর আত্মা এই প্রাণীটিকে গতিশীল করে? কোন্ অপরিমেয় শক্তি বিচিত্র পুষ্পরাজিকে রামধনু রংয়ে সাজিয়ে দেয়, অগণিত তারার ঝালর বাতিতে আকাশকে করে বর্ণিল।

প্রাকৃতিক বস্তুনিচয়ের প্রতি এই স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতিই দৃশ্যমান রূপকথার গল্পে, ব্রাদার্স গ্রীমের গল্পে এই অনুভূতি পরিস্ফুট। তুমি ওগুলো পড়ে দেখো, গিয়র্গ। আরো পড়ো আইসল্যান্ডের লোককাহিনী, গ্রীক ও নর্স পুরাণ কথা, পড়ো ওল্ড টেস্টামেন্ট।

পৃথিবীর দিকে চোখ মেলে তাকাও, গিয়র্গ, পদার্থ বিদ্যা আর রসায়ন দিয়ে নিজেকে ভরে ফেলার আগেই পৃথিবীকে ভালো করে দেখে নাও।

এই মুহূর্তে হয়তো ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ হার্ভেংগারভিডা আধিত্যকায় বল্গা হরিণের এক ঝাঁক চষে বেড়াচ্ছে। রোন নদীর দুই খাড়ির মাঝে ইলেদ্যলা কারমেগে হয়তো হাজার হাজার উজ্জ্বল লাল ফ্লেমিংগো বাসা বানাচ্ছে। আফ্রিকার সাভানায় হয়তো যাদুকরী গাজালা হরিণের দল লাফিয়ে বেড়াচ্ছে, দক্ষিণ মেরুর বরফাচ্ছন্ন উপকূলে হয়তো হাজার হাজার কিং পেঙ্গুইন পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে শব্দের ঝংকার তুলছে, সে শব্দ বেদনার নয়, তারা আনন্দের মাতম করছে, তবে একমাত্র সংখ্যাটাই বিবেচ্য নয়। হয়তো একক এক ভাবুক একক হরিণ দেবদারু বনের মধ্যে থেকে মাথা বের করে তাকাচ্ছে। গত বছর এই হরিণেরই একটা পথ ভুলে হামলেভেইয়েনে চলে এসেছিল। ফিয়েলোস্টোলেনের বোর্ডিং হাউসে একটা মেরুমুষিক ঢুকে পড়েছিল। টন্স্বার্গের দূর উপকূলে একটা পেটমোটা সীলমাছ থপ করে গড়াগড়ি দিচ্ছিল।

প্রকৃতি অলৌকিক নয় একথা আমাকে বলো না। পৃথিবী এক রূপকথার গল্প নয় একথাও বলো না। যে এটা বুঝতে পারে নি সে গল্পটা শেষ হওয়ার আগে আর বুঝতে পারবে না। তারপর চোখের ঠুলি ছিঁড়ে ফেলে বিস্ময়ে চোখ কচলাবার একটা শেষ সুযোগ আসবে, সেটা হবে অন্তিম সুযোগ। পরম বিস্ময়ের মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে শেষ বিদায় নেয়ার।

আমি যা বলার চেষ্টা করছি, তা কি তুমি বুঝতে পারছ, গিয়র্গ? ইউক্লিডের জ্যামিতির পাতা থেকে অথবা পরমাণুর পর্যায়সারণী থেকে চোখ সরিয়ে নিতে

কারো চোখই কখনও অশ্রুসিক্ত হয়নি। ইন্টারনেট অথবা ধারাপাতের পাতা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিতেও কারো চোখ রক্তিম হয়নি। তবে যখন তুমি রূপকথার কাহিনী জীবন থেকে বিদায় নিচ্ছ, তখন তা হবে। সত্যিকারের আপন ভাবতে তেমনি অল্প কজন লোকের কাছ থেকে তোমাকে বিদায় নিতে নেয়া।

মাঝে মাঝে আমি ভাবি ধারাপাত আবিষ্কার বা আধুনিক পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন আবিষ্কারের আগে যদি আমার জন্ম হত, অর্থাৎ আমরা যখন নিজেকে সবজান্তা ভাবতে শুরু করেছি, অর্থাৎ প্রকৃত যাদুর দুনিয়া। আমি যখন কম্পিউটারে বসে এসব লিখছি তখন আমার এমনটাই মনে হয়েছে। আমি নিজে একজন বিজ্ঞানী আমি কোনো বিজ্ঞানকেই বাতিল করে দিতে চাই না,তবে আমার মরমী দৃষ্টিভঙ্গিতে পৃথিবী এক জীবসত্তা। আমি নিউটন বা ডারউইনকে জীবনের রহস্য কেড়ে নিতে দিইনি (তুমি হয়তো এসব চিন্তাকে আধুনিক বলে নাও ভাবতে পার)।

তোমাকে একটা গোপন রহস্যের মধ্যে নিয়ে যেতে চাই: চিকিৎসা বিজ্ঞান অধ্যয়নের পূর্বে আমার দুটি বিকল্প পরিকল্পনা ছিল। হয় আমি লেখক হতে পারতাম, যারা কথার মালা গেঁথে পৃথিবীকে ভূষিত করতে চায়, তবে এ কথাটা ইতিপূর্বেই আমি উল্লেখ করেছি। অথবা আমি ডাক্তার হতে পারতাম, যারা জীবনের সেবা করে, নিরাপত্তার খাতিরে আমার ডাক্তারীই ছিল প্রথম পছন্দ।

আমার লেখক হওয়া হয় নাই, তবে তোমাকে এই চিঠিটা লিখে যাচ্ছি।

সার্জারীর ক্লাশ শেষে বাড়ি ফেরা সেই কমলা সুন্দরীর কাছে। যে বাগানে বসে চেরী ফুলের ছবি আঁকছে। আমার স্বপ্নের সাথে যেন ওর ছবি সেতুবন্ধ রচনা করছে। একদিন বাড়ি ফিরে ওকে বাগানে ছবি আঁকতে দেখে উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম যে ওকে পাঁজা কোলা করে তুলে নিয়ে এক্কেবারে শয়নকক্ষে চলে এলাম। ওহ্, ওর কি প্রচণ্ড হাসি। তারপর আমরা পরস্পরে মিশে গেলাম। তোমাকে আমাদের সেই আনন্দের মাঝে নিয়ে যেতে মোটেই সংকোচ বোধ হচ্ছে না। তা হবেই বা কেন? কারণ এটা গল্পের একটা সংযোগ সূত্র।

আমাদের সম্পর্কের নতুন মোড় নেয়ার কয়েক মাস পরে আমরা প্রথম যে সিদ্ধান্তটা নিলাম, তা হল আমরা জন্মনিয়ন্ত্রণ করব না। সেই অবস্থার কোনো পর্যায়েই তোমার সৃষ্টি।

হামলেভেইয়েনে আমাদের বসবাসের আঠার মাস পরে তোমার জন্ম, গিয়র্গ। প্রথম বার যখন তোমাকে আমার বাহুবন্ধনে গ্রহণ করলাম, তখন আমার ভীষণ গর্ব। তুমি আমার পুত্র সন্তান। তুমি যদি কন্যা সন্তান হতে তাহলে তোমার নাম অনিবার্যভাবেই হত র‍্যানভিগ।

তোমার জন্মের পর ভেরোনিকা ভীষণ দুর্বল ও ফ্যাকাশে, তবে সেও দারুণ সুখী। এর চেয়ে আনন্দের আর কী হতে পারে। এবার সম্পূর্ণ নতুন এক অধ্যায়ের শুরু হল নতুন নিয়ম কানুন নিয়ে।

তোমাকে আর একটা গোপন রহস্যের কথা বলব। আমার ছাত্রবন্ধু হাসপাতালে ডাক্তার হিসাবে কাজ করত। সে শ্যাম্পেনের গ্লাস হাতে নিয়ে নবজাতকের মা-বাবাকে অভিনন্দন জানাবার জন্য ডেলিভারী রুমে এসে ঢুকল। এটা নিয়মসিদ্ধ নয়। তবে আমরা তিন জনই তোমার নতুন জীবনের শুভ কামনায় টোস্ট করলাম। অবশ্য তুমি শ্যাম্পেনের ভাগ পাওনি। তবে তোমাকে ভেরোনিকা বুকে তুলে নিয়ে কয়েকটা চুমুক দিয়ে নিল।

তবে সেবার যখন ভেরোনিকাকে নিয়ে সেডিল বিমান বন্দরে যাচ্ছিলাম, তখন আমরা পয়ঃপ্রণালীতে একটা মরা কবুতর দেখেছিলাম। এটা ছিল অমঙ্গলের নিশানা, সম্ভবত রূপকথার সব নিয়ম মেনে না চলার ফল ছিল এটা।

তোমার কি মনে আছে এবার ঈস্টারে আমরা কেবিনে গিয়েছিলাম? তোমার বয়স ছিল ঠিক সাতে তিন বছর, না, আমার মনে হয় তুমি সব কিছু ভুলে গেছ। তুমি যদি মেডিসিন পড়ো, তাহলে তার সাথে তোমাকে সামান্য মনস্তত্ত্বও পড়তে হবে। চার বছর বয়স হওয়ার আগের ঘটনা তোমার কিছুই মনে থাকার কথা নয়।

আমার বেশ মনে আছে আমরা কেবিনের দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে একটা কমলা ভাগ করে খাচ্ছিলাম, আর ভেরোনিকা সেটার ভিডিও করছিল, যেন সে বুঝতে পারছিল কোনো একটা কিছু সমাপ্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তুমি কি তাকে জিজ্ঞেস করবে, ভিডিওটা এখনও আছে কিনা? হয়তো বলবে এটা বের করা বেদনাদায়ক, তবু জিজ্ঞেস করে দেখো।

ঈস্টারের পরে আমি জানতে পারলাম আমি গুরুতর অসুস্থ। ভেরোনিকা বিশ্বাস করেনি, তবে আমি জানতাম। আমি লক্ষণ দেখে বেশ বুঝতে পারতাম। রোগ নির্ণয়ে আমি বেশ পটু ছিলাম।

তারপর আমি এক সহকর্মীর কাছে গেলাম, ঐ লোকটা, যে তোমার জন্মের সময় শ্যাম্পেন নিয়ে এসেছিল। প্রথমে সে রক্তের কয়েকটা পরীক্ষা নিল। তারপর সে যে পরীক্ষাটা নিল তার নাম সিটি স্ক্যান। এটা এক ধরনের এক্সরে পরীক্ষা এবং সে আমার সাথে সম্পূর্ণ এক মত হল। পেশাগত মতামতের ক্ষেত্রে আমাদের সাদৃশ্য ছিল।

এখন জীবন সম্পূর্ণ বদলে গেল। এটা ভেরোনিকা ও আমার জন্য এক মহা বিপর্যয়। তবে তোমাকে এই নৈরাশ্য থেকে যতদিন সম্ভব দূরে রাখতে চেয়েছি। তবু খুব দ্রুত কিছু নতুন নিয়ম কানুন চালু করতে হল। আশা-আকাঙ্ক্ষা, ধৈর্য

ক্ষতি ইত্যাদি শব্দগুলি একটা নতুন মাত্রা লাভ করল। আগামী বছরগুলিতে আমরা প্রতিদিন একসাথে থাকার প্রতিশ্রুতি আর রক্ষা করতে পারছি না। পরস্পরকে আর নতুন কোনো প্রতিশ্রুতিও দিতে পারছি না, হঠাৎ করেই যেন আমরা অত্যন্ত দরিদ্র, নিঃস্ব হয়ে পড়লাম। হৃদয় উষ্ণকারী সর্বনাম 'আমরা'র মধ্যে যেন ফাটল ধরল। একে অপরের কাছে কোনো দাবী নিয়ে হাজির হতে পারছিলাম না, সামনের অনাগত দিনের কোনো প্রতিশ্রুতির অংশীদার হতে পারছিলাম না।

এ পর্যন্ত পড়ার পর তুমি আমার জীবন সম্বন্ধে অনেকটা বুঝতে পারছ। তুমি জান আমি কে। এটা তুলে ধরা আমার জন্য অনেকটা লাভের।

একভাবে বলতে গেলে তুমি অনেকের চাইতে আমাকে বেশি বুঝতে পারছ, যদিও তোমার চার বছর বয়স হওয়া অব্দি আমাদের তেমন কোনো কথা হয়নি। এই চিঠিতে তোমার সাথে যেমন খোলাখুলি কথা বলছি, তেমনটা কারো সাথেই বলা সম্ভব হয়নি। কাজেই তুমি বুঝতে পারছ এই নতুন নিয়মগুলি মেনে চলা আমার জন্য কতটা কঠিন ছিল। আমি জানতাম কী ঘটতে যাচ্ছে, আর ধীরে ধীরে তোমাকে ও কমলা সুন্দরীকে ছেড়ে যাওয়ার ভাবনটার সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে হচ্ছে। তবে গিয়র্গ, এমন কিছু কথা আছে যা তোমাকে জিজ্ঞেস করতেই হবে। আমার জন্য আর অপেক্ষা করা প্রায় অসম্ভব, এবার বর্ণনা করতে চাই সপ্তাহখানেক অগে হামলেভেইয়েনে আসলে কী ঘটেছিল।

সকালের দিকে ভেরোনিকা স্কুলে বাচ্চাদের কমলা আঁকানো শেখাচ্ছিল। আমি ওকে বলেছিলাম সারাদিন আমার সাথে বাড়িতে থাকার দরকার নাই। তুমি আর আমি একসাথে বাড়িতে প্রাতরাশ সারব। তারপর তোমাকে নার্সারী স্কুলে নিয়ে যাব, তারপর বাড়িতে এসে কম্পিউটারে তোমার জন্য এই লম্বা চিঠি লেখার কাজটা করব। অধিকাংশ সময় আমাকে ঘরের মধ্যে পা টিপে টিপে চলাফেরা করতে হয় যাতে তোমার ট্রেন সাজানোতে বিঘ্ন না ঘটে। কোনো কিছু নড়চড় হলে সেটা অবশ্যই তোমার চোখে পড়বে।

মাঝে মাঝে এসময়টাতে আমাকে একটু ঘুমিয়ে নিতে হয়, এ কারণে নয় যে আমি অসুস্থ, বরং আমি রাতে ঘুমুতে পারি না, সে কারণে, সে সময় সমস্ত ভাবনা আমার মাথায় ভিড় করে আসে, আর এগুলোই আমাকে দারুণ যন্ত্রণা দেয়। যখনই নিজেকে নিদ্রার কোলে সমর্পণ করতে চাই, তখনই বীভৎস সব অপ্রীতিকর রহস্য, সেই বিপুলায়তন ভয়ংকর রূপকথার গল্প, যার মধ্যে ভালো পরী নাই, আছে সব মূর্তিমান অমঙ্গল, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ অপদেবতা, ডাকিনী, যোগিনী। কাজেই রাতের বেলা ঘুমানোর চিন্তাটা বাদ দেয়াই ভালো, আর ভোরের আলো ফুটলেই কেবল সোফায় গা এলিয়ে দেয়া।

তুমি আর ভেরোনিকা বাসায় থাকলে আমার জেগে থাকতে তেমন কষ্ট হয় না, যখন বুঝতে পারি তোমরা আরামে ঘুমুচ্ছ মাঝে মাঝে ভেরোনিকাকে জাগাতে হয় আমাকে– তখন সে আমার সাথে বসে থাকে। মাঝে মাঝে আমরা দুজন কথাবার্তা বলি না। শুধুমাত্র এক সাথে বসে থাকি। আমরা দুজনে এক টুকরা রুটি আর পনির খাই, অবস্থা এমনি এক পর্যায়ে এসে গিয়েছিল গিয়র্গ। এগুলিই নতুন নিয়ম।

আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুধু হাত ধরাধরি করে বসে থাকতে পারি না। মাঝে মাঝে গোপনে ওর হাতের দিকে তাকাই, তার পর আমার হাতের দিকে, হয়তো শুধু একটা আঙুলের দিকে নয়তো শুধু নখের দিকে। কত দিন থাকবে আমার এই আঙুল, আমি ভাবি। অথবা ওর হাত আমার ঠোঁটে তুলে চুমু খাই।

আমি ভেবেছি, আজ যে হাতটা আমি ধরে আছি, সেই হাতটাই হয়তো আমার শেষ মুহূর্তে হাসপাতালের বিছানায় ধরা থাকবে, তারপর এক সময় খসে পড়বে। আমরা দুজনে সম্মত হয়েছি এমনটাই হবে, সে ইতিমধ্যেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এটা ভাবতে ভালোই লাগে। আর এটা অবর্ণনীয় এক দুঃখের কথা। এই বিশ্ব ছেড়ে আমি যখন নিঃশব্দে কেটে পড়ব তখন এই হাত থাকবে উষ্ণ, কমলা সুন্দরীর সেই হাত।

কল্পনা করত, গিয়র্গ, যদি এমনি একটা ধরার মতো হাত ওপারেও থাকত! কিন্তু ওপারের কথা আমি বিশ্বাস করি না। এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। সব কিছু অস্তিত্ববান শুধু সব কিছু শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত। তবে শেষ পর্যন্ত মানুষ যে জিনিসটি আঁকড়ে ধরে থাকে, তা হল হাত।

আমি বলেছি সবচেয়ে সংক্রামক যে জিনিস তা হল হাসি। তবে দুঃখও সংক্রামক হতে পারে। ভয় কিন্তু আলাদা। এটা তেমন বিনিময়যোগ্য নয় যেমনটা হাসি বা দুঃখ। ভয় সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ একটি জিনিস।

আমি ত্রস্ত, গিয়র্গ, আমার ত্রাস এই পৃথিবী থেকে নিক্ষিপ্ত হওয়ার। আমার ভয় আজকের এই সন্ধ্যার মতো সন্ধ্যা আর প্রত্যক্ষ করতে পারব না।

তবে এক রাতে তুমি জেগে উঠলে, সেই রাতের কথাই বলব। আমি সংরক্ষণাগারে বসে আছি, দেখি, তুমি তোমার রুম থেকে বেরিয়ে থপথপ করে হেঁটে আসছ বৈঠকখানার দিকে। তুমি চোখ কচলে চারদিকে তাকালে। সচরাচর তুমি উপর তলার ঘরে যাও, কিন্তু এবার তুমি বসার ঘরে এসে দাঁড়ালে, হয়তো সবগুলো বাতি জ্বালানো ছিল। সে কারণে, আমি বসার ঘরে গিয়ে তোমাকে তুলে নিলাম। তুমি বললে, ঘুম আসছে না। তুমি হয়তো শুনে থাকবে মা-বাবা গল্প করছে, তাদের ঘুম না আসা নিয়ে।

তাৎক্ষণিক দুঃখ পেলাম, অপরিমেয় আনন্দও হল তোমাকে পেয়ে। কারণ তোমার প্রয়োজন দারুণভাবে বোধ করছিলাম। কাজেই তোমাকে আবার ঘুমোনোর চেষ্টা করলাম না।

তোমাকে সব কথা বলার দারুণ তাগিদ বোধ করছিলাম, তবে আমি জানতাম আমি তা পারি না, তুমি অনেক ছোট, তবু তুমি আমাকে সান্ত্বনা দেয়ার মতো যথেষ্ট বড়। যদি তুমি শুধু জেগে থাকতে পারতে সেই রাতে আমার সাথে। কিছুক্ষণ বসে থাকার দারুণ ইচ্ছে হচ্ছিল। এসব রাতে আমি প্রায়ই ভেরোনিকাকে জাগিয়ে রাখতাম। এখন সে শান্তিতে ঘুমাতে পারছে।

আমি জানতাম বাইরে উজ্জ্বল তারকাখচিত আকাশ। সংরক্ষণাগার থেকে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম। সময়টা ছিল আগস্টের দ্বিতীয়ার্ধ। সম্ভবত এর আগে তুমি তারকাখচিত আকাশ দেখনি। অন্তত যে গ্রীষ্মের রাতগুলি পেছনে ফেলে এসেছি, তার আগের মতো নয়। তখন তুমি খুবই ছোট ছিলে। আমি তোমাকে পশমী জাম্পার আর ট্রাউজার পরিয়েছিলাম। আমি নিজেও জ্যাকেট পরে তোমাকে নিয়ে খোলা বারান্দায় গিয়ে বসেছিলাম। শুধু তুমি আর আমি। ভেতরের বাতিগুলি আগেই সুইচ অফ করেছিলাম, এখন বাইরেরগুলোও নিভিয়ে দিলাম।

প্রথমে আঙ্গুল তুলে দেখালাম পাতলা রূপালী চাঁদের দিকে। পূর্ব আকাশের নিচে এটা ঝুলে ছিল। এর কোণাগুলি ডানদিকে বেঁকে ছিল। কাজেই এটা ছিল ক্ষয়িষ্ণু চাঁদ। ব্যাপারটা তোমার কাছে ব্যাখ্যা করেছিলাম।

সবরকম নিরাপত্তাবেষ্টিত হয়ে তুমি আমার কোলে বসেছিলে। তোমার কাছ থেকে যতরকম আশ্বাস নির্গত হচ্ছিল তার সবটুকু আকণ্ঠ পান করছিলাম। তারপর আকাশে শামিয়ানায় যতসব গ্রহনক্ষত্র খচিত হয়েছিল তার সবগুলির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলাম। তোমাকে সব বিষয় সম্বন্ধে বলার এত ইচ্ছা হচ্ছিল, ইচ্ছা হচ্ছিল বলি সেই বিশাল চিত্রপটের কথা, আমরা, তুমি, আমি যার খণ্ডাংশ মাত্র। সেই রূপকথার গল্পের কিছু আইন কিছু নিয়ম আছে, যা আমরা জানি না, তবু সেগুলো আমরা মেনে নিতে বাধ্য হই।

আমি জানতাম অল্প দিনের মধ্যে তোমাকে ছেড়ে যেতে হবে, কিন্তু সেটা বলতে পারছি না। আমি জানতাম যে রূপকথার গল্পের অংশ তুমি আর আমি। সেখান থেকে আমাকে বিচ্যুত হতে হবে, তবে তোমার কাছে সেটা প্রকাশ করা যাবে না। তার বদলে তোমাকে তারার কথা শোনাতে শুরু করলাম। প্রথমে বলতে লাগলাম তুমি যেভাবে বুঝতে পার, যাতে বিষয়টার প্রতি তোমার আগ্রহ বাড়ে। তবে শীঘ্রই মহাশূন্যের বিশদ বৃত্তান্ত দিতে শুরু করলাম যেন তুমি এক বয়স্ক যুবক।

আর গিয়র্গ, তুমি আমাকে বলতে দিলে। তুমি আমার কথা বেশ উপভোগ করছিলে। যদিও তুমি আমার ওসব হেয়ালীপূর্ণ কথার বিন্দুবিসর্গ বুঝতে পারছিলে না। হয়তো আমি যতটুকু কল্পনা করছিলাম, তুমি তার চাইতে একটু বেশিই বুঝেছিলে। তুমি বাধাও দাওনি ঘুমিয়েও পড়নি। যেন তুমি বুঝতে পারছিলে আমাকে থামাতে পারবে না। সম্ভবত আঁচ করতে পারছিলে তোমার সাথে যে বসে আছে সে "আমি" নয়। বরং তুমি বসে আছ আমার সাথে। তুমি বসে আছ আমার বাবা।

আমি ব্যাখ্যা করলাম, এখন রাত কারণ পৃথিবী তার অক্ষের ওপর আবর্তন করে তার পিঠের দিকটা চলে গেছে সূর্যের দিকে। শুধুমাত্র সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময়ই আমরা বুঝতে পারি ভূগোলক আবর্তন করছে। তুমি হয়তো এটা বুঝতে পারছ, মাঝে মাঝে আমরা একটা ঘুমপাড়ানী গান গাই যার লাইনগুলো এরকম: *সূর্য এখন তার চোখ বুজছে, আর শিগ্‌গিরই আমিও বুজব...* তোমার কি ওটা মনে আছে?

আমি শুক্রের দিকে আঙ্গুল তুলে বললাম, এটা একটা গ্রহ যা পৃথিবীর মতোই সূর্যের চারদিকে পরিক্রমা করছে। বছরের এই সময়টাতে শুক্রকে পূর্ব আকাশে নিচুতে দেখতে পাই কারণ সূর্য তার ওপর কিরণ বর্ষণ করছে। যেমন করে পৃথিবীর ওপব, এরপর তোমাকে একটা গোপন তথ্য জানালাম। যতবারই আমি এই গ্রহটার দিকে তাকাই আমার ভেরোনিকার কথা মনে পড়ে যায়, কারণ ভেনাসের একটা প্রাচীর শব্দার্থ হল প্রেম।

তবে আকাশে আব যে সব আলোব বিন্দু দেখা যাচ্ছে, তার সবগুলোই তারকা। আমি ব্যাখ্যা কবে চললাম, ওরা সূর্যের মতো নিজেবা আলো দেয়, কারণ আকাশের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র তাবকাও এক একটা জ্বলন্ত সূর্য। তুমি কি জান এর উত্তরে তুমি কী বলেছিলে তুমি বলেছিলে: 'কিন্তু তারকারা সূর্যের মতো আমাদের উত্তাপ দেয় না।'

এটা ছিল এক অত্যাশ্চর্য গ্রীষ্ম, গিয়র্গ, আর তোমার সারা দেহে আমাদের তাপরোধী ক্রীম মাখিয়ে রাখতে হত। তোমাকে কাছে টেনে নিয়ে ফিসফিস করে বললাম: এটা শুধু এ কারণে যে আমরা অনেক অনেক অনেক দূরে।

আমি যখন লেখাটা লিখছি, তখন তুমি মেঝেব ওপর হাতড়ে হাতড়ে তোমার কাঠের ট্রেন সেটটা দিয়ে কিছু একটা বানাবাব চেষ্টা করছ।

আমার মনে হয়, এটাই দৈনন্দিন জীবন, এটাই বাস্তবতা। কিন্তু যে দবজা আমাদের বাস্তবতার দিকে নিয়ে গেছে, সেটা অত্যন্ত প্রশস্ত।

এখানে ছেড়ে যাওয়ার মতো অনেক কিছু আছে, পেছনে ফেলে যাওয়াব মতো এত কিছু!

একটু আগে তুমি আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করেছিলে কম্পিউটারে আমি কী লিখছি। আমি বলেছিলাম, আমার সর্বোত্তম বন্ধুর কাছে একটা চিঠি লিখছি।

হয়তো তোমার কাছে এটা বেখাপ্পা ঠেকেছে বন্ধুর কাছে চিঠি লেখার কথা বলতে আমার গলা এত ভারী কেন।

'এটা কি মা'র কাছে লিখছ? তুমি জিজ্ঞেস করেছিলে।

আমার বিশ্বাস আমি মাথা ঝাঁকিয়ে বলেছিলাম, 'তোমার মা আমার সত্যিকারের ভালবাসা, তবে সেটা সম্পূর্ণ ভিন্ন।'

'তাহলে "আমি" কী?' তুমি জিজ্ঞেস করেছিলে।

তুমি আমাকে সত্যিই ফাঁদে ফেলেছিলে। তবে আমি শুধু কম্পিউটারের সামনে তোমাকে কোলে তুলে নিয়েছিলাম, তোমাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলাম তুমি আমার সর্বোত্তম বন্ধু।

সৌভাগ্যবশত তুমি আর কোনো প্রশ্ন করনি। তুমি বুঝতে পারনি যে চিঠিটা তোমাকেই লিখা হচ্ছে। আমার ভাবতে অবাক লাগছিল হয়তো একদিন তুমি সত্যিই চিঠিটা পড়বে।

সময়, গিয়র্গ, সময় কী?

আমি ব্যাখ্যা করে চলি, যদিও জানতাম আমি যা বলছি তুমি বুঝতে পারবে না।

স্থানও খুব পুরনো, আমি বলি, সম্ভবত পনর বিলিয়ন বছর পুরনো। আর এখনও কেউ সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারেনি এর সৃষ্টি কীভাবে হয়েছিল। আমরা সবাই বাস করি এক বিশাল রূপকথার গল্পের মধ্যে যা কেউ বুঝতে পারে না। আমরা সবাই নাচি, খেলা করি, চেঁচামেচি করি হাসিতামাসা করি এমন এক পৃথিবীতে যাকে কেউ অনুধাবন করতে পারি না এই নৃত্য, এই অভিনয়, এটাই জীবন সঙ্গীত, আমি বলি। সর্বত্রই দেখি মানুষ, ঠিক যেমন সব টেলিফোনেই একই ডায়ালিং টোন শোনা যায়।

এই কথা শুনে তুমি ঘাড় ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকালে, সব টেলিফোনের ডায়ালিং টোন কথাটা তোমার মনে ধরেছে। তুমি ফোন তুলে নিয়ে কান লাগিয়ে কথা শুনতে খুব পছন্দ করতে।

তারপর গিয়র্গ, তোমাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই, যেহেতু এখন তুমি প্রশ্নটা বুঝতে পারবে। তোমাকে কমলা সুন্দরীর যে দীর্ঘ গল্পটা বলেছি, তার মূলেও আছে এই প্রশ্নটা।

আমি বলেছিলাম: 'কল্পনা কর তুমি এই রূপকথার গল্পের দোরগোড়ায় লক্ষ কোটি বছর আগে যখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হচ্ছিল। আর তখন তোমার নির্ধারণের ক্ষমতা দেয়া হল তুমি পৃথিবীতে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে জন্মাতে চাও কিনা। তুমি জানবে না তুমি কখন জন্মাবে, এও জানবে না তুমি কতদিন বেঁচে থাকবে, তবে

সেটা কোনোভাবেই কয়েক বছরের বেশি হবে না। তুমি যা জানবে তা হল, যদি পৃথিবীতে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে জন্মানোর স্বাধীনতা তোমাকে দেয়া হয়, তাহলে আরো একবার জন্মাবার এবং ইচ্ছামতো চলে যাওয়ার অধিকারও তোমার জন্মাবে। এটা তোমার অনেক কষ্টের কারণ ঘটাবে, অধিকাংশ লোকই মনে করে, এই মহান রূপকথার গল্পের জীবন এতই চমকপ্রদ যে এর শেষ হয়ে যাওয়ার চিন্তাটাও তোমার চোখে জল আনবে। এখানকার সব কিছুই এত সুন্দর যে, কোনো একদিন সময় ফুরিয়ে যাওয়ার চিন্তাটাও বেদনাদায়ক।

তুমি স্থির হয়ে আমার কোলে বসে রইলে। আর আমি বলে চললাম: আচ্ছা গিয়র্গ তুমি কোন্‌টা পছন্দ করতে, যদি কোনো উচ্চতর ক্ষমতাধর তোমাকে পছন্দ করার ক্ষমতা দিয়ে দিত? হয়তো আমরা কল্পনা করতে পারি এই মহান রূপকথার মাঝে হাসির কোনো গল্পের। তুমি কি কোনো নির্দিষ্ট সময়ে জন্মাতে চাইতে, সেটা ক্ষুদ্রই হোক অথবা লক্ষ বর্ষ ব্যাপীই হোক?

আমার মনে হয় আমি বারদুয়েক ভারী দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে কঠোরতর কণ্ঠে বলেছিলাম: নাকি তুমি এই খেলায় অংশই নিতে চাইতে না, কারণ নিয়মগুলিই তোমার পছন্দ হয়নি বলে?

তুমি তবু নিশ্চুপ আমার কোলে বসে ছিলে। আমার অবাক লাগে তখন তুমি কী ভাবছিলে। তুমি এক জীবন্ত অলৌকিকতা। আমার মনে হচ্ছিল তোমার খড়রঙা চুল থেকে ম্যান্ডারিন কমলার সুবাস আসছিল। তুমি রক্ত মাংসের এক জীবন্ত ফেরেশতা।

তুমি ঘুমিয়েও পড়নি, তবে কিছু বলওনি।

আমি নিশ্চিত তুমি আমার সব কথাই শুনেছ। হয়তো তুমি মনোনিবেশও করেছ। তবে তোমার মনের মধ্যে কী চলছিল তা অনুমান করতে পারিনি। আমরা ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে রইলাম। হঠাৎ যেন আমাদের দুজনের মাঝে এক দুস্তর গহ্বর দেখা দিল।

তোমাকে আরো কাছে টেনে নিলাম– তুমি হয়তো ভাবলে, তোমার যাতে ঠাণ্ডা না লাগে সেজন্যই এমন করছি। তারপর তোমাকে নামিয়ে দিলাম, গিয়র্গ, কারণ সেই মুহূর্তে আমি কাঁদতে শুরু করেছি। আমি ইচ্ছাকৃতভাবে এটা করিনি, নিজেকে সামলাবার অনেক চেষ্টা করেছি, তবে আমি কেঁদে চললাম।

গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ আমি এই প্রশ্নটা বারবার নিজেকে জিজ্ঞেস করেছি, যদি এই দৃঢ় বিশ্বাসের মধ্যে বাঁচতে পারতাম যে কোনো চরম আনন্দের মাঝেই আমার জীবনসূত্র কেটে দিতে পারতাম! আমরা এই পৃথিবীতে একবারই আসি। আমরা সেই বিশাল রূপকথার গল্পের মধ্যে ঢুকে পড়ি, শুধুমাত্র গল্পটাকে তার পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য!

ভালো কথা, আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি না আমার পছন্দ কোনটা। আমার ধারণা আমি কোনো শর্ত মানতে চাইতাম না। যদি এটা ক্ষণিকের যাত্রা হত তাহলে আমি প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করতাম এবং যথেষ্ট রুঢ়তার সাথেই। হয়তো আমি চিৎকার করে বলতাম উভয় সংকটটা এমন একটা অনাবশ্যক বোঝা, যে আমি এ নিয়ে কোনো কথাই আর শুনতে চাই না। ঠিক এই ভাবনাটাই ছিল তখন আমার মনে, তোমাকে সাথে নিয়ে ছাদে বসে বসে। আমি নিশ্চিত যে সম্ভব হলে গোটা ব্যাপারটাকে উল্টে দিতাম।

যদি আমার অধিকার থাকত এই রূপকথার গল্পে পা না দেয়ার, তাহলে কখনই বুঝতে পারতাম না আমি কী হারিয়েছি। তুমি কি বুঝতে পারছ আমি কী বোঝাতে চাইছি? মাঝে মাঝে আমরা মনুষ্য জাতি এমন প্রিয় কিছু হারাই যাতে মনে হয়, ওটা যদি একেবারে না-ই পাওয়া যেত তাহলেই ভালো হত। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ স্পেন থেকে ফিরে এসে যদি কমলা সুন্দরী প্রতিদিন একবার করে হওয়ার দেখা প্রতিশ্রুতি না রাখত, আর সব রূপকথার গল্পের ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। তুমি কি মনে কর সিন্ডারেলা যদি জানত মাত্র এক সপ্তাহের জন্য রানী হয়ে তাকে প্রাসাদে যেতে হবে তাহলে সে রাজী হত? তোমার কী ধারণা, রাজপ্রাসাদ থেকে ফিরে যদি সে আবার তার সৎ মা আর দজ্জাল সৎ বোনের মাঝে ফিরে যেত তাহলে কী হত?

তবে এখন তোমার উত্তর দেয়ার পালা, গিয়র্গ, মাঠ এখন তোমার দখলে। সেই তারকাখচিত রাতে তোমার সাথে ছাদে বসে বসে আমার মনে আসে, তোমাকে এই দীর্ঘ পত্র লেখার কথা। সেদিন যে কেঁদেছিলাম, তার কারণ এই নয় যে শীঘ্রই তোমাকে আর কমলা সুন্দরীকে ছেড়ে যেতে হচ্ছে। আমি কেঁদেছিলাম কারণ তুমি ছিলে খুবই ছোট। কেঁদেছিলাম কারণ তোমার আর আমার মাঝে ভালো করে কথা হল না।

আমি আবার জিজ্ঞেস করব: তোমার সামনে যদি দুটি বিকল্প থাকত তাহলে তুমি কী করতে? তুমি কি ক্ষণকালের জন্য পৃথিবীতে বাস করে সব কিছু ছেড়ে যেতে চাইতে, আর কখনও ফিরে না আসতে? নাকি বলতে না, ধন্যবাদ?

তুমি শুধু দুটি বিকল্পের একটিই বেছে নিতে পার। নিয়ম সেটাই। তুমি যদি জীবনকে গ্রহণ কর, তাহলে মৃত্যুকেও বরণ করে নিতে হবে।

তবে গিয়র্গ, প্রতিজ্ঞা কর, উত্তরটা দেয়ার আগে তুমি গভীরভাবে ভাববে সময় নিয়ে।

হয়তো এখন আমি খুব বেশি গভীরে চলে যাচ্ছি। হয়তো তোমাকে অসহায় করে ফেলছি। হয়তো এমনটা করার অধিকার আমার নাই। তবে তোমার সামনে যে প্রশ্নটা রেখে যাচ্ছি, তার উত্তরটা জানা আমার খুবই জরুরী, কারণ

এসবের মধ্যে তোমাকে নিয়ে আসার জন্য আমি প্রত্যক্ষভাবে দায়ী। তুমি কখনই পৃথিবীতে আসতে না যদি আমি সব কিছু প্রত্যাখ্যান করতে পারতাম।

এই পৃথিবীতে তোমাকে আনার জন্য আমি আংশিকভাবে দায়ী আর সেজন্য আমার মধ্যে একটা অপরাধবোধও কাজ করে। একভাবে বলতে গেলে আমিই তোমাকে এই জীবন দান করেছি, আরো সঠিকভাবে বলতে গেলে কমলা সুন্দরী এবং আমি। কিন্তু তারপর আমরা দুজনই তোমার কাছ থেকে এটা কেড়ে নেব। একটি ছোট্ট শিশুকে জীবন দান শুধুমাত্র পৃথিবীকে একটা মহৎ উপহার দেয়া নয়। এটা বোধের অগম্য এক উপহার ফিরিয়ে নেওয়াও বটে।

তোমার প্রতি আমাকে অবশ্য বিশ্বস্ত থাকতে হবে গিয়র্গ। আমি তোমাকে বলেছি যে সম্ভবত ক্ষণকালের জন্য বিশ্বব্যাপী রূপকথার কাহিনী পরিদর্শনের প্রস্তাবে আমাকে হয়তো 'না' বলতে হবে। আমি এটা কবুল করছি। ট্রেন চালু করতে সাহায্য করার জন্য আমার যেমন অপরাধ বোধ, তোমার চিন্তাও অনুরূপ কিনা।

আমি নিজেকে কমলা সুন্দরীর দ্বারা প্রলোভিত হতে দিয়েছি, আমি নিজেকে প্রেমের ফাঁদে সঁপে দিয়েছি, একটা সন্তান লাভের প্রলোভনের হাতে তুলে দিয়েছি। এখন অনুতাপ হচ্ছে, ক্ষতে প্রলেপ দেয়া দরকার। কিছুতেই ভেবে উঠতে পারি না, আমি কি তাহলে ভুল করেছি? প্রশ্নটা বিবেকের দ্বন্দ্বের মতো নিজেকে বিক্ষত করে, তারপর প্রশ্ন আসে প্রায়শ্চিত্যের।

তবে গিয়র্গ, এখানে একটা নতুন সংকট মাথা চাড়া দেয়, এবং সেই সংকট উত্তরণ হয়তো তেমন কঠিন নয় তেমন দুরূহ নয়– যেমন প্রথমটা। এত কিছু সত্ত্বেও তুমি যদি সেই প্রশ্নের উত্তর দাও, যদিও তা হয় স্বল্প সময়ের জন্য, আমার তাহলে এমন ভাবার অধিকার নাই, আমার না জন্মালেই ভালো হত।

তাহলে হিসাব বরাবর করার একটা সুযোগ সৃষ্টি হবে, একটা দিয়ে অন্যটার প্রশমন হবে। অবশ্য তোমার কাছে সেটাই আমার প্রত্যাশা। প্রকৃতপক্ষে আমার লেখাটার কারণও তাই।

যে বিরাট প্রশ্নটা তোমার সামনে রেখেছি তার সরাসরি জবাব দেয়া তোমার পক্ষে সম্ভব নয়, তবে তুমি উত্তরটা পরোক্ষভাবে দিতে পার। ভেরোনিকা, আমি এবং এক অশালীন ডাক্তার হাসপাতালে যেভাবে শ্যাম্পেন হাতে স্বাস্থ্য পান করে তোমার জন্মের শুভ উদ্বোধন করেছিলাম, তুমি ঠিক সেইভাবে তোমার জীবন যাপন করে উত্তরটা দিয়ে দিতে পার। শ্যাম্পেন ডাক্তার তোমার জন্য এক শুভ লক্ষণ, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।

এখন তুমি আমার এই সম্ভাষণ পত্র সরিয়ে রাখতে পার। এবার তোমার বাঁচার পালা।

আমার কথা বলতে গেলে, আগামী কাল আমি হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছি। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এক ঘটনা। এখন থেকে মা তোমাকে নার্সারী স্কুলে আনা নেয়া করবে।

এটাও আমাকে লিখতে হল। আর আমি অবশ্যই যোগ করব: আমি প্রতিশ্রুতি দিতে পারছি না যে আমি আবার হামলেভেইয়েনে ফিরে আসব।

গিয়র্গ। আমার একটা শেষ প্রশ্ন আছে: আমি কি নিশ্চিত হতে পারি যে এই জীবনের পরে আর জীবন নেই? আমি কি পুরো নিশ্চিত হতে পারি তুমি যখন এই চিঠি পড়বে তখন আমি অন্য কোথাও থাকব না? না, আমি সম্ভাবনাটা বাতিল করে দিতে পারি না। কারণ পৃথিবী অস্তিত্ববান, আর সম্ভাব্যতার সীমা ইতিমধ্যে অতিক্রান্ত হয়েছে। তুমি কি বুঝতে পারছ এ কথার দ্বারা আমি কী বোঝাতে চাইছি? পৃথিবী সম্বন্ধে এত অবাক কাণ্ড দেখেছি যে এই জীবনের পালা সাঙ্গ হওয়ার পর যদি আর এক জীবনের শুরু হয় তাহলে সেটা খুব বেশি আশ্চর্যের কিছু হবে না।

আমার মনে আছে দিন দুয়েক আগে তুমি আর আমি মিলে কম্পিউটারে গেম খেলে দুটি ঘণ্টা অপচয় করেছিলাম। মনে হয় খেলাটা তোমার চাইতে আমাকে বেশি আনন্দ দিয়েছিল। আমি মরিয়া হয়ে চাইছিলাম, আমার চিন্তার ক্ষণিক বিরতি। সেই খেলায় আমরা যতবারই মরছিলাম, ততবারই একটা নতুন স্ক্রীন ভেসে উঠছিল তারপর আবার শেষ। আমরা কীভাবে জানতে পারি, আমাদের আত্মার জন্যও একটা নতুন স্ক্রীন নাই? আমি অবশ্য মনে করি না আছে, অবশ্যই না। তবে অসম্ভব কিছুর স্বপ্ন! তার অন্য একটা নাম আছে। আমরা তার নাম দিয়েছি 'আশা'।

ছাদের সেই রাতের কথা আমার মনে পড়েছে! এটা আমার মজ্জায় প্রোথিত, আমার হৃৎপিণ্ডে আচড় কেটে রেখেছে, কথাগুলো পড়তে পড়তে বেশ কয়েকবার আমার ঘাড়ের লোম খাড়া হয়ে উঠছিল।

তখন পর্যন্ত আমি প্রায় সব কিছু ভুলেই ছিলাম, যদি আমি চিঠিটা না পড়তাম তাহলে তারকাখচিত রাতের কথা মনে করতে পারতামনা, তবে এখন সব কিছু জীবন্ত হয়ে আমার মনের পটে ভেসে উঠছে। সম্ভবত এটাই আমার বাবার একমাত্র সত্যিকারের স্মৃতি।

ফিয়েলোস্টোলেনে ওকে আমি মনে করতে পারি না। বহু চেষ্টা করেও সংগ্‌স্‌ভ্যান হ্রদের ধারে ওর সাথে বেড়ানোর স্মৃতিও তুলে আনতে পারছি না। তবে ছাদের ওপরের সেই মোহনীয় রাতের কথা বেশ মনে পড়ছে। অর্থাৎ আমার মনে

পড়ার ধরনটা একটু ভিন্ন। মনে পড়ছে এক রূপকথার গল্পরূপে অথবা চিত্রবিচিত্র স্বপ্ন রূপে।

আমি জেগে উঠেছিলাম। তারপর বাবা কনজারভেটরী থেকে বেরিয়ে এসে আমাকে শূন্যে তুলে নিল। সে বলেছিল আমরা উড়তে যাচ্ছি। আমরা এখন তারা দেখব, সে বলেছিল, আমরা এখন মহাশূন্যে উড়ে বেড়াব। সে কারণেই সে আমাকে গরম কাপড় পরিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু বাবা এখন আমাকে আকাশের তারা দেখাবে। তাকে এটা করতে হয়েছিল, কারণ এটাই আমাদের শেষ সুযোগ আর আমাদের এটা গ্রহণ করতেই হবে।

আর আমি জানতামও বাবা অসুস্থ ছিল। তবে আমি যে জানতাম সে সেটা জানত না। আর আমরা যখন আকাশযাত্রায় রত, হঠাৎ বাবা কাঁদতে শুরু করল। গোপন কথাটা মা আমাকে বলেছিল। সে বলেছিল বাবাকে হয়তো হাসপাতালে যেতে হতে পারে, তাই সে এখন মুষড়ে পড়েছে। আমার মনে পড়ে সেদিনই বিকালে মা আমাকে কথাটা বলেছিল। হয়তো সে কারণেই আমি জেগে উঠেছিলাম, সেজন্য হয়তো আমার ঘুম আসছিল না।

বাবার সাথে মহাশূন্যে যাত্রার সেই দীর্ঘ রাতের কথা আমার স্পষ্টই মনে পড়ে। মনে হয় আমি বুঝতে পেরেছিলাম বাবাকে আমাদের ছেড়ে চলে যেতে হতে পারে। তবে তাকে প্রথমে আমাকে দেখাতে হবে সে কোথায় যাবে।

আর তারপর কথাটা লিখতে আমার ঘাড়ের লোম খাড়া হয়ে উঠেছে– যখন আমরা মহাশূন্যে ভ্রমণ করছিলাম, বাবা হঠাৎ কাঁদতে শুরু করে দিল। আমি জানতাম সে কেন কেঁদেছিল, তবে সে জানত না, আমি জানতাম। কাজেই আমি কিছু বলতে পারিনি। শুধু ধেড়ে ইঁদুরের মতো চুপচাপ বসেছিলাম। সামনে যা আসছিল তা এতই বিপজ্জনক যে বলার মতো নয়।

তাছাড়া অন্য একটা ব্যাপারও ছিল: সে রাতের পর থেকে আমার সব সময় মনে হত, তারাদের ওপর আস্থা রাখা যায় না। নিশ্চয়ই ওরা কোনো কিছু থেকে রক্ষা করতে পারে না। একদিন অকাশের তাঁরা আকাশেই রেখে আমরা চলে যাব।

মহাশূন্যে বাবা আর আমি একসাথে ভাসতে ভাসতে বাবা যখন হঠাৎ কাঁদতে শুরু করল, আমি অনুধাবন করলাম পৃথিবীতে আস্থা স্থাপনের মতো কিছুই নাই।

বাবার চিঠির শেষে পাতাগুলি পড়ার পর আমার মনে উদয় হল কেন আমি সর্বদা মহাশূন্যের প্রতি এমন আগ্রহী। বাবাই আকাশের দিকে আমার চোখ খুলে দিয়েছে। সে-ই আমাকে শিক্ষা দিয়েছে পৃথিবীর সব কোলাহল থেকে দূরে আকাশের দিকে চোখ তুলতে। আমি ছিলাম ক্ষুদে এক জ্যোতির্বিজ্ঞানী, তবে জানতাম না কিসে আমাকে জ্যোতির্বিজ্ঞানী বানাল।

বাবা আর আমি দুজনেই যে হাব্‌ল স্পেস টেলিস্কোপ নিয়ে এত কৌতূহলী, সেটা আর আজগুবী বলে মনে হল না। তার কাছ থেকে এটা আমি উত্তরাধিকার

সূত্রে লাভ করেছি। ও যেখান থেকে ছেড়ে চলে গেছে আমি ওখান থেকেই এগিয়ে নিয়ে যাব। এটা এক ধরনের অস্থাবর উত্তরাধিকার। আর এমনটাই হয়ে আসছে অনাদিকাল থেকে। হাব্‌ল স্পেস টেলিস্কোপের প্রস্তুতি চলে আসছিল প্রস্তর যুগ থেকে। তাও নয় বরং বিগ ব্যাং-এর কয়েক মাইক্রো সেকেন্ড পর থেকেই যখন স্পেস ও টাইম সৃষ্টি হল। হচ্ছিল।

একটা বিষয় আছে যাকে বলা যায় বীজ বপন। মৃত্যুর আগে বাবা সেটা করতে পেরেছিল। কিভাবে বলতে গেলে আমার স্পেশাল অ্যাসাইনমেন্টের বিষয়টা সে-ই আমাকে দিয়ে গিয়েছিল। আমার মনে হয় না ফুটবল খেলায় বাবার তেমন আগ্রহ ছিল। সৌভাগ্যবশত সে স্পাইস গার্লদের দেখে যেতে পারেনি। রোয়াল ডাল সম্বন্ধে সে কী ভাবত তাও আমার জানা নাই।

আমার পড়া শেষ হল। আমি কিছুক্ষণ বসে বসে ভাবছিলাম, ইতিমধ্যে মা এসে দরজায় টোকা দিল। 'গিয়র্গ?' সে শুধু এটুকুই বলতে পারল।

আমি বললাম আমার চিঠি পড়া শেষ হয়েছে।

'তাহলে তুমি ঝটপট বেরিয়ে আসছ তো?'

আমি বললাম বরং সে-ই ভেতরে আসতে পারে।

তারপর আমি দরজা খুলে দিয়ে ওকে ভেতরে আসতে দিলাম। ভাগ্য ভালো যে ভেতরে ঢুকেই সে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

আমার চোখে জল ছিল বলে আমি মোটেই বিব্রত বোধ করলাম না। বাবার সাথে প্রথম দেখা হওয়ার সময় মা'র চোখেও জল ছিল। এবার বাবার সাথে আমার দেখা হল।

আমি কমলা সুন্দরীর গলা জড়িয়ে ধরে বললাম: বাবা আমাদের ছেড়ে চলে গেল।

মা আমাকে কাছে টেনে নিল, সে-ও কাঁদছিল।

আমরা কিছুক্ষণের জন্য বিছানার প্রান্তে বসে রইলাম। শীঘ্রই সে জিজ্ঞেস করতে শুরু করল বাবা আমাকে কী লিখেছে। 'তুমি বুঝতে পারছ আমি খুব অনিশ্চয়তার মধ্যে আছি, সে বলে। আর একটু ভয়ও করছে, এটা পড়তে আমি বেশ সন্ত্রস্ত বোধ করছি।'

আমি বললাম বাবা যা লিখেছে তা একটা লম্বা প্রেমপত্র, আর মা বুঝল সে আমাকে ভালবাসার কথা লিখেছে। ওকে নেহাৎই কচি খুকী মনে হচ্ছে। আমি বললাম, বাবা প্রেমপত্র তাকেই লিখেছে, কমলা সুন্দরীকে।

'আমি ছিলাম বাবার বিশ্বস্ত বন্ধু, কিন্তু তুমি ছিলে সত্যিকারের প্রেমিকা। ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভিন্ন।

সে বিছানার প্রান্তে দীর্ঘক্ষণ নীরবে বসে রইল। সে এখনও যৌবনদীপ্ত ছিল। কমলা সুন্দরী সম্বন্ধে দীর্ঘ পত্র পড়ে আমি বুঝতে পারলাম কী অসাধারণ সুন্দরী ছিল সে। ওকে দেখতে একটু কাঠবিড়ালীর মতো, এটা সত্যি, তবে এই মুহূর্তে একটা বড় পাখির ছানা মনে হচ্ছে, যে এখনও উড়তে শেখেনি। আমি দেখলাম ওর পরীচক্ষু কাঁপছে।

'আমার বাবা কে ছিল?' আমি জিজ্ঞেস করি।

মা চমকে উঠল। সে জানে না আমি এতক্ষণ ধরে কী পড়েছি। জবাব দিল, অবশ্যই ইয়ান ওলাফ।'

কিন্তু কে সে? অর্থাৎ আমি বলতে চাই সে দেখতে কেমন ছিল?'

'আহ্... '

ওর মুখের কোণায় মোনালিসার হাসি ধীরে ধীরে আকার নিতে থাকে। সে প্রায় আড় চোখে একবার আমাকে দেখে নিল। এবার আমি অন্য কিছু দেখলাম, যা আমার বাবা অনেক বার দেখেছে, তার মাঝে দেখলাম এক নিবিড় তন্ময়তা। দেখলাম তার বাদামী চোখের তারা মিটমিট করে জ্বলছে, অথবা অস্বাভাবিক নৃত্যরত।

'সে ছিল ভীষণ, ভীষণ মিষ্টি... ' মা বলল। সত্যিই এক দুর্লভ ব্যক্তিত্ব। তার চাইতেও বেশি সে ছিল এক দিবাস্বাপ্নিক, বরং বলতে পার এক পুরাণ স্রষ্টা। সে বার বার বলত জীবন এক রূপকথার গল্প। আমি গভীরভাবে বিশ্বাস করি জীবন সম্বন্ধে যাদুকরী অনুভূতি দৃঢ়মূল ছিল। তাছাড়া সে ছিল এক বিরাট রোমান্টিক, তবে আমরা দুজনও তাই। হঠাৎ করে সে অসুস্থ হয়ে পড়ল, আর আমি লুকোবার চেষ্টা করব না, সে অশেষ দুঃখ নিয়ে পরপারে চলে গেছে। এ দৃশ্য ছিল ভয়াবহ, সত্যি খুব খারাপ। সে ছিল আমার দারুণ ভক্ত... অবশ্য তোমারও... ভালো কথা সে তোমাকে শ্রদ্ধাও করত। সে আমাদের দুজনের কাউকেই হারাতে চায়নি, কিন্তু ব্যাধিকে জয় করতেও পারেনি, আর তাই নিষ্ঠুরভাবে ওকে আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হল। সে কোনোদিনই ভাগ্যের সাথে আপস করতে পারেনি, শেষ পর্যন্তও না। আর তাই সে চলে যাওয়ায় শূন্যতাও বিশাল। তবে একটা কথা আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি...।

'আমি অনেক সময় পেয়েছিলাম।'

'সে ছিল, যাকে বলে *স্বপ্নদ্রষ্টা*। এই কথাটাই আমি বলার চেষ্টা করছিলাম।'

এবার আমার মুখে মৃদু হাসি। সে সৎও ছিল, আমি বললাম। তার গভীর অন্ত র্দৃষ্টিও ছিল। সে নিজেকে তত বড় করে দেখেনি, খুব কম লোকেরই এই গুণটা থাকে।

মা আমার দিকে এক দুর্বোধ্য দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। "হয়তো, তবে তুমি জানলে কীভাবে!"

আমি কাগজের তাড়াটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলাম। 'কোনো এক সময় তুমি সবটা পড়ে নিও,' আমি বললাম। 'তাহলে তুমি বুঝবে আমি কী বলতে চাইছি।'

আবারো কমলা সুন্দরীকে চোখ মুছতে হল। তবে আর আমার শয়ন কক্ষে বসে বকবক করতে পারছিলাম না। ইয়োর্গেন কী ভাববে? তার প্রতি আমার ঈর্ষাবোধ হল না।

'আমাদের উচিত ওদের সাথে যোগ দেয়া' আমি বললাম।

যখন আমি শয়ন কক্ষ থেকে বের হলাম, মনে হল যখন বাবার চিঠি হাতে ঘরে ঢুকেছিলাম তার চাইতে আমার বয়স অনেক বছর বেড়ে গেছে। নিজেকে এমন বয়ঃপ্রাপ্ত মনে হল যে সবার কৌতূহলী দৃষ্টি আমি গ্রাহ্যই করলাম না।

বড়সড় ডাইনিং টেবিলটাতে ঠাণ্ডা খাবার পরিবেশন করা হয়েছে। উপকরণের মধ্যে ছিল চিকেন, হ্যাম, ওয়াল্ডর্ফ সালাদ তার সাথে কমলার কোয়া, আর একটা বড় বৌলে গ্রীন সালাদ। আমরা পাঁচজন সবাই এক সাথে বসলাম, আমিই টেবিলের পুরোভাগে।

এক সাথে অনেক লোক হলে মা প্রায়ই বলত এক জনের নেতৃত্ব দেয়া উচিত। সেজন্য মনে হল আজকের নেতা আমিই। মোটের ওপর সবার দৃষ্টি আমার ওপর নিবদ্ধ। আমিই নাটকের মূল চরিত্র।

খাওয়া শুরু হওয়ার পর সবার দিকে এবার দেখে নিয়ে বললাম, 'মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে বাবার লেখা একটা দীর্ঘ পত্র আমি এইমাত্র পড়ে শেষ করে এলাম, আর আমি জানি তোমরা সবাই জানতে আগ্রহী চিঠিতে কী লেখা আছে... ।'

ঘরের মধ্যে পিনপতন নীরবতা। আমি কী বলতে যাচ্ছি? কীভাবে এগিয়ে যাব?

'চিঠিটা আমাকে লেখা। তবে অন্যেরাও বাবাকে ভালবাসত। আর তাই কিছু সুসংবাদও আছে কিছু দুঃসংবাদও আছে। প্রথমে আমি সুখবরটাই দিতে চাই। অবশ্য সবাই চিঠিটা পড়ার সুযোগ পাবে, তার মধ্যে ইয়োর্গেনও থাকবে। খারাপ খবরটা হল এই চিঠিটা কেউই আজ রাতে পড়তে পারবে না।'

দাদীমা প্রত্যাশু ভঙ্গিতে সামনে ঝুঁকে পড়েছিল। এবার ওর মুখের ওপর একটা হতাশার ছায়া খেলে গেল। সেই ছায়াটাই অকাট্যভাবে প্রমাণ করে সে আগে চিঠিটা পড়েনি, এখনও নয়, এগার বছর আগেও নয়। ঐ চিঠিটা সত্যিই এগার বছর ধরে পুশ চেয়ারের ভাঁজের মধ্যে লুকোনো ছিল।

'তার লেখা নিয়ে সবাই বলাবলি শুরু করার আগে আমাকে চিঠিটা একটু হজম করার সময় দেয়া উচিত, আমি বললাম। 'তাছাড়া তার একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর নিয়েও আমাকে একটু ভাবতে হবে। তবে সবচেয়ে কঠিন কথা হল উত্তরটা ওকে *কিভাবে* দেয়া যায়।

পরিষ্কার বোঝা গেল সবাই আমার কথা মেনে নিয়েছে। এমনকি ইয়োর্গেন তার চেয়ার ছেড়ে আমার কাছে চলে এল। বেশ ঘনিষ্ঠভাবে আমার কাঁধ চাপড়ে দিল আর বলল: 'তোমার আইডিয়াটা বেশ ভালো বলে মনে হচ্ছে গিয়র্গ। আমার মনে হয় ব্যাপারটাকে একটু থিতু হতে দেয়ার চিন্তাটা তোমার সঠিক।'

তখন আমি বললাম: 'এখন মোটামুটি মাঝ রাত। আমাদের সবারই একটু ঘুমিয়ে নেয়া দরকার।'

আমার কথাগুলো নিজের কানেই বেশ ভারিক্কি এবং ওজনদার মনে হল। আমি এখন পূর্ণ বয়স্ক।

কিন্তু ওই রাতে আমি দুচোখের পাতা এক করতে পারলাম না। বাড়িটা নিঃশব্দ হয়ে যাওয়ার দীর্ঘক্ষণ পরেও আমি ধূসর ভূদৃশ্যের দিকে তাকিয়ে রইলাম। অনেক আগেই তুষারপাত বন্ধ হয়ে গেছে।

অনেক রাতে জেগে উঠলাম। জ্যাকেট, পশমী টুপি, স্কার্ফ এবং আঙ্গুলবিহীন দস্তানা পরে নিলাম, তারপর সোজা কনজারভেটরী দিয়ে বারান্দায় চলে গেলাম। লোহার বেঞ্চ থেকে তুষার ঝেড়ে ফেলে বসে পড়লাম। ঝুল বারান্দার বাতিটা নিভিয়ে দিলাম।

তারা ঝলমল আকাশের দিকে তাকালাম, বাবার কোলে বসে থাকার সেই পরিবেশটা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলাম। মনে হয় স্মরণ করতে পারছি কেমন শক্ত করে বাবা আমাকে ধরেছিল। আমি যাতে মহাশূন্যযান থেকে খসে না পড়ি সেজন্যই বোধহয় এমনটা করেছিল। তারপর বিশালদেহী মানুষটার মাঝ থেকে বেরিয়ে এল ভারী কান্নার শব্দ।

তার সেই কঠিন প্রশ্নের উত্তর হাতড়ে ফেরার চেষ্টা করলাম। তবে বুঝে উঠতে পারলাম না উত্তরটা কিভাবে দেয়া যায়।

জীবনে প্রথমবার অনুধাবন করলাম এই পৃথিবীর যা কিছু ভালবাসি সব কিছু ছেড়ে আমাকেও একদিন চলে যেতে হবে। এ চিন্তাটা ভয়াবহ। আর বাবাই আমাকে এদিকে চোখ খুলে দিয়েছে। পরক্ষণে স্থির করলাম এটা ভয়ের ব্যাপার নয়। আমাদের পরিণতি কী সেটা জানা এক মহান উপলব্ধি। ব্যাংকে আমার কত টাকা আছে সেটা জানার মতোই এটা। তারপর একটা সান্ত্বনা খুঁজে পেলাম যে আমার বয়স সবে পনের।

এবং তার পরেও হয়তো আমার জন্ম না হলেই ভালো হত, কারণ এই বয়সেই আমাকে বিষণ্ন করে তুলেছে যে একদিন আমাকে এই জায়গা ছেড়ে চলে যেতে হবে, তবে আমি মনস্থির করলাম তার চিঠিতে বাবা যেমন বলেছে আমি তাই করব। সে যে কঠিন প্রশ্নটা আমার সামনে রেখেছে তার উত্তর খোঁজার জন্য অনেক সময় নিতে হবে।

আমি চোখ তুলে আকাশের সব গ্রহ নক্ষত্রের দিকে তাকালাম। কল্পনা করার চেষ্টা করলাম আমি একটা মহাশূন্যযানে বসে আছি। বেশ কয়েকটা উল্কা ছুটে যেতে দেখলাম। এভাবেই বসে রইলাম দীর্ঘক্ষণ।

কিছুক্ষণ পরে দরজা খোলার শব্দ পেলাম। তারপর বারান্দায় বেরিয়ে এল মা। সবে উষার আলো ফুটতে শুরু করেছে।

'তুমি এখানে বসে আছ?' সে জিজ্ঞেস করে। দেখতেই পাচ্ছে আমি বসে আছি।

'আমার ঘুম আসছে না,' মুখ থেকে শুধু এটুকুই বেরোল।

'আমারও আসছে না,' মা বলল।

আমি ওর দিকে চোখ তুলে চাইলাম। 'মা, কিছু গরম কাপড় পরে আমার পাশে এসে বস,' আমি বললাম।

শীঘ্রই সে ফিরে এল। ও একটা কালো কোট পরেছে, আমার যদ্দুর মনে পড়ে কোটটা বেশ পুরনো। তবু নিশ্চিত হতে পারলাম না এটা সেই কোট কিনা যেটা সে এককালে পরে ক্যাথিড্রালে গিয়েছিল। তবে বেঞ্চে যুৎ করে বসলে পরে বললাম, 'তোমার এখন শুধু দরকার মস্ত একটা রূপোর হেয়ার ক্লিপ।'

মা হাত দিয়ে নিজের মুখে একটা থাবড়া দিল। 'সে কি এটাও লিখে গেছে?' অবাক বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করে।

ওর প্রশ্নের উত্তর দিলাম পূর্ব আকাশে উদীয়মান বৃহৎ এক গ্রহের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। এটা অবশ্যই একটা গ্রহ কারণ নক্ষত্রদের মতো এটা মিটমিট করে না, আমি শতকরা নব্বুই ভাগ নিশ্চিত যে এটা শুক্র গ্রহ।

'তুমি দেখতে পাচ্ছ একটা গ্রহ ধীরে ধীরে উঠে আসছে?' আমি বললাম। ওটা ভীনাস, বাবা ওকে মর্নিং স্টারও বলত। যতবারই বাবা ওটাকে দেখত, ততবারই তার মনে হত তোমার কথা।

যখন তোমার মাথায় কোনো ভারী চিন্তা ঢুকবে, তখন তুমি হয় অল্প কথা বলবে নয় নীরব থাকবে। মা চুপ করে রইল।

একটু পরে আমি বললাম, 'বাবা হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার আগে আমি সারা রাত এখানে তার সাথে বসেছিলাম। তার চিঠিতে তুমি এ সম্বন্ধে আরো ভালো করে জানতে পারবে। তবে এখন আমরা দুজন আপাতত এখানে বসে আছি।

'গিয়র্গ,' মা বলে, চিঠিটা পড়তে আমি যেমন উদ্‌গ্রীব তেমনই উৎকণ্ঠিত। আমি চাই যখন চিঠিটা পড়ব, তখন তুমি বাড়িতেই থাকবে। তুমি কি এ ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দেবে?'

আমি ওকে স্পর্শ করে প্রতিশ্রুতি দিলাম। আমি ভাবলাম, বাবার চিঠিটা পড়ার সময় ওর পাশে থাকাটা গুরুত্বপূর্ণ। ইয়ান ওলাফের চিঠি পড়ার সময় ইয়োর্গেন তার পাশে থেকে সান্ত্বনা দিক এটা বোধহয় সঙ্গত হবে না। তবে সেও তো বাবার চিঠিটা বেশ পড়তে পারে। ওকে এখান থেকে ছাড় দেয়া চলে না।

'সেই রাতে আমরা দুজন যখন এখানে বসে ছিলাম, 'সে বলেছিল আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছে,' আমি বললাম।

সে ঝট করে আমার দিকে ফিরে বলল, 'গিয়র্গ, বুঝলে... মনে হয় না এই মুহূর্তে আমরা এ নিয়ে আর কোনো কথা বলি। এটা এমন এক জিনিস যার প্রতি তোমার শ্রদ্ধা থাকা উচিত। তুমি কি বুঝতে পারছ না তুমি কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিচ্ছ? বুঝতে পারছ?'

সে এখন ক্রোধের প্রান্তসীমায়, সত্যিই রেগে গেছে।

হ্যাঁ, অবশ্যই, আমি বললাম, 'আমি বেশ বুঝতে পারছি।'

এরপর আমরা দীর্ঘ সময় বসে রইলাম, আমাদের মধ্যে আর তেমন কথা হল না। মনে হয় পুরো এক ঘণ্টা ওখানে ছিলাম। আমি অভিভূত। মায়ের মাঝে মাঝেই সর্দি লাগে।

আকাশে নুতন কিছু দেখলেই সেদিকে আঙ্গুল তুলছিলাম, তবে শিগ্‌গিরই তারাগুলো ম্লান থেকে ম্লানতর হতে থাকে, তারপর এক সময় ওগুলো মিশে গিয়ে দিনের আলো ফুটে উঠে।

বিছানায় যাওয়ার আগে আমি আর একবার আকাশের দিকে আঙ্গুল তুললাম, বললাম, 'উর্ধ্বাকাশে রয়েছে এক বিশাল চক্ষু। এটার ওজন এগার টনের বেশি একটা ট্রেনের সমান লম্বা, আর দুটি বিশাল ডানায় ভর করে চলে।

লক্ষ্য করলাম মা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে, ও আমার কথা মোটেই বুঝতে পারেনি।

ওকে ঘাবড়ে দেয়ার কোনো অভিপ্রায় ছিল না আমার, কোনো ভূতের গল্প শোনানোর মতলবও ছিল না। কাজেই ঝটপট যোগ করলাম: 'আমি হাব্‌ল স্পেস টেলিস্কোপের কথা বলছি। এটা মহাবিশ্বের চক্ষু।

মা আমার মাথার চুল নেড়ে দেয়ার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল বিশেষ মুচকী হাসি দিয়ে। তবে ঝট করে সরে গিয়ে ওর হাত এড়ালাম। সে এখনও মনে করে আমি বাচ্চা ছেলে। হয়তো ভাবল আমি আমার বিশেষ নিবন্ধের কথা বলছি।

'এক সময় আমরা ঠিকই পাত্তা লাগাব এসবের অর্থ কী,' আমি বললাম।

ঐদিন আমাকে স্কুলে যেতে হল না। দাদীমা বলল শিক্ষককে বললেই হবে কী হয়েছিল। আমাকে বলতে হবে আমি বাবার একটা চিঠি পেয়েছি, যে এগার বছর আগে মারা গেছে। এ ধরনের কোনো ঘটনা ঘটলে অবশ্যই নিশ্বাস নেয়ার সময় পাওয়া যায়, দাদীমা বলল।

যদি ঐ ধরনের ঘটনা ঘটে, আমি ভাবলাম। ভাবিনি মৃত বাবা-মার কাছ থেকে চিঠি পাওয়া কোনো সাধারণ ব্যাপার।

দাদা ও দাদীমাকে বাবার চিঠি না পড়েই টনস্‌বার্গে চলে যেতে হল। ওদেরকে প্রতিশ্রুতি দিলাম সপ্তাহ শেষ হওয়ার আগেই ওদের পড়াব। দাদীমা অবশ্য এতটা দেরীর জন্য কিছুটা হতাশ। হাজার হলেও সে -ই তো চিঠিটা প্রথম দেখেছে, আর অসলো যাওয়ার সিদ্ধান্তটা ওরই ছিল।

ইয়োর্গেনকে সকাল সকাল কাজে যেতে হল। তাকে অল্প সময়ের জন্য দেখেছিলাম তবে মা আর আমি বাড়িতেই রইলাম। একটু বেলা হলে আমি হলুদ সোফাটায় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, কারণ আগের রাতে আমি একটুও ঘুমুতে পারিনি। আমি জেগে ওঠার পর চিলেকোঠায় তন্ন তন্ন করে খোঁজ শুরু করলাম।

আমি মাকে বললাম ওর সেভিলে আঁকা সবগুলো পেইনিং খুঁজে রে করতে সৌভাগ্যবশত ও কোনোটাই ফেলে দেয়নি, যদিও প্রায়ই বলত 'ওগুলোর মায়া সে কাটিয়ে উঠেছে।' সে এই কথাটা বলেছিল বাবার ছবিটা সরিয়ে ফেলার সময়। সেই যেটা সে স্মৃতি থেকে এঁকেছিল। ছবিটা নিয়ে আমরা কেউই কিছু বললাম না, তবে ওটা দেখে অমি স্তম্ভিত হয়ে রইলাম। ইতিপূর্তে কোনো পেইন্টিং-এ আমি এমন উজ্জ্বল নীল চোখ দেখিনি। ভাবলাম নীল চোখের মধ্যে নিশ্চয়ই কোবাল্ট মেশানো হয়েছে। আরও অনুভব করলাম এই চোখগুলি এমন কিছু দেখছে যা ইতিপূর্বে কোনো মানুষ দেখেনি।

'তবে তুমি নিশ্চয়ই বাবার মায়া কাটিয়ে উঠতে পারনি,' আমি বললাম। বাক্যটাকে আমি প্রশ্নবোধক করলাম না। বরং এর মধ্যে ছিল আদেশের সুর।

আমি ওকে যেটা কমলা গাছের নিচে ঝোলানো ছিল, সেই ছবিটা বের করতে বললাম। আমরা সেই ছবি বের করলাম এবং বাবা যে রুমে কম্পিউটারে বসে লিখতেন সেই দেয়ালে ঝোলানো হল। ঐ সময় ওকে বেশ সতর্ক হয়ে হাঁটতে হত যাতে আমার সাজানো ট্রেনের বগিগুলো উল্টে না যায়। এখনকার থেকে সে সময়টা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা।

আমার মনে হল কমলা গাছের ছবিটা সঠিক স্থান পেয়েছে, আর দেখতে তেমন খারাপ লাগছিল না। আমার ধারণা এই সামান্য অদলবদলটা ইয়োর্গেন মেনে নিতে পারবে। আর আমি সেই কথাটাই বললাম।

চিলেকোঠায় একটা কার্ডবোর্ডের বাক্সে আমার কাঠের ট্রেন সেটটাও খুঁজে পেলাম। পুরনো কম্পিউটারটাও পাওয়া গেল। আমি ওটাকে বারান্দায় নামিয়ে আনলাম। স্ক্রীনটা প্লাগ করে ওয়ার্ড প্রসেসিং প্রোগ্রামে চলে গেলাম। এটা একটা পুরনো ডিওএস মেসিন এবং ওয়ার্ড প্রসেসিং প্রোগ্রামের নাম ওয়ার্ড পার্ফেক্ট। আমার ক্লাসের এক ছেলের বাবা এক কম্পিউটার মিউজিয়ামে কাজ করে। সে এসব পুরনো যন্ত্র চালাতে পারে।

তবে বাবার লেখাটা পুনরুদ্ধারের জন্য সর্বাধিক আট অক্ষরের একটা শব্দ ডিকোড করতে হবে। এগার বছর আগের লেখাটা পুনরুদ্ধার করা সহজ কাজ নয়।

আমি যখন যন্ত্রটা নিয়ে ব্যস্ত তখন মা পেছনে দাঁড়িয়ে। সে বলে ওরা সব ধরনের শব্দ নিয়েই পরীক্ষা করে দেখেছে অনেক সংখ্যাও চেষ্টা করেছে, যেমন বার্থডে, কার রেজিস্ট্রেশন, পার্সোনাল আইডেন্টিটি নাম্বার ইত্যাদি।

চোখের পলকে বুঝতে পারলাম ওরা কল্পনা শক্তিকে তেমন কাজে লাগায় নাই। এরপর আমি সাত অক্ষরের শব্দ 0-R-A-N-G-E-S ট্যাপ করলাম। সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রটা পিং শব্দ করে মেন্যুতে চলে গেল।

মা 'অভিভূত হয়ে' গেল বললে কমই বলা হবে। সে কপাল চাপড়ে প্রায় মূর্ছা যাওয়ার অবস্থা।

পুরনো কম্পিউটারের <dir> আধুনিক কম্পিউটারের 'folder' এগুলোর সর্বাধিক আট অক্ষরের নাম। এর মধ্যে একটা 'V-E-R-O-N-I-K-A'। আমি ENTER কী চাপলাম। পুরনো কম্পিউটারে মাউস থাকত না। শুধু একটা ডক্যুমেন্ট উঠে এল। এটার নাম 'গিয়র্গ'। আবার ENTER কী চাপলাম। কি আশ্চর্য! গত সন্ধ্যায় যে লেখাটা পড়লাম ওটাই আবার ভেসে উঠল: *তুমি আরাম করে বসেছ তো, গিয়র্গ? এটা খুবই দরকারী যে অন্তত তুমি শক্ত হয়ে বসে থাকবে। কারণ আমি তোমাকে একটা আঙ্গুল কামড়ানো গল্প বলতে যাচ্ছি...* আমি এরপর হোম চাপার পর ডাউন এ্যারো চেপে পুরো টেক্সটা দেখে নিলাম। মনে হল অনন্তকাল বয়ে গেল সেই দশ সেকেন্ডের মধ্যে। আরে তাই তো! সর্বশেষ বাক্যটি: *অসম্ভব কোনো কিছুর স্বপ্ন দেখার একটা বিশেষ নাম আছে, যাকে অমরা বলি 'আশা'*।

বাবার কম্পিউটারে চিঠিটা খুঁজে বের করা আমার জন্য এক অসাধারণ ব্যাপার। বাবার সম্বন্ধে যখন এই বইটা লেখার সিদ্ধান্ত নিলাম, তখন আমার জন্য কিছু এডিটিং ও পেস্টিং-এর কাজ থাকবে। আমি যেমনটা অনুমান করেছিলাম, এখন কাজটা তার চাইতে অনেক সহজ হয়ে যাবে। যেহেতু পুরনো ডকুমেন্টটা বের করে টাইপ করে নিলেই হবে, আমার বাবার টেক্সটের সামনে কিছু মাঝে কিছু আর শেষে কিছু। তখন মনে হবে বাবার সাথে বসেই একটা বই লিখছি।

আবর্জনা ঘাটাঘাটি করে পুরনো প্রিন্টারটাও পেয়ে গেলাম। এটাকে বলা হয় ডেইজি হুইল প্রিন্টার। অবিশ্বাস্য ব্যাপার যে সাইন্স মিউজিয়াম থেকে এটাকে এখনও উঠিয়ে নিয়ে যায়নি। এটা শব্দ করে করাত কলের মতো আর এক একটা পৃষ্ঠা প্রিন্ট করতে চার মিনিট সময় নেয়। কারণ ছোট, একটা হাতুড়ি প্রতিটা অক্ষরের ওপরে ঠুক ঠুক করে আঘাত করে, আর একটা রঙিন ফিতা থেকে লেখাগুলো কাগজের ওপর ছাপ ফেলে। এগার বছর আগে বাবা যখন মারা যায় এই যন্ত্রটাই ছিল অত্যাধুনিক!

এখন আমি পুরনো মেশিনটায় বসে লিখছি। শেষ কথাটা যা ট্যাপ করলাম তা হল: *আমি একা পুরনো মেশিনটায় বসে লিখছি। আর এখন বলতে আমি এখনই বোঝাচ্ছি।*

মায়ের একটা রেকর্ড আছে যার নাম *অবিস্মরণীয়*। এটা একটা অতুলনীয় রেকর্ড কারণ এতে নাতালী কোল তার বাবার সাথে *ন্যাটকিং কোল* নামে একটা ডুয়েট গেয়েছে। এটা তেমন আহামরি কিছু নয়, তবে আসল কথা হল নাতালী তার বাবার সাথে ডুয়েট গেয়েছে ওর বাবার মৃত্যুর ত্রিশ বছর পর। যদি সম্পূর্ণ প্রযুক্তিগত দিক থেকে দেখা যায়, তাহলে ব্যাপারটা তেমন কঠিন কিছু নয়। নাতালী কোল শুধু ন্যাট কিং কোলের চল্লিশ বছর আগে গাওয়া রেকর্ডের সাথে গলা মিলিয়ে গেয়েছে।

প্রযুক্তিগতভাবে ত্রিশ বছর আগে মৃত কোনো ব্যক্তির সাথে ডুয়েট গাওয়াটা বিরাট কোনো কৃতিত্ব নয়। কাজেই এটা বড়জোর এক আধ্যাত্মিক চাহিদা। তবে ডুয়েটটা বেশ ভালো। এটা 'অবিস্মরণীয়।'

এই গল্পটা টেনে লম্বা করার প্রয়োজন নেই। মাত্র দুটি জিনিস বাকী রয়ে গেছে। এর মধ্যে একটা বাবার সেই ঘোরালো প্রশ্নটা। তারপর অন্য একটা ব্যাপারও রয়ে গেছে। পরের ব্যাপারটাই আমাকে প্রথমে খোলাসা করতে হবে, কারণ আমি স্থির করেছি দমদার প্রশ্নটার উত্তর একেবারে শেষভাগে দিয়ে যাব।

পুরনো পেইন্টিং আর প্রাগৈতিহাসিক কম্পিউটার খুঁজে বের করার পর মা চলে গেল রান্নাঘরে কিছু কোকোনাট বান তৈরি করতে। সে জানত এটা আমার খুব প্রিয়, আর সে কারণেই এই বিশেষ দিনটিতে তার এটা বানানো। তবে মিরিয়ামও কোকোনাট বানের জন্য পাগল।

যখন বান তৈরির গন্ধ বারান্দা পর্যন্ত ভেসে এল, আমি রান্নাঘর পর্যন্ত চলে গেলাম। মতলব ছিল একটা গরম গরম বান চুরি করে নেয়া। কিন্তু হঠাৎ মাকে একটা প্রশ্ন করার কথা মনে এল। কমলা সুন্দরী গল্পের একটা আলগা সূত্র রয়ে গেছে। মা এখনও এটা পড়েনি।

মা সবে কয়েকটা বানে বরফের পুর দিচ্ছিল। চুলোর টেবিলে কিছু গ্রেট করা নারকেল ছিল যেগুলো বরফ কুচির ওপর ছড়িয়ে দিতে হবে।

'সাদা টয়োটার লোকটা কে ছিল?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

প্রশ্নটা করেছিলাম ঠাট্টাচ্ছলে। আসলে ওকে একটু উত্যক্ত করার ইচ্ছে ছিল। আমি আগেই জেনেছি সে ছিল তার এক পুরনো শিখা অন্তত সে তো বাবাকে তাই বলেছিল।

তবে এবার সে অদ্ভুত রকম হকচকিয়ে গেল। প্রথম সে আমার দিকে তাকায়। ওর মুখ ফ্যাকাশে। তারপর কিচেনের টেবিলের ওপর বসে পড়ে।

'তাহলে সে ও কথাও লিখেছে!' সে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।

'আমার মনে হয় সে একটু ঈর্ষাকাতর হয়েছিল,' আমি বললাম।

যখন সে আর কিছুই বলল না, তখন আমি আবারো জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি বলতে চাও না সাদা টয়োটায় লোকটা কে ছিল?'

সে চিন্তিতভাবে আমার মুখের দিকে তাকায়। মনে হয় সে যেন ঝাপসা কাঁচের মধ্য দিয়ে তাকাচ্ছে।

নিচু গলায় সে বলল, 'লোকটা ছিল ইয়োর্গেন।'

মনে হল আমার মাথা চক্কর দিচ্ছে, 'ইয়োর্গেন? অবাক বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলাম।

সে মাথা দোলায়। এবার সত্যিই আমার মাথা ঘোরে। আমি কোরা নারকেলের ব্যাগটা নিয়ে মেঝেতে ছিটাতে থাকি। তারপর ব্যাগসুদ্ধ উপুর করে নারকেলগুলো ঢেলে দিলাম।

'তুষারপাত হচ্ছে,' আমি বললাম।

মা অনড় হয়ে কিচেন টেবিলে বসে রইল। এখন আর আমাকে সামলানো সম্ভব নয়। ও শুধু বলল: 'তুমি এটা করলে কেন?'

'কারণ তুমি জঘন্য উন্মাদ!' আমি চিৎকার করে উঠলাম। 'তোমার এক সাথে দুজন প্রেমিক ছিল!'

সে কায়ক্লেশে এটার প্রতিবাদ করল। 'ব্যাপারটা সে রকম ছিল না,' সে বলল। 'ইয়ান ওলাফের সাথে দেখা হওয়ার পর একমাত্র সে-ই ছিল।'

তবু আমার মনে হল গোটা ব্যাপারটার মধ্যে একটা কিন্তু আছে। 'আর ইয়ান ওলাফ মারা যাওয়ার সাথে সাথে ইয়োর্গেনই একমাত্র হয়ে গেল?'

'না, সে বলল।' ব্যাপারটা সে রকমও ছিল না। অনেক বছর কেটে যাওয়ার পরই ইয়োর্গেনের সাথে আবার দেখা হয়। সেই বছরগুলো শুধু তুমি আর আমিই ছিলাম, তুমি সেটা জান। তবে ইয়োর্গেনের দেখা হওয়ার পর আমার পূর্বের ভালো লাগা আর একবার প্রজ্বলিত হয়। তারপর আমার একত্রে বসবাসের সিদ্ধান্ত বহু বছর পরের।

বুড়ো মুরগীটার জন্য আমার একটু দুঃখ হল। তখনও ওর মুখ ফ্যাকাশে ছিল। তা সত্ত্বেও আমি জিজ্ঞেস করলাম: 'আমি জিজ্ঞেস করতে পারি দুটোর মধ্যে কমলা সুন্দরীর টান কার প্রতি বেশি ছিল?'

'না,' সে গলা চড়িয়ে বলল, তুমি সেটা জিজ্ঞেস করতে পার না।'

'সে ক্রুদ্ধ ছিল না। তবে ওর মধ্যে বেশ দৃঢ়তা ছিল। তারপর সে কাঁদতে শুরু করল।

পুরো ব্যাপারটার আমি এখানেই ইতি টানতে চাইলাম, কারণ বাবার কাছ থেকে আমি যে শিক্ষাটা পেয়েছিলাম তা হল, যে ব্যাপার আমার নয়, তাতে নাক না

গলানো। আমাকে সতর্ক হতে হল, যে রূপকথার গল্পের চরিত্র আমি নই তার এত কাছাকাছি না যাওয়া।

তবে নিজের ভাবনা ভাবার অধিকার আমার আছে।

যা কিছু শুনলাম আমার ভালো লাগেনি, কারণ টয়োটার সেই লোক শেষ পর্যন্ত জয়ী হল। এটা তার দোষ ছিল না। তবে আমি খুশী যে বাবা এটা জেনে যেতে পারেনি।

তবে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে এটা তার নিজের দোষ। সে নিয়ম মেনে চলতে পারেনি। সে কমলা সুন্দরীর জন্য ছয় মাস অপেক্ষা করতে পারেনি। আর সে জন্যই সে অল্প সময়ের মধ্যে নালীর মধ্যে একটা মৃত পারাবত দেখেছিল, আর তাও ছিল সাদা পায়রা।

আমি সব সময় বাবাকে মনে করব শ্বেত পারাবত হিসাবে। তবু আমি নিয়তিতে পুরোপুরি বিশ্বাস করি কিনা, সে ব্যাপারে নিশ্চিত নই। আমার মনে হয় না বাবাও বড় একটা বিশ্বাস করত। তাই যদি হত তাহলে হাব্‌ল স্পেস টেলিস্কোপ নিয়ে অত মাথা ঘামাত না।

সেদিন শেষ বিকেলে ইয়োর্গেন ও মিরিয়ামের সাথে বসে চকোলেট বান খেলাম, দুটি বানে বরফের কোটিং ছিল। ও দুটো ইয়োর্গেন ও মিরিয়ামকে দিলাম। আমার মনে হয় এটা ওদের পাওনা।

বান ফাইটের বেশ কদিন পরেও আমি সেই পুরনো পিসিটা নিয়ে বসেছিলাম। আমাকে মন স্থির করতে হবে কিভাবে বাবার কঠিন প্রশ্নের উত্তরটা দেয়া যায়। আমি একটা ডেডলাইন ঠিক করেছি যেটা সানডে ডিনারের আগেই শেষ হয়ে যাবে।

গত কয়েক দিন ধরে এই চিন্তাটাই আমার মন অধিকার করে রইল। অনেকগুলি বিকল্প উত্তরের মধ্য থেকে একটা বাছাই করা সত্যিই দুঃসাধ্য। আমি এ পর্যন্ত চারবার চিঠিটা পড়েছি, তারপর প্রত্যেকবারই ভেবেছিঃ বেচারা বাবা। ওর জন্য আমার দুঃখ হয় কারণ সে এখানে নেই। তবে সে যা লিখে গেছে সেটা শুধু ওর জন্যই প্রযোজ্য তা নয়, এটা সারা পৃথিবীর সবার জন্যই প্রযোজ্য, যারা আমাদের আগে পৃথিবীতে এসেছিল, যারা এখন এখানে আছে, অথবা যারা ভবিষ্যতে এখানে আসবে।

'আমরা পৃথিবীতে আসি একবারই,' বাবা লিখেছে। অনেকবার ও বলেছেও আমরা পৃথিবীতে আসি অল্প সময়ের জন্য। আমি নিশ্চিত নই আমার অভিজ্ঞতা ওর সাথে খাপ খায় কিনা। আমি এখানে আছি মাত্র পনের বছর ধরে, আর আমার মোটেই মনে হয় না এটা খুব 'অল্প সময়।'

তবে মনে হয় বাবা কী বোঝাতে চান তা আমি জানি। যারা বোঝে যে গোটা বিশ্ব একদিন বিলুপ্ত হবে, তাদের কাছে জীবন অত্যন্ত কম। এটা সবার বোধগম্য

নয়। খুব বেশি লোক অনুধাবন করতে পারবে না অনন্তকাল ধরে চলতে থাকা বলতে কী বোঝায়। প্রতি ঘণ্টায় প্রতি মিনিটেই এই বোধের অসংখ্য বিচ্যুতি রয়েছে।

কল্পনা কর তুমি রয়েছ এই রূপকথার গল্পের দোরগোড়ায়, বাবা লিখেছে, লক্ষ কোটি বছর আগে যখন কেবল এসব সৃষ্টি হচ্ছে। মনে কর কোনো এক নির্দিষ্ট মুহূর্তে এই পৃথিবীতে জীবন লাভ করার স্বাধীনতা তোমাকে দেয়া হল। তুমি জানতে না তুমি কখন জন্মাবে আর কতদিন বেঁচে থাকবে, তবে এটা মাত্র কয়েক বছরের বেশি হবে না। তোমার জন্মাবার মুহূর্তটি নির্ধারণ করার অধিকার থাকলেও তুমি অবশ্যই জানতে একদিন তোমাকে সব ছেড়ে চলে যেতে হবে।

আমি তখনও মনস্থির করতে পারছি না। তবে বাবার সাথে আমি একমত হতে শুরু করেছি। হয়তো এ কারণে যে পুরো প্রস্তাবটা আমি প্রত্যাখ্যান করতে পেরেছি। বাঁচার জন্য যে ক্ষুদ্র সময়টা পাব তা হবে আমার পূর্বের ও আমার পরের যে অনন্ত কাল থাকবে তার তুলনায় নিতান্তই আনুবিক্ষণিক।

যদি আমি জানতাম আমাকে যে– এক কামড় খেতে বলা হয়েছে তা মাত্র এক মিলিগ্রাম ওজনের তাহলে সেটা দারুণ সুস্বাদু হলেও আমি উপেক্ষা করতাম।

আমার বাবার কাছ থেকে আমি এক গভীর দুঃখবোধের উত্তরাধিকার পেয়েছিলাম, আর সে দুঃখ হল একদিন আমাকে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে। আমি ভাবতে শিখেছি আজকের সন্ধ্যার মতো আর কোনো সন্ধ্যা আমি ফিরে পাব না...। তবে আমি উত্তরাধিকার পেয়েছি এমন এক চোখের যার দৃষ্টিতে অদ্ভুত সুন্দর এই জীবন। এবার গ্রীষ্মে আমি ভ্রমর সম্বন্ধে গবেষণা করতে যাচ্ছি। (আমি একটা স্টপওয়াচ পেয়েছি। এতে করে সম্ভব হবে ভ্রমর কত গতিতে উড়তে পারে। তাছাড়া ভ্রমরের ওজনও নিতে হবে। আফ্রিকার সাভানা জঙ্গলে একটা ভ্রমণের কথা আছে। সেটাও 'না' বলে দিতে হবে। আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে লক্ষকোটি আলোকবর্ষ দূরের বস্তু লক্ষ্য করে অবাক হতে শিখেছি। আমার চতুর্থ জন্মদিনের আগেই এসব শিক্ষা আমার হয়ে গেছে।

তবে ঠিক ওখান থেকেই আমি শুরু করতে পারি না। আর একটা ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকেও আমাকে চেষ্টা করতে হবে। হয়তো সেটা আমার নিজস্ব ভঙ্গিতে বেছে নিতে হবে।

যদি কমলা সুন্দরীর গল্প নিয়ে একটা ফিল্ম তৈরি হত, আর আমাকে সেই ফিল্ম দেখতে হত, যদিও আমার জানা আছে ইয়ান ওলাফের সাথে দেখা না হলে এই গ্রহের বুকে আমার জীবন লাভের সম্ভাবনা দেখা দিত না– তাহলে নিশ্চয়ই আমি ওদের ক্রিয়কলাপে বাহ্‌বা দিতাম, আর আশা করতাম, ওরা যেন পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়। হয়তো আমি উত্তেজনায় আমার সিটের অগ্রপ্রান্তে চলে আসতাম।

হয়তো আমার এমন দুশ্চিন্তা হত যে ওদের দুজনের কেউ একজন এমন এক মহা নাস্তিক যে ওদের ক্রিসমাস সার্ভিসে যোগ দিতে দিচ্ছে না। হয়তো প্লাজা দ্য লা আলিয়াঞ্জা থেকে বের হয়ে কমলা সুন্দরীকে একজন ডেনের সাথে চলে যেতে দেখে হিস্টেরিয়াগ্রস্তের মতো কাঁদতে শুরু করতাম। আর ভেরেনিকা ও ইয়ান ওলাফ প্রেমিক প্রেমিকা হওয়ার পর ওদের মধ্যে সামান্য বিবাদের আভাস পেলে দুঃশ্চিন্তায় পাথর হয়ে যেতাম। আমার নিজের কথা বলতে গেলে আমার মূল সমস্যা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রসার নিয়ে।

পৃথিবী! আমি কখনও এখানে আসতাম না। কখনও এই বিরাট রহস্য অবলোকন করতাম না।

মহাশূন্য! হয়তো কখনও জ্যোতির্ময় তারকাপুঞ্জের প্রতি দৃষ্টিপাত করতাম না।

সূর্য! হয়তো কোনোদিনই টন্‌স্‌বার্গের উষ্ণ সমুদ্রজাত পাহাড়গুলোয় পা রাখতাম না। পাহাড়ের নিচে ধরিত্রীর উদর অবতল অবলোকন করতাম না।

এখন আমি সব কিছুই পরিপূর্ণরূপে অবলোকন করছি। কেবলমাত্র এখনই আমার জীবন এবং আত্মা দিয়ে অনস্তিত্বের অর্থ অনুধাবন করছি। আমার উদর গহ্বরের উঠানামা অনুভব করছি। আমি অসুস্থ বোধ করছি। তবে রাগও হচ্ছে।

ক্রোধে উন্মাদ হয়ে যাচ্ছি যে একদিন আমি লোপ পেয়ে যাব।

আমি আস্থাহীনতায় ভুগছি, কারণ কেউ একজন হয়তো বলল: জেগে ওঠ, তোমার পায়ের কাছে সারা পৃথিবী হুমড়ি খেয়ে পড়বে, এই তো তোমার ডামি, এই তো তোমার ট্রেন সেট, এই তো তোমার স্কুল, শরতে যেখানে তুমি ভর্তি হবে। পর মুহূর্তেই অট্টহাসি: হা হা আমরা সত্যিই তোমাকে ওখানে দেখতে পাচ্ছি। আর তোমার কাছ থেকে গোটা পৃথিবী ছিনিয়ে নেয়া হল।

সব কিছুই আমাকে ধোকা দিয়েছে বলে বোধ হল। আঁকড়ে ধরার মতো কিছুই আর রইল না। কোনো কিছুই আমাকে রক্ষা করতে পারবে না।

শুধু পৃথিবীকেই হারালাম না, হারালাম না শুধু আমার ভালোলাগা ভালবাসার ধন, নিজেকেও হারালাম আমি।

আমি রেগে আছি। ভীষণ রেগে আছি। যে কোনো সময় বমি করতে পারি। কারণ আমি শয়তানের চোখে চোখ রেখেছি। তবে শয়তানকে আমি শেষ বাজি জিততে দেব না। আমাকে কব্জা করার আগেই আমি অশুভ শক্তির কাছ থেকে সরে আসব। আমি জীবনকেই বেছে নেব। আমার জন্য যে এক চিলতে 'ভালো' আছে, আমি সেটাকেই আঁকড়ে থাকব, হয়তো এমন এক শক্তির অস্তিত্ব আছে, যাকে বলা যায় কে বলতে পারে হয়তো এক ঈশ্বর আছেন যিনি সব কিছুর ওপর নজর রাখছেন।

আমি জানি অশুভ শক্তি আছে, কারণ আমি বিথোফেনের মুনলিট সোনাটার তৃতীয় তরঙ্গ শুনেছি। তবে আমি এ-ও জানি যে শুভশক্তিও আছে। আমি জানি পাহাড়ের ফাটলের মধ্যে সুন্দর একটা ফুল ফুটে থাকে, আর শীঘ্রই এক জীবনপ্রেমী ভ্রমর সেই ফুল থেকে উড়ে উঠবে।

হাহ্! ওটা আমার হাত ফসকে গেল। সৌভাগ্যবশত এই পর্যায়ে লঘু সুরের *আলেগ্রেটো* রয়েছে। দুটি ট্রাজেডির মধ্যে রয়েছে মজাদার এক পাপেট শো, এই অভিনয়টা আমি মিস করতে চাই না। জীবনে ক্ষুধা নামে একটা বিষয় আছে, এবং সব কিছু সত্ত্বেও আমি জীবনের উত্তুঙ্গ চড়াই পরিহার করতে চাই। তারা নেই, তাদের অস্তিত্ব নেই, আমার জন্য অন্তত নয়। একমাত্র যার অস্তিত্ব আছে তা হল দুঃসাহসিক *আলেগ্রেটো*।

আমি অবশ্যই স্বীকার করব, যে প্রশ্নটা নিয়ে আমি হিমশিম খাচ্ছি, খুবই সুচতুর প্রশ্ন সেটা। ফ্রান্জ্ লিৎসই মুনলিট সোনাটার দ্বিতীয় তরঙ্গকে বলেছিল দুই উত্তুঙ্গ পর্বতশীর্ষের মাঝে এক ফুল। এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে পুরো ধাঁধাটার উত্তর আমি পেয়ে গেছি।

সময়ের সিঁড়ি বেয়ে এখন আমি নেমে যাব লক্ষকোটি বছর আগে। সেই সময়ে যখন আমাকে নির্ধারণ করতে হবে আমি পৃথিবীর বুকে লক্ষ বছরের জীবন বেছে নেব না সুযোগটা হাতছাড়া করব যেহেতু আমি নিয়মটা মেনে নিতে পারছি না, অথবা যদি বর্তমানে এটুকু স্বাধীনতাও থাকত কে আমার মা আর কে আমার বাবা হবে সেটুকু পছন্দ করার। এখন আমি জানি গল্পটা কীভাবে শুরু হয়েছিল। অল্পস্বল্প এও জানি আমি কার ভক্ত হব।

এবার উত্তরটা দেওয়া যাক, আমার সুচিন্তিত পছন্দটা জানাতে চাই। আমি লিখি:

প্রিয় বাবা,

তোমার চিঠির জন্য ধন্যবাদ। এটা আমার কাছে এক চমক নিয়ে এসেছে আর আমি খুশীও হয়েছি, কষ্টও পেয়েছি। তবে শেষ পর্যন্ত কঠিন সিদ্ধান্তটা নিয়েই ফেললাম। আমি পুরোপুরি নিশ্চিত স্বল্প সময়ের জন্যে হলেও আমি পৃথিবীতে বাঁচার সিদ্ধান্তটাই নেব। কাজেই এখনকার মতো তুমি সব দুর্ভাবনার কথা ভুলে যেতে পার। লোকে যেমন বলে, তুমি শান্তিতে ঘুমোতে পার। কমলা সুন্দরীকে তাড়া করে ধরে ফেলার জন্য ধন্যবাদ!

মা কিচেনে ডিনার তৈরি করছে। সে বলে আজ একটা ফরাসী খানা বানাবে, ইয়োর্গেন শিগ্‌গিরই ওর শনিবারের জগিং সেরে বাড়ি ফিরবে। মিরিয়াম ঘুমিয়ে

পড়েছে। আজ ১৭ নভেম্বর, কাজেই ক্রিসমাসের আর মাত্র পাঁচ সপ্তাহ বাকী আছে।

তুমি হাব্‌ল স্পেস টেলিস্কোপের ওপর বেশ মজার কিছু প্রশ্ন করেছ। আর সত্যি বলতে কি আমি ইতিমধ্যেই সে টেলিস্কোপ নিয়ে বিশাল এক নিবন্ধ লিখেছি!!!

তোমাকে একটা গোপন কথা বলব। আমার ধারণা ক্রিসমাসে কী পেতে যাচ্ছি তা আমি জানি! ইয়োর্গেন কিছু ইঙ্গিত ছুঁড়ে দিয়েছে যেভাবেই হোক সে আমাকে খবরের কাগজের কিছু শীতল ছবি দেখিয়েছে, আর বড় গল্পটাকে কেটে ছোট করে বলতে গেলে দাঁড়ায়, আমার অনুমান, আমি একটা টেলিস্কোপ পেতে যাচ্ছি। সত্যি এটা এক দারুণ ব্যাপার হবে। তবে ইয়োর্গেনও বিশেষ নিবন্ধটা পড়েছে। সত্যি বলতে কি দুবার পড়েছে, যদিও সে আমার আপন বাবা নয়। তবু বলেছে সে আমাকে নিয়ে গর্ব অনুভব করে। আমার মনে হয় ওর কাছে মিরিয়াম যতটা প্রিয় আমিও ততটা। আমার মনে হয় না ওর কাছে আমার এর চেয়ে বেশি কিছু দাবী আছে। লোকটাকে আমি সত্যিকারের বাবার মতোই পছন্দ করি।

ক্রিসমাস উপলক্ষে যদি আমি একটা টেলিস্কোপ পাই তাহলে ওটা আমি ফিয়োলাস্টলেনে নিয়ে যাব, কারণ এখানকার এই নিচু ভূমিতে জ্যোতির্বিজ্ঞানী যাকে বলে 'আলোক দূষণ' তাই হয়েছে। আমি স্থির করেছি টেলিস্কোপটার কী নাম দেব। আমি ওটার নামকরণ করব ইয়ান ওলাফ টেলিস্কোপ! ইয়োর্গেন হয়তো এটাকে উদ্ভট ভাববে, তবে সে যদি আমার সাথে সদ্ভাব রাখতে চায় তাহলে এটা মেনে নিতেই হবে।

ফিয়েলোস্টোলেনের আকাশে যখন চাঁদ থাকে না, তখন এত তারা থাকে যে নিজেকে বোঝাতে পারবে, কেন স্পেস টেলিস্কোপের প্রয়োজন। আচ্ছা বাবা, তবে তাই হোক, তুমি যতটা কল্পনা কর আমি ততটা ভোতা নই। আমি জানি নভমণ্ডলের তারারা মিটমিট করে না! তবে মাঝে মাঝে সুইমিং পুলের তলদেশে কয়েক সেকেন্ড শুয়ে পুলের পার্শ্বদেশে লক্ষ করাটা বেশ চিত্তাকর্ষক, তুমি কিছু একটা দেখতে পাবে, আর কল্পনা করা সম্ভব উপরিতলে কী প্রতিফলিত হচ্ছে। অন্ততপক্ষে চাঁদের জ্বালামুখ বৃহস্পতির উপগ্রহ এবং শনির বলয় দেখা সম্ভব হবে। তারপর পরবর্তী জীবনে হয়তো সত্যিকারের স্পেস শাটেলে করে মহাশূন্য ভ্রমণে যেতে পারব! প্রাণঢালা ভালবাসা।

গিয়র্গ (যে হামলেভেইয়েনের দুর্গ কাঁধে নিয়ে আছে এবং জানে জীবনযাপন কত ভয়াবহ)

পুনশ্চ: তোমার চিঠি পড়ার পর আমি ভায়োলিন গার্লের সাথে কথা বলারও সাহস সঞ্চয় করেছি। হয়তো সেটা আগামী সোমবারেই। অন্তত এখন ওর সাথে গুরুত্বপূর্ণ আলাপ করার আছে। তারপর হয়তো সে আমাকে ওর ভায়োলিনও দেখাবে।

আমি মাকে ডাকি। এখন সে আসছে। এই বাক্যটা লিখতে লিখতেই ওর হাতে বাবার চিঠি তুলে দিলাম। মূল কপিটাই নিচ্ছে সে।

'এখন তুমি বাবার চিঠি পড়তে পার,' আমি বলি।

আমার লেখা বইটাও হয়তো সে অন্য কোনো এক সময় পড়তে পারবে, সেটা ক্রিসমাসের পরেও হতে পারে। আর তারপরে যদি আমি টেলিস্কোপটা পেয়ে যাই কারণ ইতিমধ্যেই আমার গল্পের মধ্যে ইয়ান ওলাফ টেলিস্কোপ গেঁথে ফেলেছি। বেশি লোকে ভায়োলিন গার্লের গল্প জানুক সেটা আমার ইচ্ছা নয়। তবে এ নিয়ে আমার তেমন মাথাব্যথাও নাই। তবে শয়নকক্ষে মা ও ইয়োর্গেনের মাখামাখি আমাকে শিউরে তোলে। তবে একটু একটু।

মা বাবার চিঠিটা নিয়ে শয়ন কক্ষে হলুদ চামড়ার সোফায় বসে পড়ছে। সে বলেছে ইয়োর্গেন শনিবারের জগিং থেকে ফিরে আসার আগেই চিঠিটা পড়ে শেষ করতে চায়। আমি কাছাকাছি থাকায় খোলা দরজা দিয়ে ওকে দেখার অনুমতি নিয়েছি। মাঝে মাঝে ওর কথাও শুনতে পাচ্ছি। ফোঁসফোসানিও কানে আসছে। এতে প্রমাণ মেলে সে ইয়ান ওলাফকে পুরোপুরি ভুলে যায়নি।

তবে আমি তখনও লিখছি। এর কারণ এই যে পাঠকদের জন্য পুনশ্চ অংশে কিছু লিখতে চাই। এটা ছোট এক চমক।

নিজেদের মা-বাবাকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পার কীভাবে তাদের প্রথম দেখা হয়েছিল। হয়তো ওদের একটা চিত্তাকর্ষক গল্পও থাকতে পারে। দুজনকে আলাদা করে জিজ্ঞেস করলে ভালো হয়, কারণ দুজন হয়তো আলাদা গল্প শোনাতে পারে।

ওরা যদি একটু বিব্রত বোধ করে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, কারণ এটাই স্বাভাবিক। যে রূপকথার গল্পগুলো নিয়ে আমরা কথা বলছি তার কোনোটাই এক রকম নয়। তবে সবগুলির ক্ষেত্রেই কমবেশি কিছু স্পর্শকাতর নিয়ম কানুন থাকে, সেজন্য এ নিয়ে কথা বলা বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। হয়তো এসব নিয়ম কানুনের কাছ ঘেঁষে দাঁড়ানোর ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করাই শ্রেয়। এগুলো অনেক সময় ভাষায় প্রকাশ করা সহজ নয়, সেই কারণে কিছুটা কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়।

আমার কল্পনায় গল্পটা যতই বিস্তারিত হবে, সেটা ততই লোমহর্ষক হবে, কারণ বর্ণনার মধ্যে সামান্য হেরফের হলে হয়তো তোমার পৃথিবীর বুকে জন্মানোই হয়ে

উঠবে না! আমি বাজি রেখে বলতে পারি হাজারো ধরনের ক্ষুদ্র বিষয় আছে যা বিশাল পার্থক্য সৃষ্টি করতে পারে, আর তোমার সামান্য সুযোগ থেকেও হয়তো বঞ্চিত হয়ে যেতে পার।

অথবা বাবার জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য থেকে কিছু কথা ধার করে বলতে পারি: জীবন এক বিশাল লটারী যেখানে শুধুমাত্র জিতে যাওয়া টিকেটগুলোই দৃশ্যমান।

তোমরা যারা এই বই পড়েছ, তারা এক একটা জিতে যাওয়া টিকেট। তোমরাই ভাগ্যবান।